বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

ত্রয়োদশ খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'একজন ঐতিহাসিককে তাঁর কাজে যথাযথ, আন্তরিক এবং পক্ষপাতশূন্য হওয়া উচিত। তাঁকে হতে হবে স্বার্থশূন্য এবং আসক্তিমুক্ত। ভয় এবং আবেগ প্রবণতা যেন তাঁকে বিচলিত না করে এবং তাঁকে হতে হবে সত্যনিষ্ঠ। এই গুণাবলির মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত ইতিহাস চিন্তা। একজন ঐতিহাসিক এক বিরাট কর্মযজ্ঞের সংরক্ষক, বিস্মৃত ঘটনার তিনি উপস্থাপক, অতীতের ঘটনাবলির সাক্ষীস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের নির্দেশক। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একজন ঐতিহাসিকের থাকবে খোলামনে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। খোলা মনের অর্থ শূন্যতায় ভরা নয়। ঘটনার সত্যতা বিচার করার মতো উপযুক্ত মানসিকতা থাকাও ঐতিহাসিকের এক বড় বৈশিষ্ট্য।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর
'শূদ্র কারা' থেকে

AMBEDKAR RACHANA-SAMBHAR
(Collected Works of Dr Ambedkar in Bengali)

Volume-13

Total No Pages : 296 including 6 pages Index

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৯
First Published : November, 1999

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি -১১০ ০০১

Published by
Dr Ambedkar Foundation,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India,
New Delhi-110 001.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৩০ টাকা (Rs. 30/-)
শোভন সংস্করণ : ৯০ টাকা (Rs. 90/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
সন্তোষ দেবনাথ

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ভারতের দলিত শ্রেণীর মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। জাত-পাতের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন তীব্র জেহাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদ যে জাত-পাতের ধারক ও বাহক, বেদ-পুরাণ-স্মৃতি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে তিনি এই সমস্যার মূল কোথায়, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে গেছেন। ভারতীয় সমাজ-প্রগতির ইতিহাসে তাঁর এই পর্যালোচনা খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

এই খণ্ডে আম্বেদকরের এই বিষয়ক কিছু রচনা সংযোজিত হল। বেশ কয়েকটি রচনা অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ। মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা-বিভাগ ইংরেজিতে আম্বেদকর রচনা-সম্ভার প্রকাশের সময় গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করে এগুলি সংকলনভুক্ত করেছেন। ভারতের সামাজিক বৈষম্য দূর করতে আগ্রহী যে-কোনও ব্যক্তির কাছে খণ্ডটি খুব-ই প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটি প্রকাশের ব্যাপারে অনুবাদক, অনুমোদক, পরামর্শ-পরিষদ এবং ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই বাংলা সংস্করণের সম্পাদক অধ্যাপক আশিস সান্যালকে। আশা করি, অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

মেনকা গান্ধী

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক, আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হল :—

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয় স্থাপন, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি প্রদান, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করা, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করা, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান এবং (৭) দিল্লির ২৬ আলিপুর রোডে ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক প্রতিষ্ঠা করা।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয়া কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার প্রয়াসে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই ফাউন্ডেশনের নির্দেশক কৃষণ লালকে। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরও যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ড. এম. এস. আহমেদ
সদস্য-সচিব
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

সম্পাদকের নিবেদন

ভারতের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে বর্তমান খণ্ডটি খুব-ই উল্লেখ্য। বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকর এই খণ্ডে অসামান্য বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও ঐতিহাসিক চিন্তার আলোকে কিভাবে শূদ্ররা ইন্দো-আর্য সমাজে চতুর্থ বর্ণ বলে পরিগণিত হল, তার পর্যালোচনা করেছেন। বর্তমানে যখন সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য চলছে দলিত মানুষদের সংগ্রাম, তখন এই খণ্ডটিতে ড. আম্বেদকরের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক ইংরেজিতে প্রকাশিত সপ্তম খণ্ডটি বাংলায় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে সন্নিবেশিত হল।

অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডের অনুবাদেও যথাসম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদকের সহযোগিতা ছাড়া এই খণ্ডের প্রকাশ কখনও সম্ভব হত না। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ ছাড়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের নিদেশক ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত সকলকে সহযোগিতার জন্য। খণ্ডটি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

কলকাতা
নভেম্বর, ১৯৯৯

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

শূদ্র কারা ?

ইন্দো-আর্য সমাজে কিভাবে তারা চতুর্থ বর্ণ
হিসাবে পরিগণিত হ'ল ?
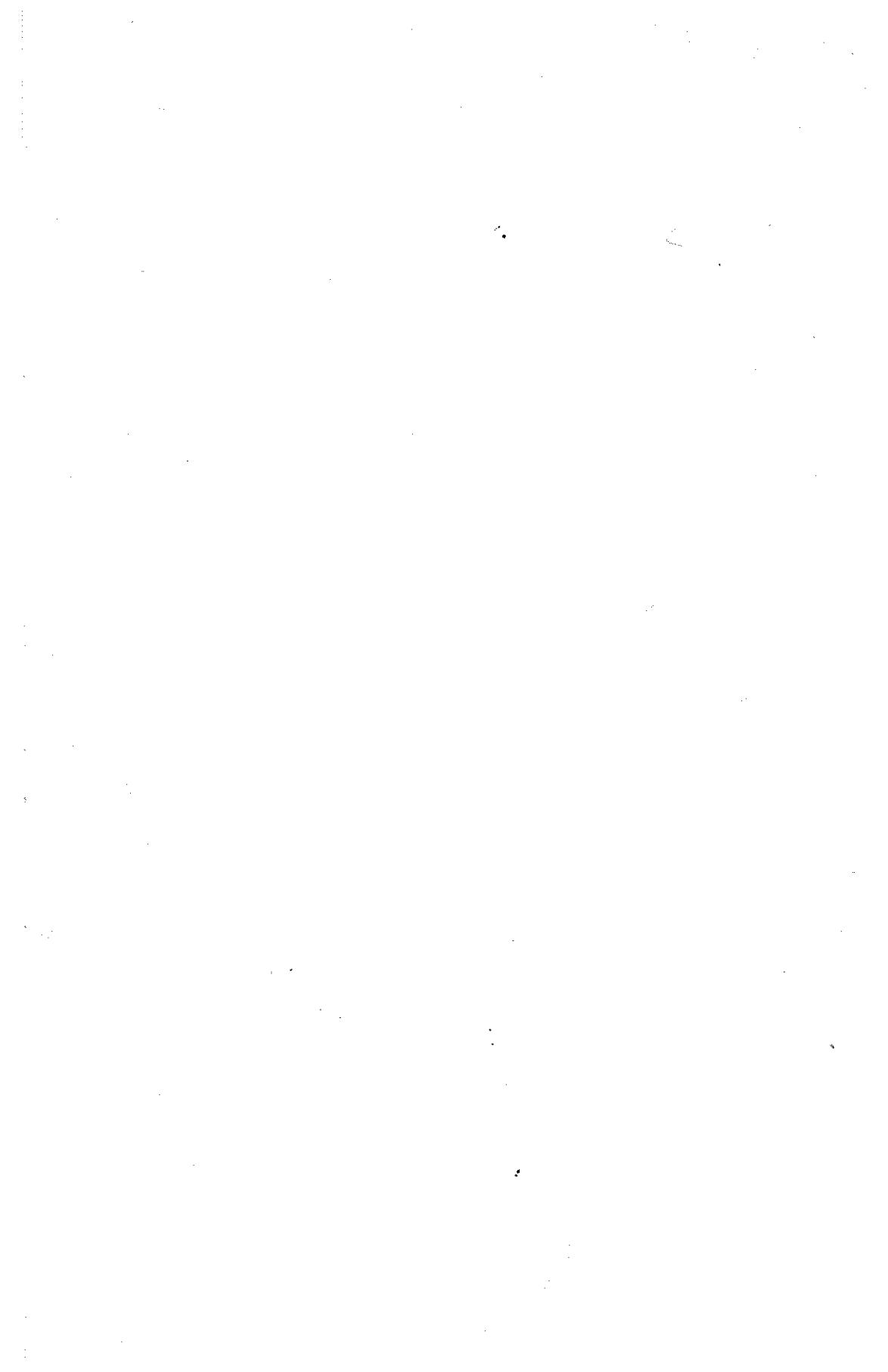
উৎসর্গ

ভারতবর্ষের সব থেকে মহান শূদ্র তিনিই যিনি হিন্দুধর্মের নীচু বর্ণের লোকদের উঁচু বর্ণের সমাজের কাছে তাদের দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন এবং যিনি এই চরম সত্য প্রচার করেছেন যে, বিদেশি শাসন মুক্ত হওয়ার থেকেও ভারতে সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অনেক বেশি জরুরি—সেই মহাত্মা জোতিবা ফুলের (JOTIBA FULE—1827-1890) স্মৃতিতে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হল।

ভূমিকা

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শূদ্রদের সম্পর্কে একটি গ্রন্থ অনাবশ্যক বিবেচিত হবে না। শূদ্রদের সমস্যাকে একটি তুচ্ছ ব্যাপার বলেও গণ্য করা যাবে না। ইন্দো-আর্য সমাজ-ব্যবস্থা যে চাতুর্বর্ণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং চতুর্বর্ণের অর্থ তৎকালীন সমাজ ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (সৈনিক), বৈশ্য (বণিক) এবং শূদ্র (দাস) এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—এই বিষয়টি শূদ্রদের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে শুধুমাত্র যে কোনও প্রকার আলোকপাত করে না তাই নয়, এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেও কোনও সাহায্য করে না। সমাজ শুধুমাত্র চারটি বর্ণের বিভক্ত—চতুর্বর্ণের অর্থ যদি এই হত তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত নির্দোষ বলে কথিত হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চতুরাশ্রমের অর্থ এর থেকেও আরও অনেক কিছু। চতুরাশ্রম মতবাদ সমাজকে যে শুধুমাত্র চারটি বর্ণে ভাগ করেছে তাই নয়, এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক বৈষম্যের। চারটি বর্ণের মানুষ কীভাবে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে, তাও স্থির করে দিয়েছে এই চতুরাশ্রম। সামাজিক এই বৈষম্য কোনও কল্পিত বিষয় নয়, এটি আইনসিদ্ধ এবং অন্যথা আচরণ দণ্ডনীয়। চতুর্বর্ণ অনুযায়ী শূদ্রদের শুধুমাত্র যে সবার নীচে স্থান দেওয়া হয়েছে তাই নয়, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য কলঙ্কের বোঝা এবং সামাজিক বিধি-নিষেধ। তারা যাতে নির্ধারিত বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করে তার বাইরে না যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সব করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে পঞ্চম বর্ণ হিসাবে অস্পৃশ্য জাতের উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত শূদ্ররা হিন্দুদের কাছে সব থেকে নিচু জাতের লোক বলে গণ্য হত। শূদ্রদের এইসব সমস্যার ভিতর জীবন যাপন করতে হত। এইসব সমস্যার গুরুত্ব যদি কেউ উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে তাদের শূদ্র জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে আদমশুমারিতে (লোকগণনায়) আলাদাভাবে শূদ্রদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। ভারতবর্ষে হিন্দু জনসংখ্যার ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ-ই শূদ্র সম্প্রদায়ের। অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়েই এই হিসাব ধরা হয়েছে। এত বিরাট সংখ্যক মানুষের সমস্যা নিয়ে যে গ্রন্থে আলোচিত হয় তা কোনও অবস্থাতেই নগণ্য বিষয় হতে পারে না।

ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্রদের অবস্থা কেমন ছিল, তা এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য যে অনুসন্ধান চালানো হয় তা আজকের ঘটনার সঙ্গে আলাদা বলে কোনও কোনও মহলে মত প্রকাশ করা হয়। শ্রী শেরিং

(Sherring) তাঁর Hindu Tribes and Castes নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'শূদ্ররা আর্য ছিল কি ভারতের আদিম অধিবাসী ছিল অথবা কোন উপজাতি গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, বাস্তবে এখন তার বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। প্রথম দিকে তাদের জন্য বর্ণাশ্রমের চতুর্থ অর্থাৎ একেবারে শেষ ধাপে স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। অন্য তিন উঁচু সম্প্রদায় থেকে তাদের শ্রেণীর ব্যবধান ছিল বিস্তর। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে যদিও প্রথম দিকে তারা আর্য শ্রেণীভুক্ত ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে অন্য তিন আর্য শ্রেণীর সঙ্গে ব্যাপকভাবে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে তারা অনেকটা আর্য শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের ক্ষতির থেকে লাভ হয়েছে অনেক বেশি এবং বর্তমানে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত কোনও কোনও উপজাতি গোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে শূদ্ররা অন্যান্য জাতির সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যেমনটি হয়েছিল ইংল্যান্ডে কেলটিক উপজাতিদের বেলায়। কেলটিক উপজাতি গোষ্ঠী ইংল্যান্ডে অ্যাংলো স্যাক্সন গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় এবং তাদের এককালে যে নিজস্ব একটা অস্তিত্ব ছিল তা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়।'

দুটি ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই মতামত দেওয়া হয়েছে। প্রথমত বর্তমানে যারা শূদ্র বলে কথিত, তাদের উদ্ভব হয়েছে নানা সম্প্রদায় থেকে এবং ইন্দো-আর্য সমাজের আদি শূদ্রদের থেকে তারা আলাদা। দ্বিতীয়ত মানুষ হিসাবে নয়, শূদ্ররা জাতি হিসাবে কতটা দুর্দশা এবং শাস্তির শিকার হচ্ছে বিষয়টি আবর্তিত হচ্ছে তার ওপর। শূদ্রদের যে দুর্দশা ও শাস্তি ভোগ করতে হত ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় তা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণদের তৈরি। এর ফলে একটি আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে শূদ্রদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, শূদ্রদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই আচরণবিধি এখনও বহাল রয়েছে এবং ব্রাহ্মণরা সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর সঙ্গে সেই বিধি অনুযায়ী আচরণ করছে। আদি শূদ্রদের সঙ্গে ঐ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কোনও সম্পর্ক নেই। বিষয়টিতে অবশ্যই সকলের কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে। এ সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা হল, ইন্দো-আর্য সমাজে কালক্রমে শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান এতটাই নিচে নেমে যায় যে, তারা এক ধরনের শোচনীয় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোরতার জন্য তাদের এই পরিস্থিতি। এর ফলশ্রুতি দুই ধরনের পরিণতি। প্রথমত এর ফলে 'শূদ্র' এই শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থই বদলে যায়। 'শূদ্র' শব্দের মূল অর্থ বলতে যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় বুঝায় তা পরিবর্তিত হয়ে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় সব নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। ঐসব মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সম্মান এবং কোনও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। দ্বিতীয়ত

'শূদ্র' শব্দের ব্যাপকতর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় শূদ্রদের সম্পর্কে তৈরি বিধির ব্যাপকতর প্রসার। এর ফলে ঐ বিধির আওতায় বর্তমানে যারা শূদ্র বলে কথিত তারা প্রকৃত পক্ষে আদি শূদ্র নয়। কিন্তু এর ফল হয়েছে ইন্দো-আর্য সমাজে চতুরাশ্রম অনুযায়ী যাদের শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হওয়ার নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, সেই চাতুর্বর্ণের বিধি প্রসারিত হওয়ার ফলে নির্দোষ মানুষদেরও শূদ্রের নিপীড়ন ভোগ করতে হচ্ছে। হিন্দু আইন প্রণেতারা আরও যদি বেশি ঐতিহাসিক সচেতন হতেন তাহলে তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হত না যে আদি শূদ্ররা বর্তমান দিনের নিম্নশ্রেণীর লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল এবং সেক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তিদের এই করুণ পরিণতি এড়ানো যেত। বিষয়টি যতই দুর্ভাগ্যজনক হোক না কেন, এটি ঘটনা যে আদি শূদ্রদের ক্ষেত্রে নিয়মটি যেভাবে কঠোরতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হত, বর্তমানকালে শূদ্রদের ক্ষেত্রে তা অনুরূপ কঠোরভাবেই প্রয়োগ করা হয়। এই ধরনের নিয়মবিধি কীভাবে তৈরি করা হল তা অনুসন্ধান করার জন্য বর্তমানকালের শূদ্রদের সেই আদি যুগে ফিরে তাকানোর আর প্রয়োজন হয় না।

শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণা করার কাজকে স্বীকৃতি এবং স্বাগত জানালেও অনেকে এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন। আমাকে ইতিপূর্বেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে আমার কথা বলার অধিকার থাকলেও ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস এবং ধর্ম আমার আওতার বাইরে এবং আমি কোনও অবস্থাতেই তা নিয়ে যেন নাক না গলাই। আমি বুঝতে পারি না কেন আমার সমালোচকরা আমাকে এই ধরনের সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। একজন লেখক বা চিন্তানায়ক হিসাবে এ ব্যাপারে যদি আমি কোনও অন্যায় দাবি করে থাকি এবং এটি যদি তার প্রতিষেধক হয় তাহলে আমি বলব এর কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ আমি স্বীকার করছি যে, ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে বলার মত যোগ্যতাও আমার নেই। আর আমার যদি সংস্কৃত ভাষার ওপর দক্ষতা নেই এবং এর জন্যই আমার প্রতি এই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়ে থাকে তাহলে আমি তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারি না এসব ক্ষেত্রে বলার মত আমার কোনও যোগ্যতা থাকবে না কেন। সংস্কৃত ভাষায় এমন খুব কম সাহিত্যই আছে যা ইংরাজিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা না থাকাটা এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে আমার পক্ষে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কারণ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ১৫ বছর ধরে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত ভাষার সংশ্লিষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন যদি করা হয় তাহলে আমার মত একজন সাধারণ বোধবৃত্তির মানুষও এ সম্পর্কে গবেষণা করার

যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে আমার উপযুক্ত যোগ্যতা আছে কিনা এই গ্রন্থই তার উপযুক্ত পরিচয় বহন করবে। আমার এই ধরনের প্রচেষ্টা একটি প্রবাদ বাক্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রবাদ বাক্যটি হল, একজন দেবদূত যেখানে পদচারণা করতে ভয় পান সেখানে একটি মূর্খের প্রবেশ ঘটে। কিন্তু আমি এই বিশ্বাসের স্মরণ নিচ্ছি যে একজন নির্বোধেরও তো কিছু করার থাকতে পারে। দেবদূত যদি ঘুমিয়ে থাকেন অথবা তার কাজে অনিচ্ছুক হন তাহলে আমার মত নির্বোধকেই তো এগিয়ে আসতে হয়। এই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পক্ষে এটাই আমার যুক্তি।

এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি হতে পারে? গবেষণার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি নিঃসন্দেহে সেটিই এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিষয়। দুটি প্রশ্ন এই গ্রন্থে উত্থাপন করা হয়েছে : (১) শূদ্র কারা? এবং (২) ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় কীভাবে তারা চতুর্থ বর্ণের মানুষ হিসাবে গণ্য হল? এ সম্পর্কে আমার উত্তর নিচে দেওয়া হল :

(১) শূদ্ররা আর্য সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

(২) এক সময় আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—মাত্র এই তিনটি বর্ণের স্বীকৃতি ছিল।

(৩) শূদ্রদের আলাদা কোনও বর্ণ ছিল না। ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্ররা ক্ষত্রিয় বর্ণের অংশ হিসাবে গণ্য হত।

(৪) শূদ্র-রাজা এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনবরত সংঘর্ষ লেগে থাকত এবং এর ফলে ব্রাহ্মণরা অনেক অত্যাচার এবং অসম্মানের সম্মুখীন হত।

(৫) ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার এবং অসম্মানের জন্য তারা শূদ্রদের ঘৃণা করত এবং কালক্রমে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়নে পৌরোহিত্য করতে অস্বীকার করল।

(৬) ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়নে পৌরোহিত্য করতে অস্বীকার করার ফলে যারা এককালে ক্ষত্রিয় বর্ণের অংশ বিশেষ ছিল, তাদের সামাজিক পতন শুরু হল। তাদের স্থান বৈশ্যদের নিচে নেমে গেল এবং শূদ্ররা চতুর্থ বর্ণের লোক হিসাবে পরিগণিত হল।

আমি আমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের মতামতকে গুরুত্ব দেব। আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তা একান্তভাবেই মৌলিক এবং বর্তমানে

এ সম্পর্কে যেসব প্রচলিত ধ্যানধারণা রয়েছে এই সিদ্ধান্ত তার বিরুদ্ধে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করবে তাতে কোনও প্রকার সন্দেহ নেই। আমার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে কিনা তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন তাঁদের মানসিকতার ওপর। যদি কোনও ব্যক্তি কোনও বিশেষ মতবাদ আঁকড়ে থাকেন তাহলে তিনি যে আমার সিদ্ধান্ত বাতিল করবেন, সে সম্পর্কে আমি একমত। আমি অবশ্য এই ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে আমল দিই না, কারণ যিনি বিরুদ্ধবাদী তার কাছ থেকে বিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছুই আশা করা যায় না। কিন্তু যদি কোনও সমালোচক তাঁর প্রয়াস সম্পর্কে সৎ হন এবং সচেতন হন তাহলে যত রক্ষণশীলই তিনি হন না কেন, তিনি বিষয়টি খোলা মন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন এবং প্রকৃত ঘটনা মেনে নেওয়ার মতো তাঁর মানসিকতা থাকবে। সেক্ষেত্রে তিনি আমার মতামত গ্রহণ না করে আমাকে নিরাশ করবেন না। আমার এই প্রত্যাশা পূরণ না-ও হতে পারে। তবে একটা বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে আমার সমালোচকরা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে এই গ্রন্থ অনেক নতুন আঙ্গিক এবং বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছাড়াও সাধারণ হিন্দুরা বিষয়টি নিয়ে কীভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বর্তমান যুগের হিন্দুদের পাঁচটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। হিন্দুদের মধ্যে একটি শ্রেণী আছে যারা অত্যন্ত গোঁড়া। হিন্দুদের সামাজিক প্রথা ও আচারে কোনও প্রকার গলদ আছে তা তারা স্বীকার করে না। এর কোনও সংস্কার তাদের কাছে ধর্মদ্রোহিতার সামিল। আর এক শ্রেণীর হিন্দু আছে যারা আর্য সমাজভুক্ত। তাদের বিশ্বাস একমাত্র বেদেই। তারা একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে, অন্যদিকে বেদের বাইরে কিছু মানতেও তারা রাজি নয়। বেদের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসই তাদের ধর্ম। এক শ্রেণীর হিন্দু আছে যারা মনে করে হিন্দুদের সামাজিক প্রথা ও আচার গলদে পূর্ণ কিন্তু তা পরিবর্তনের জন্য তাদের কোনও প্রকার উদ্যোগ নেই। তাদের মত হল আইনের যখন স্বীকৃতি নেই তখন এই প্রথা নিশ্চিহ্ন না হলেও আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে। এছাড়া আর এক শ্রেণীর হিন্দু এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না বরং এ বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। সমাজ সংস্কারের চেয়ে তাদের কাছে স্বরাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দুরা যুক্তিবাদী। তারা সমাজ সংস্কারকে প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে মনে করে। স্বরাজের থেকেও সমাজ সংস্কার তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দুরা যারা আর্য সমাজবাদী তারা এই গ্রন্থটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করতে পারে। আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। তাদের বক্তব্য হল, ব্রিটিশ ভারতের বর্তমান আইন হিন্দু সমাজের প্রচলিত জাতভেদ প্রথাকে স্বীকার করে না। তাদের এই মতামতকে সঠিক বলা যায়। এটি ঘটনা যে ন্যায়-সংহিতার ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনও হিন্দু যে বিশেষ বর্ণভুক্ত, দেওয়ানি আদালত থেকে সে এই ঘোষণা আদায় করতে পারবে না। কোন্ মানুষ কোন্ বর্ণভুক্ত ব্রিটিশ-ভারতের আদালত তা নির্ধারণ করতে পারে শুধুমাত্র বিবাহ, উত্তরাধিকার নির্ণয় এবং দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে। কারণ এইসব ক্ষেত্রে মানুষের বর্ণ বা শ্রেণী অনুযায়ী নিয়মবিধির তারতম্য ঘটে। একথা যদিও সত্য যে ব্রিটিশ-ভারতের আইন হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথা স্বীকার করে না তথাপি লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রথমত এমন কথা বলা নেই যে বর্ণভেদ প্রথা মেনে চলা সামাজিক অপরাধ; দ্বিতীয়ত বর্ণভেদ প্রথা লুপ্ত হয়ে গেছে এমন কথা ঐ আইনে নেই; তৃতীয়ত নাগরিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে বর্ণভেদ প্রথাকে স্বীকার করা হয়নি এমন কথা বলা হয়নি; চতুর্থত এই বিধির একমাত্র অর্থ হল, বর্ণভেদ প্রথার ওপর থেকে আইনি অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়া। কিন্তু বর্তমানে কোনও সামাজিক প্রথা বজায় থাকার জন্য আইনি অনুমোদনই সব নয়। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ওপর সামাজিক প্রথা টিকে থাকা নির্ভর করে। এর মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুমোদন সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণভেদ প্রথার ওপর ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব খুব বেশি। ধর্মীয় অনুমোদন থাকার জন্য বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের পূর্ণ সামাজিক অনুমোদন পায়। আইনগত কোনও প্রকার বিধি নিষেধ না থাকার ফলে এই ধর্মীয় অনুমোদনেই সমাজ বর্ণভেদ প্রথাকে পুরোমাত্রায় টিকিয়ে রেখেছে। এর সবথেকে বড় প্রমাণ হল যে, আইনের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবস্থান পূর্বের মতই রয়ে গেছে। সুতরাং কোনও অবস্থাতেই বলা যাবে না যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা নিরর্থক।

যে সব হিন্দু রাজনৈতিক সচেতন তাদের মতামতের এ বিষয়ে তেমন কোনও গুরুত্ব নেই। দূর ভবিষ্যতের চেয়ে তারা বর্তমান সময় নিয়েই বেশি ভাবিত। তারা জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে কোনও বিষয় যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, প্রতিবাদের পরিবর্তে ধামাচাপা দিতে পছন্দ করে। সুতরাং এই শ্রেণীর মানুষ যদি এই গ্রন্থকে অবান্তর মনে করে থাকে, তাহলে সেটাই তো স্বাভাববিক।

এই গ্রন্থ আর্য-সমাজবাদীদের চিন্তাধারার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলবে। আমার সিদ্ধান্ত আর তাদের চিন্তাধারার মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে মারাত্মক সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। আর্য-সমাজবাদীদের বিশ্বাস ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় এই চার প্রকার

বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব একেবারে শুরু থেকেই রয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে দেখান হয়েছে ইন্দো-আর্য সমাজে কোনও এক সময় তিনটি বর্ণাশ্রম ছিল। আর্য সমাজবাদীরা বিশ্বাস করে, বেদ হল শাশ্বত এবং অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু এই গ্রন্থে দেখান হয়েছে বেদের একটি অংশ বিশেষ করে 'পুরুষ সূক্ত' (Purusha Sukta) যা আর্য সমাজবাদীদের মূল অবলম্বন তা ব্রাহ্মণরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য জাল করেছে। আমার এই দুটি সিদ্ধান্তই আর্য-সমাজবাদীদের চিন্তাধারা তথা বিশ্বাসের ওপর আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মত প্রতিক্রিয়া ঘটাবে।

আর্য সমাজবাদীদের সঙ্গে এই বিরোধের জন্য আমি দুঃখিত নই। একমাত্র বেদই শাশ্বত এই বাণী প্রচার করে আর্য-সমাজবাদীরা হিন্দু সমাজের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। তারা প্রচার করেছে বেদ চির সত্য, তার কোনও আদি নেই, অন্ত নেই এবং অভ্রান্ত। আর্য সমাজবাদীরা একথাও প্রচার করেছেন যে, বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ধর্মের সামাজিক প্রথাগুলিও চিরন্তন এবং তার আদি অন্ত নেই এবং তা অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। কোনও সমাজের পক্ষে এই ধরনের অন্ধ বিশ্বাসের ফল অত্যন্ত মারাত্মক। আর্য-সমাজবাদীরা এই ধরনের মতবাদ যতদিন আঁকড়ে থাকছে ততদিন হিন্দু সমাজের যে কোনও প্রকার সংস্কার সম্ভব নয় সে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। যদি অন্য কিছু নাও থাকে তাহলে এই গ্রন্থ অন্তত এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করবে।

গোঁড়া হিন্দু সমাজের মানুষ আমার এই গ্রন্থ সম্পর্কে যে কি মনোভাব নেবে তা আমি ভালভাবে অনুমান করতে পারি, কারণ বিগত বছরগুলি ধরে আমি এই নিয়ে তাদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে আসছি। বিষয়টি আমার বুদ্ধির অগম্য যে ভদ্র এবং অহিংস হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থের ওপর আক্রমণ হলে কীভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে—বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। কিন্তু গত বছর আমি মাদ্রাজে এটি নিয়ে এক বক্তৃতা দিই। আমার সেই বক্তৃতা শুনে অনেক হিন্দু তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ক্রোধভরে আমার কাছে বহুলোক চিঠি লেখে। ঐ চিঠিগুলি ছিল এমন কটূক্তি এবং গালাগালিতে ভরা যা উল্লেখ করা যায় না এবং তা ছাপারও অযোগ্য। তারা আমাকে জীবননাশেরও হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে প্রথম অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করে এবং নানাভাবে ভয় দেখায়। আমি জানি না এবার তারা কি করবে। কারণ তারা আমার এই গ্রন্থ পড়ে আরও রেগে যাবে। এই গ্রন্থে এমন সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা পড়ে তারা আরও বেশি করে আমাকে অপরাধী মনে করবে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখান হয়েছে

ধর্মের নাম করে যা কিছু চলছে তার অনেক কিছুই জাল এবং তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এটিকে কাজে লাগান হচ্ছে। তাদের মনোভাব পক্ষপাতদুষ্ট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ। তাদের নিন্দা বা হুমকির কাছে আমি অবশ্য নতিস্বীকার করছি না। কারণ আমি ভালভাবে জানি যে, তারা পাকা খেলোয়াড়। তারা ধর্মকে রক্ষা করার নামে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছে। তারা বিশ্বের যে কোনও শ্রেণীর মানুষের থেকেও বেশি স্বার্থপর এবং তারা তাদের শ্রেণীর কুক্ষিগত স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য সব রকমের জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগ করছে। এটি কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যখন হিন্দুদের তথাকথিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে একজন লোক কিছু বলার সাহস দেখাচ্ছে, তখন গোঁড়া সমাজের কিছু লোককে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরা সব হিন্দু সমাজের উঁচুতলার মানুষ। তারা নিজেদের উচ্চশিক্ষিত বলে দাবি করে। স্বার্থশূন্য এবং খোলামনের অধিকারী না হয়ে তারা হয়ে উঠল চক্রান্তকারী এবং বিষয়টি নিয়ে হৈ-চৈ শুরু করল। এমনকি হাইকোর্টের হিন্দু বিচারকগণ এবং ভারতের প্রদেশগুলির হিন্দু মন্ত্রীগণও এর থেকে পিছিয়ে নেই। এক্ষেত্রে তাঁরা চূড়ান্ত করে ছাড়ছেন। তাঁরা যে শুধুমাত্র ঐ লোকটির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তাই নয়, নিজেরাও তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন। সব থেকে সাংঘাতিক ব্যাপার হল তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা যে উচ্চ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি কেউ বিরোধিতা করে তাহলে সেই স্থান তারা আর ধরে রাখতে পারবে না। এই ভদ্রমহোদয়দের প্রতি আমার বক্তব্য তাদের দেওয়া কোনও অভিশাপ আমাকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তাঁরা খুব সম্ভবত ড. জনসনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের কথা অবহিত নন। ড. জনসন এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বলেছেন, 'কোনও দুষ্কৃতীর অপচেষ্টা আমাকে প্রতারকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিরত করতে পারবে না'। সমাজের এই উঁচুশ্রেণীর সমালোচকদের বিরুদ্ধে আমি খুব কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে চাই না অথবা একথা আমি বলতেও চাই না যে তারা ভণ্ডামিকে লুকানোর জন্য দুষ্কৃতীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমি তাদের দুটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই : প্রথমত যা কিছুই ঘটুক না কেন ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধানের জন্য আমি ড. জনসনের অনুসৃত কঠোর নীতিই অনুসরণ করব। আমি ঐ পবিত্র গ্রন্থের স্বরূপ প্রকাশ করে দেখিয়ে দেব যাতে হিন্দুরা বুঝতে পারে যে, তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের উপদেশবলীর জন্যই দেশ ও সমাজের পতন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান প্রজন্মের হিন্দুরা যদি আমার বক্তব্যে কর্ণপাত না করে তাহলে আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ তা করবে। আমি আমার সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ নই।

কারণ আমি কবি ভবভূতির কথার মধ্যেই আমার সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চাই। কবি ভবভূতি বলেছেন, 'এই বিরাট অনন্ত বিশ্বে কোনও একদিন এমন একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করবে, যে আমার কথা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে।' এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদস্বরূপ।

যে শ্রেণীর হিন্দুরা সমাজ সংস্কারের গুরুত্বে বিশ্বাসী একমাত্র তারাই আমার এই গ্রন্থকে স্বাগত জানাবে। আসল ঘটনা হল এটি এমন এক সমস্যা যার সমাধানের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং প্রয়োজন কয়েক প্রজন্মের। তাদের মতে এই অজুহাতে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা থেকে পিছিয়ে আসার কোনও যুক্তি নেই। এমন কি একজন উৎসাহী হিন্দু রাজনীতিবিদ যদি তাঁর প্রচেষ্টায় সৎ হন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন হিন্দু সমাজের মধ্যে যে তীব্র সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে, তা কি ধরনের সমস্যা তৈরি করছে। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতন স্বার্থ বুদ্ধি বিশিষ্ট হিন্দুরা এই বিষয়টিকে অগ্রাহ্য বা স্থগিত করতে উৎসাহিতবোধ করতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনীতিকরা কোনও বিষয় নিয়ে জট পাকান। এই সমস্যাগুলি সাময়িক অসুবিধা নয়। এগুলি আমাদের স্থায়ী সমস্যা। বলতে গেলে প্রতি মুহূর্তেই আমরা এই অসুবিধার সম্মুখীন হই। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, সংস্কারপন্থী হিন্দুরাও রয়েছে এবং তারাই আমার প্রধান অবলম্বন। তাদের উদ্দেশ্যই আমি আমার যুক্তিতর্ক পেশ করছি।

এটি বলা হতে পারে যে, হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত তার কিছুই আমি দেখাইনি। এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি দুটি কারণ পেশ করতে চাই। প্রথমত, আমি আমার গবেষণার কাজে ঐতিহাসিকদের ঐতিহ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছি। ঐতিহাসিকরা সমস্ত ধর্মগ্রন্থকেই অত্যন্ত মামুলি বলে গণ্য করে থাকেন। আমার গবেষণার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য অনুসন্ধান করা এবং সেজন্য আমি জনসাধারণের বোধগম্য করে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। মানুষ এর বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা গ্রহণ করবে। আমার এই কাজে পবিত্র এবং অপবিত্র কোনও বিষয়কে অবজ্ঞা করা হয়নি। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করার জন্য যদি হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শিত না হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব, একজন গবেষক হিসাবে আমি আমার কর্তব্য পালন করতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জোর করে আদায় করা যায় না। এগুলি নির্ভর করে কতকগুলি সামাজিক অবস্থার ওপর। পরিবেশ যদি অনুকূল হয়, তাহলে বিষয়টি স্বাভাবিক হবে অন্যথায় তার বিপরীত হবে। হিন্দু ধর্মের পবিত্র সাহিত্যের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন

একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু একজন অ-ব্রাহ্মণ গবেষকের কাছে তা হবে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ধর্মগ্রন্থের প্রতি আচরণে কেন এই পার্থক্য তার ব্যাখ্যা খুব সহজ। একজন ব্রাহ্মণ গবেষক কোনও সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে এই পবিত্র সাহিত্যকে বিচার করবে না। ধর্মগ্রন্থের ওপর যে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে সে বিরত থাকবে। একজন বুদ্ধিজীবী এবং একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যেমন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ থাকে বিষয়টি তদ্রূপ। এখন এই পবিত্র সাহিত্য বলতে আমরা কি বুঝি? এই সাহিত্য বলতে গেলে পুরোটাই ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি। এই সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হল, অব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা এবং সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। ব্রাহ্মণরা কেন এই সাহিত্যের পবিত্রতা রক্ষা করবে না? এর সবথেকে বড় কারণ, এই সাহিত্যকে সামনে ধরে ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণদের ঘৃণা করতে পারে। যাকে পবিত্র সাহিত্য বলা হচ্ছে, তাতে রয়েছে এই ধরনের জঘন্য সমাজ দর্শন। এইসব ধর্ম সাহিত্য সামাজিক অধঃপতনের জন্য দায়ী একথা জানার পর একজন ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করবে একজন অব্রাহ্মণের পক্ষে তা সম্ভব নয়। হিন্দুদের পবিত্র সাহিত্যের প্রতি আমার সম্মান ও শ্রদ্ধার অভাব দেখে কারও অবাক হওয়া উচিত নয়, কারণ আমি অব্রাহ্মণই শুধু নই, আমি একজন অস্পৃশ্য। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই পবিত্র সাহিত্যের প্রতি আমার বিরাগ কোনও অব্রাহ্মণের থেকে কম থাকার কথা নয়। অধ্যাপক থর্নডাইক (Thorndike) বলেছেন, 'একজন মানুষের চিন্তা একটি জৈবিক প্রক্রিয়া এবং সে যা চিন্তা করে তার পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক।' পবিত্র এই ধর্মগ্রন্থের সম্পর্কে একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন অব্রাহ্মণ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের বিষয় আমি অবহিত। হিন্দুদের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে এই গ্রন্থই প্রধান উৎস। ব্রাহ্মণরা ঐ ধর্মগ্রন্থের সমালোচনাহীন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অন্যদিকে অব্রাহ্মণরা এই ধর্মগ্রন্থের নানা বিচ্যুতি নিয়ে নিন্দায় মুখর। ঐতিহাসিক গবেষকের কাছে এই দুই-ই অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ গবেষকরা যে মারাত্মক ক্ষতি করেছেন তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ধর্মগ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের স্বার্থ দুইভাবে কাজ করেছে। প্রথমত যেহেতু এই ধর্মগ্রন্থ তাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি, সেহেতু একে রক্ষা করাকে তারা সন্তানোচিত কর্তব্য বলে মনে করে। এরজন্য তারা সত্য থেকেও বিচ্যুত হতে পিছপা হয় না। দ্বিতীয়ত, এই ধর্মগ্রন্থ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এই অধিকার তথা কর্তৃত্ব খর্ব হয় এমন কোনও কাজ তারা করবে না। যে সামাজিক প্রথাকে টিকিয়ে রাখার মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণরা লাভবান হচ্ছে,

রক্ষিত হচ্ছে তার পূর্বপুরুষদের মান-সম্মান, রক্ষা করার জন্য তারা মনের ভিতর থেকে একটি পবিত্র তাগিদ অনুভব করে এবং এর জন্যই ব্রাহ্মণ গবেষকরা ঐ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে প্রকৃত বস্তু প্রকাশ বা প্রচার থেকে বিরত থাকে। একমাত্র এই কারণেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এইসব গবেষণার কাজে বিশেষ একটা দেখা যায় না এবং এই ধর্মগ্রন্থের নিয়মনীতি মেনে একমাত্র দিনক্ষণ নির্ধারণ বা জন্মের ঠিকুজি তৈরি করার বাইরে তাদের বিশেষ কোনও আগ্রহ থাকে না। অব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এমন কোনও বিধিনিষেধ নেই এবং এই কারণেই সত্য অনুসন্ধানের কাজে সে নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখতে পারে। উভয় শ্রেণীর গবেষক পণ্ডিতদের মধ্যে যে এই প্রভেদ রয়েছে তা কোনও অনুমানভিত্তিক ব্যাপার নয়। বর্তমান গ্রন্থটিই তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবে। শূদ্রদের বিরুদ্ধে যে কি জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তার প্রকৃত স্বরূপ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষয়টিকে সেভাবে উপস্থিত করতে সাহসী হবে না।

অন্যদিকে কোনও অব্রাহ্মণ গবেষকের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো কোনও প্রকার নৈতিক বিধি-নিষেধ না থাকায় সে ঐ সমগ্র পবিত্র সাহিত্যের মূল অনুসন্ধান করবে এবং সব দিক খতিয়ে দেখার পর জানতে পারবে, পুরো গ্রন্থটি কিছু কল্প কাহিনী এবং উপাখ্যানের সমষ্টিমাত্র। দেখা যাবে, এই গ্রন্থ কোনও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার উপযুক্ত নয় বরং আবর্জনা বিশেষ। একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। কারণ বলা হয়েছে একজন ঐতিহাসিকের হওয়া উচিত আন্তরিক এবং পক্ষপাতহীন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি ঘটনাকে সঠিকভাবে তুলে ধরবেন। একজন ঐতিহাসিক হবেন স্বার্থশূন্য, আসক্তিমুক্ত এবং নির্ভীক। তিনি হবেন সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সবপ্রকার আবেগমুক্ত। একজন ঐতিহাসিককে বলা হয়ে থাকে ইতিহাসের প্রসূতি, মহান কার্যাবলীর ধারক, বিস্মৃতির শত্রু, অতীতের সাক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের প্রদর্শক। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি হবেন খোলামনের অধিকারী কিন্তু শূন্য মনের নয়। কৃত্রিম কোনও বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তাঁর বিচার বিশ্লেষণ করার মত মানসিকতা থাকবে। একজন অব্রাহ্মণ গবেষকের ঐতিহাসিকের মেজাজ নাও থাকতে পারে, তিনি এই প্রাচীন সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলতে পারেন। তা কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না। আমি নিশ্চিত আমার গবেষণার কাজে এই ধরনের কোনও সংস্কার প্রভাব ফেলতে পারেনি। শূদ্রদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি নির্ভেজাল ইতিহাসকেই আশ্রয় করেছি। এটি সবারই জানা যে, বর্তমানে দেশে অব্রাহ্মণদের একটি আন্দোলন চলছে এবং সেটি শূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন। প্রত্যেকেই জানেন যে, আমি ঐ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে

নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি এই গ্রন্থটিকে অব্রাহ্মণ রাজনীতিকদের হাতিয়ারে পরিণত করিনি। পাঠকমাত্রেই এর সত্যতা যাচাই করতে পারবেন।

বিষয়টি উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে প্রচুর বিচ্যুতির সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। এই গ্রন্থে রয়েছে প্রচুর উদ্ধৃতি এবং সেগুলি বেশি দীর্ঘ। এই গ্রন্থ কোনও শিল্প সৃষ্টি নয় এবং পাঠকরা এটি পড়তে গিয়ে ক্লান্তিবোধ করতে পারেন। কিন্তু এর জন্য পুরোপুরি আমি দায়ী নই। আমার মতো করে লিখতে আমি নির্দয়ভাবে এর ব্যবচ্ছেদ করতাম। কিন্তু এই গ্রন্থ মূলত লেখা হয়েছে শূদ্রদের জন্য, যারা অজ্ঞ এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত নয়। তারা জানে না তাদের সঠিক পরিচয়। কীভাবে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। তাদের একমাত্র চিন্তা কতটা বেশি সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে অবিচার দূর করা যায়। আমি যাদের এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছি। তারা আমাকে বলেছেন, উদ্ধৃতিগুলি রেখে দেওয়ার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এইসব লোক এই বিষয়টির ওপর এত বেশি আকর্ষণ বোধ করেছেন যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ ধর্মগ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ ছাড়াও এই বইয়ের পরিশিষ্টে মূল সংস্কৃতের অংশ রেখে দিতে বলে। মূল সংস্কৃতকে রেখে দেওয়ার জন্য তাদের এই অনুরোধ আমার পক্ষে যদিও সম্ভব হয়নি তথাপি আমি তার অনুবাদ রেখে দিয়েছি। কারণ এইসব বিষয় তাদের কাছে সহজলভ্য নয়। যখন কোনও লোক মনে করে যে, একমাত্র শূদ্ররাই কলঙ্কজনক চাতুর্বর্ণের জন্য মূলত দায়ী তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যে, কেন আমি শূদ্রদের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন এবং সজাগ করতে চেয়েছি। চাতুর্বর্ণের জন্যই শূদ্রদের অধঃপতন এবং একমাত্র শূদ্ররাই পারে এই চাতুর্বর্ণ ধ্বংস করতে। অন্যসব চিন্তা-ভাবনার ওপরে তাদের এই বিষয়টিকে স্থান দেওয়া উচিত। একমাত্র এই কারণেই আমি এই উদ্ধৃতিগুলি পুরোপুরি বাদ না দিলেও সংক্ষেপ করেছি।

তিনজনের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মহাভারতের শান্তি পর্বের ৬০তম অধ্যায়ের প্রণেতার কাছে আমি ঋণ স্বীকার করব। ব্যাস, বৈশম্পায়ন, সূক্ত, ভৃগু অথবা লোমহর্ষণকে এই অংশের রচয়িতা তা অবশ্য বলা শক্ত। যিনিই এই অংশ রচনা করে থাকুন না কেন পৈজবন পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে তিনি মহৎ কার্য সম্পাদন করেছেন। তিনি যদি পদঞ্জকে শূদ্র হিসাবে বর্ণনা না করতেন, তাহলে শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে সূত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেত। উত্তরপুরুষদের জন্য এই মূল্যবান তথ্য সংরক্ষণ করে রাখার জন্য আমি ঐ মহান গ্রন্থকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই তথ্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ লেখা সম্ভব হত না। দ্বিতীয়ত বোম্বাইয়ের

আন্ধেরির ইসমাইল ইউসুফ কলেজের অধ্যাপক কংগলেকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাব। তিনি উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ দেখে আমাকে সাহায্য করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় আমার পাণ্ডিত্য নেই। আমি এই গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যে উপাদান ব্যবহার করেছি, তা যে অপপ্রয়োগ হয়নি, অধ্যাপক কংগলে বিষয়টি দেখে দেওয়ায় আমি বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তা সত্ত্বেও আমার সমালোচকরা এই গ্রন্থে এ সম্পর্কে কোনও ভুলত্রুটি ধরতে পারেন। তার জন্য কোনও অবস্থাতেই তাঁকে দায়ী করব না। এছাড়া বোম্বাইয়ের সিদ্ধার্থ কলেজের অধ্যাপক মনোহর চিটনিসের কাছেও আমি ঋণী। তিনি এই গ্রন্থের সূচিপত্র তৈরি করে দিয়েছেন।

আমি নিউইয়র্কের 'মেসার্স চার্লস স্ক্রিলেনারস সন্স' প্রকাশনীর কাছেও বিশেষভাবে ঋণী। ম্যাডিসন গ্রান্ট এর লেখা "Passing of the Great Race" গ্রন্থ থেকে তিনটি মানচিত্র মুদ্রিত করতে দিয়ে তাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

১০ অক্টোবর, ১৯৪৬ বি. আর. আম্বেদকর

"রাজগৃহ"

দাদার

বোম্বাই - ১৪

অধ্যায় ১

শূদ্রদের হেঁয়ালি

ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণভেদ প্রথা অনুযায়ী শূদ্র সম্প্রদায় যে চতুর্থ বর্ণভুক্ত ছিল একথা সবারই জানা আছে। কিন্তু খুব কম লোকই অনুসন্ধান করে দেখেছেন কারা ছিল এই শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কীভাবে তারা চতুর্থ বর্ণের লোক হিসাবে পরিগণিত হল! এই ধরনের অনুসন্ধান যে অত্যন্ত জরুরি তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না। কারণ কীভাবে শূদ্ররা চতুর্থ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হল তা জানার প্রয়োজন রয়েছে। এটা কি ক্রমবিবর্তনের ফলে হয়েছে না এই বিবর্তন মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে তা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

কারা শূদ্র ছিল এবং কীভাবে তারা চতুর্থ বর্ণভুক্ত হল তা অনুসন্ধান করতে হলে ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় কীভাবে চাতুর্বর্ণের উৎপত্তি হল সে সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর চাতুর্বর্ণ সম্পর্কে কিছু জানতে হলে আমাদের শুরু করতে হবে ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলের ১৯তম স্তোত্র থেকে। এই স্তোত্র পুরুষ সূক্ত (Purusha Sukta) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

এই স্তোত্রে বলা হয়েছে :

(১) পুরুষের আছে এক হাজারটি মাথা, এক হাজারটি চক্ষু এবং এক হাজারটি পা। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি দিক-ই তাঁর দশটি আঙ্গুলে পরিব্যাপ্ত।

(২) পুরুষ নিজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যা কিছু ঘটে গেছে এবং যা কিছু ঘটবে পুরুষ-ই সব। তিনি অবিনশ্বর, তিনিই নিয়ন্তা এবং সর্বব্যাপ্ত।

(৩) তাঁর ব্যাপকতা অসীম। পুরুষ সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুতেই বিরাজমান, সব কিছুর অস্তিত্ব তাঁর অংশ এবং তাঁর শরীরের এক চতুর্থাংশে বিরাজিত। আর তাঁর তিন চতুর্থাংশ মহাকাশে অক্ষয় অবিনশ্বর।

---

১. ম্যুর, Original Sanskrit Texts, খণ্ড-১, পৃঃ ৯

(৪) তাঁর তিন-চতুর্থাংশে পুরুষ ঊর্ধ্ববাহিনী। এখান থেকে তাঁর এক চতুর্থাংশ পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে তিনি সর্বত্র সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। তিনি সব কিছু গ্রাস করতে পারেন আবার নাও পারেন।

(৫) তাঁর থেকে সৃষ্টি বিরাজের এবং বিরাজ থেকে পুরুষের। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েছেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সীমা ছাড়িয়ে, অগ্রে পশ্চাতে তাঁর ব্যাপ্তি সর্বত্র।

(৬) ঈশ্বর যখন পুরুষকে নৈবেদ্য সাজিয়ে উৎসর্গ করলেন তখন বসন্ত ছিল তাঁর রসদ। গ্রীষ্ম তাঁর দাহিকা শক্তি এবং শরৎ তাঁর অর্ঘ্য।

(৭) দৈবোদ্দেশ্যে বলিদত্ত পুরুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের বেদীমূলে উৎসর্গ করলেন। ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সাধ্য এবং ঋষিরাও উৎসর্গিত হল।

(৮) সেই মহাযজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল দধি এবং মাখন এবং তা থেকে সৃষ্টি হল হিংস্র এবং গৃহপালিত জীবজন্তু।

(৯) যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল ঋক এবং সাম, ছন্দ এবং যজু।

(১০) এর থেকে সৃষ্টি হল অশ্ব এবং দুই পাটি দন্তবিশিষ্ট সমস্ত প্রাণী। সেখান থেকে উৎপন্ন হল গাভী এবং তার থেকে ছাগল ও মেষ।

(১১) ঈশ্বর যখন পুরুষকে বিভক্ত করে দিলেন তখন কত অংশে তিনি তাঁকে খণ্ডিত করলেন? কি ছিল তাঁর মুখগহ্বর? তাঁর বাহু কি ছিল? কোন দুটি বস্তু ছিল তাঁর ঊরু এবং পায়ের পাতা?

(১২) ব্রাহ্মণ ছিল তার মুখগহ্বর, রাজন্য ছিল তার বাহু, বৈশ্য তার ঊরু এবং তার পা থেকে সৃষ্টি হয় শূদ্র।

(১৩) তার আত্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছে চন্দ্র, চক্ষু থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র এবং অগ্নি এবং তার নিঃশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয়েছে বায়ু।

(১৪) পুরুষের নাভিমূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে নভোমণ্ডল, মাথা থেকে আকাশ, পদ থেকে পৃথিবী এবং কর্ণ থেকে চারটি অংশ। এইভাবে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করলেন।

(১৫) ঈশ্বরের যজ্ঞে পুরুষ যখন বলিপ্রদত্ত হলেন তখন সেই যজ্ঞের আহুতির চারপাশে ছিল সাতটি দণ্ড এবং ২১টি অগ্নিকুণ্ড।

(১৬) যজ্ঞের মাধ্যমে ঈশ্বর উৎসর্গ করলেন। এগুলি হল প্রাচীনতম সংস্কার। এইসব বৃহৎ শক্তি অন্তরীক্ষকেই অবলম্বন করেছেন। সেখানে দেবতা এবং সাধ্যরা বাস করেন।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্পর্কে পুরুষ সূক্ত (Purusha Sukta) একটি তত্ত্ব। অন্য কথায় বলতে গেলে এটি সৃষ্টির উৎপত্তি তত্ত্ব। চিন্তার জগতে যে সমস্ত জাতি উন্নত স্তরে পৌছাতে পারেনি, তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে মিশরীয়দের যে ধারণা আছে তা অনেকটা ভারতীয় পুরুষ সূক্ত-র অনুরূপ। মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী ২. ঈশ্বর খনুমু (Khnumu) হলেন সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তা কুম্ভকারের চক্রে তাঁর সব সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন। যা কিছুর অস্তিত্ব সব-ই তাঁর সৃষ্টি। তিনি হলেন পিতার পিতা, মাতার মাতা। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি দেবতা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই হলেন আদি পিতা। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, জল, পাহাড় সব-ই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমস্ত পক্ষীকুল, মৎস্য, বন্যপ্রাণী, গো-মহিষাদি, কীট-পতঙ্গ সব-ই সৃষ্টি করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম পরিচ্ছেদে ঐ এক-ই ধরনের সৃষ্টির ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।

সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিবৃত্ত কেতাবী ঔৎসুক্য ছাড়া অন্য কিছু নিবৃত্ত করে না। এতে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারে মাত্র এবং সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস শুনে ছোটরাও মজা পেতে পারে। পুরুষ সূক্তর কয়েকটি অংশ সম্পর্কে এটি সত্য হতে পারে কিন্তু পুরো অংশ সম্পর্কে কখনই তা হতে পারে না। কারণ পুরুষ সূক্তর সব শ্লোক সমান গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এক-ই তাৎপর্য বহন করে না। একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোক দুটি এক শ্রেণীতে পড়ে এবং বাকিগুলি অন্য শ্রেণীতে পড়ে। একাদশ এবং দ্বাদশ ছাড়া অন্য শ্লোকগুলি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের কৌতূহল মেটায়। এগুলির বিশ্বস্ততা নেই। কোনও হিন্দুই এগুলিকে মনে রাখেনি, কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোক সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাথমিকভাবে এই শ্লোকগুলি সৃষ্টিকর্তার দেহ থেকে চাতুর্বর্ণ যেমন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিত, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যোদ্ধা, বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসায়ী এবং শূদ্র অর্থাৎ সেবক শ্রেণী কীভাবে উৎপত্তি হল এর বেশি কিছু ব্যাখ্যা করে না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, শুধুমাত্র সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়া এই শ্লোকগুলি অন্য কোনও কিছু ব্যাখ্যা করে না তা নয়। ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় এই শ্লোকগুলি শুধুমাত্র কবির অলস কল্পনা প্রসূত বলে উড়িয়ে দিলে মস্ত ভুল করা হবে। সৃষ্টিকর্তার অমোঘ নির্দেশে চাতুর্বর্ণের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হয়েছে এবং পুরুষ সূক্ততে একথাই বলা হয়েছে।

১. এনসাইক্লোপেডিয়া অব্ রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্স, খণ্ড IV, পৃ : ১৪৫

পুরুষ সূক্ত অনুযায়ী গঠিত সমাজ ব্যবস্থা চতুর্বর্ণ নামে পরিচিত। ঈশ্বরের নির্দেশে স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থার আদিপর্বে চাতুর্বর্ণের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সমাজ জীবন আবর্তিত হত এবং চাতুর্বর্ণের ভিত ছিল জাতভেদ প্রথা। এই জাতভেদ প্রথার ওপরই ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল।

ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় চাতুর্বর্ণের ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল তা শুধু প্রশ্নাতীত-ই নয় বর্ণনারও অতীত। ইন্দো-আর্য সমাজে এই চাতুর্বর্ণের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর এবং দূরতিক্রম। পুরুষ সূক্ত অনুযায়ী যে সামাজিক বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল একমাত্র গৌতম বুদ্ধ ছাড়া সে সম্পর্কে অন্য কেউ প্রশ্ন তুলতে সাহস পাননি। কিন্তু বুদ্ধদেবও বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেননি। তার সহজ কারণ হল বুদ্ধদেবের সময়ে এবং বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পর তৎকালীন সমাজে বিধান দেওয়ার অসংখ্য লোক ছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল পুরুষ সূক্ত'র দেওয়া বিধানকে শুধু টিকিয়ে রাখাই নয় বরং তাকে প্রচার করা এবং ছড়িয়ে দেওয়া।

পুরুষ সূক্তর সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। এই প্রসঙ্গে 'অপস্তম্ব ধর্ম সূত্র' (Apastamba Dharma Sutra) এবং 'বশিষ্ঠ ধর্ম সূত্র'র (Vasishtha Dharma Sutra) উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

'অপস্তম্ব ধর্ম সূত্রে' (Apastamba Dharma Sutra) বলা হয়েছে, সমাজে চারটি জাত আছে। এগুলি হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এদের মধ্যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী জাত পরবর্তী জাত অপেক্ষা জন্মসূত্রে উঁচু শ্রেণীর। এদের মধ্যে শূদ্র এবং যারা অসামাজিক কাজ করেছে তাদের উপনয়নের, বেদ অধ্যয়নের এবং যজ্ঞ করার অধিকার নেই। ●

বশিষ্ঠ ধর্ম সূত্রে (Vasishtha Dharma Sutra) এক-ই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এতেও বলা হয়েছে, সমাজে চারটি জাত বা বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

● ১. প্রশ্ন-১, পটল-১, খণ্ড-১, সূত্র ৪-৫

২. প্রশ্ন-১, পটল-১, খণ্ড-১, সূত্র ৬

৩. মনু, অধ্যায়-২, শ্লোক ১-৪

৪. তদেব, অধ্যায়-১, শ্লোক ৩১

৫. তদেব, অধ্যায়-১০, শ্লোক ৪

৬. তদেব, অধ্যায়-২, শ্লোক ৬

বৈশ্য এবং শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের দ্বিতীয় বার জন্ম হয়। প্রথম জন্ম হয় মাতৃগর্ভ থেকে। আর দ্বিতীয় বার জন্ম হয় উপনয়নের সময়। দ্বিতীয় জন্মে মাতা হলেন সাবিত্রী এবং গুরু হলেন পিতা। তারা গুরুকেই পিতা বলে ডাকে কারণ তিনিই তাদের বেদমন্ত্রে দীক্ষা দেন। বিভিন্ন জাত তাদের উৎপত্তি ও সংস্কারের মধ্যে দিয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এছাড়া বেদে বর্ণিত আছে,—ব্রাহ্মণ হচ্ছে পুরুষ সূক্তর মুখ, ক্ষত্রিয় তার বাহু, বৈশ্য তার ঊরু এবং শূদ্রদের জন্ম তার পা থেকে। শূদ্রদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা কোনও সংস্কার পাবে না।

আরও অনেক আইন প্রণেতা তোতা পাখির মত 'পুরুষ সূক্তর' বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং এর পবিত্রতা সম্পর্কে বার বার জোর দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। পুরুষ সূক্তর পবিত্রতার আদর্শ নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলেছেন, হিন্দু ধর্মের স্থপতি মনু তাঁদের খারিজ করে দিয়েছেন। মনু দুটি কাজ করেছেন। প্রথমত পুরুষ সূক্তর আদর্শকে ঈশ্বরের নির্দেশ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন,

'পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য স্রষ্টা তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি করেন'।

এইক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর পূর্বসূরিদের অনুসরণ করেছেন। বরং এক্ষেত্রে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আর একটি প্রস্তাবনা সংযোজন করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, বেদ-ই হল ধর্মের একমাত্র এবং চূড়ান্ত অনুমোদন। এটা মনে রাখতে হবে, পুরুষ সূক্ত বেদের অংশ এবং এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে মনু পুরুষ সূক্তর চাতুর্বর্ণের আদর্শের কথা বলেছেন, মনু একে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং অভ্রান্ত বলে বর্ণনা করেছেন। মনুর পূর্ববর্তী সময়ে এমন ধারণা ছিল না।

দুই

এমতাবস্থায় পুরুষ সূক্তর পর্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পুরুষ সূক্ত অদ্বিতীয় বলে হিন্দুরা দাবি করে থাকেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় ধরনের দাবি; কারণ যখন এই ধারণার জন্ম হয়েছিল তখন মানুষের মন ছিল অকৃত্রিম এবং এখনকার মত উন্নত চিন্তাধারায় পুষ্ট ছিল না।

কিন্তু কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ সূক্তকে অদ্বিতীয় বলা হয়েছে তা বুঝতে পারলে

কেন এই দাবি করা হয়েছে তা মেনে নিতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

মূলত সমাজ গঠনের আদর্শ অর্থাৎ চাতুর্বর্ণের আদর্শের ভিত্তিতে পুরুষ সূক্তকে অদ্বিতীয় বলা হয়েছে। চাতুর্বর্ণে পুরুষ সূক্তকে অদ্বিতীয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণেই কি পুরুষ সূক্তকে অদ্বিতীয় বলা যায়? একটি আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা হিসাবে পুরুষ সূক্তকে যদি শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের কথা বলা হত তবেই একে অদ্বিতীয় বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু পুরুষ সূক্ততে কি বলা হয়েছে? এতে আদর্শ পন্থা হিসাবে শ্রেণী-সমন্বিত সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় কি একে অদ্বিতীয় বলা যায়? কেবলমাত্র একজন জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিক-ই এর সদর্থক উত্তর দিতে সক্ষম? বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান-ই কার্যত প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার শর্ত। এই ব্যবস্থা যে খুব একটা আদিম তা বলা যায় না। সারা বিশ্বের সব সমাজ ব্যবস্থার এটাই একটি স্বাভাবিক অবস্থা। তুলনামূলকভাবে উন্নত সমাজ ব্যবস্থায়ও ঐ এক-ই অবস্থা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পুরুষ সূক্ততে অদ্বিতীয় কিছু নেই। ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে সমাজ গঠিত হয়েছিল পুরুষ সূক্ততে তার থেকে নতুন আর বেশি কিছু বলা হয়নি।

এসব সত্ত্বেও পুরুষ সূক্তকে অদ্বিতীয় বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, বেশির ভাগ মানুষ জানেই না কেন পুরুষ সূক্তকে অদ্বিতীয় বলা হয় তার আসল কারণ। কিন্তু আসল কারণ জানার পরে পুরুষ সূক্তকে অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করে নিতে কারও আর দ্বিধা থাকবে না। শুধু তাই নয়, মানব সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে পুরুষ সূক্ত এক অমূল্য অদ্বিতীয় সংযোজন এবং এক অসাধারণ ও অকপট প্রকাশনা।

এখন দেখা যাক পুরুষ সূক্ততে কি সামাজিক আদর্শের কথা বলা হয়েছে যা তাকে অদ্বিতীয় বলে গণ্য করার গৌরব দিয়েছে?

প্রতিটি সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণীর সহাবস্থান যদিও প্রকৃত অবস্থা তা সত্ত্বেও কোনও সমাজ-ই এই অবস্থাকে আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করেনি। পুরুষ সূক্তর আদর্শ ছিল প্রকৃত ঘটনাকে আদর্শের মর্যাদায় উন্নীত করা। পুরুষ সূক্তকে অদ্বিতীয় হিসাবে গণ্য করার এটাই প্রথম বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, কোনও সম্প্রদায়-ই সমাজের শ্রেণী চরিত্রের প্রকৃত অবস্থাকে আদর্শ সমাজের আইনসঙ্গত স্বীকৃতি দেয়নি। এক্ষেত্রে গ্রীকদের কথা স্মরণীয়। এমনকি প্লেটো পর্যন্ত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী অবস্থানের

কথা বলেছেন। কিন্তু গ্রীকরা কখনই একে আইনের অনুমোদন দিয়ে বাস্তবায়িত করতে চায়নি। তৃতীয়ত, কোনও সমাজ-ই শ্রেণী অবস্থানের বিষয়টি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেনি। বড় জোর তারা একে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। পুরুষ সূক্ততে এর থেকে আবৃত বেশি কিছু বলা হয়েছে। এতে সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীর অবস্থানকে শুধুমাত্র যে স্বাভাবিক এবং আদর্শ বলা হয়েছে তাই নয়, একে পবিত্র এবং ঐশ্বরিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থত, ইতিহাসে যে সব সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে শ্রেণীর বিষয়টি কোনও মতবাদ হিসাবে স্বীকৃত হয়নি। রোমানদের মধ্যে ছিল দুটি শ্রেণী। মিশরীয়রা তিনটি শ্রেণীকেই যথেষ্ট মনে করত। ইন্দো-ইরানিদেরও তিনটি শ্রেণীর বেশি ছিল না;[৩] যেমন পুরোহিত, যোদ্ধা এবং কৃষক। কিন্তু পুরুষ সূক্ততে ধর্মমতের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর থেকে কম বা বেশি হতে পারে না। পঞ্চমত, সমাজে প্রত্যেকটি শ্রেণী তার গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান করে নেয় এবং সময়ের সঙ্গে তাদের অবস্থান পাল্টায়। কোনও সমাজব্যবস্থাকেই সরকারিভাবে অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। শ্রদ্ধা বা নিন্দার ভিত্তিতে কোনও শ্রেণীকেই নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু পুরুষ সূক্ত অদ্বিতীয় এই কারণে যে ধর্মের তকমা এঁটে সমাজে শ্রেণী বিভাগকে স্থায়ী করে দেওয়া হয়েছে এবং সময় বা পরিস্থিতিতে যার কোনও বদল ঘটবে না। চারটি শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের ভিত্তিতে এই শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী সবার ওপরে ব্রাহ্মণদের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ক্ষত্রিয়দের স্থান বৈশ্য ও শূদ্রদের ওপরে কিন্তু ব্রাহ্মণদের নিচে আর বৈশ্যদের স্থান ক্ষত্রিয়দের নিচে। কিন্তু শূদ্রদের ওপরে এবং শূদ্রদের অবস্থান সবার নিচে।

তিন

এইসব কারণের জন্যই পুরুষ সূক্তকে সম্পূর্ণ আলাদা বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুরুষ সূক্ত যে শুধু আলাদা তাই নয়, একে ব্যতিক্রমীও বলা যায়। এটা ব্যতিক্রমী, তার কারণ এটি রহস্যেভরা ধাঁ-ধা। খুব কম লোকই এ সম্পর্কে ভাল জানেন। কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি এর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন, তাহলে পুরুষ সূক্তর অন্তর্নিহিত ধাঁ-ধার স্বরূপ ও চরিত্র দেখে অবাক হবেন। পুরুষ সূক্ততে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা যে শুধু ঋকবেদে আছে তাই নয়; ঋগ্বেদে অন্য সৃষ্টিতত্ত্বেরও ব্যাখ্যা রয়েছে। ঋকবেদের দশম মণ্ডলের ৭২-তম শ্লোকে এই সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ আছে, এবং তা এই প্রকার[৪] :—

৩. সিভিলাইজেসন অব দি ইস্টার্ন ইরানিয়ানস্ ইন এইনশনট্ টাইমস্; গেইজার, খণ্ড-২, পৃ : ৬৪

৪. ঋগ্বেদ, উইলসন, খণ্ড-৬, পৃ : ১২৯

(১) ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভক্তরা পরবর্তীকালে সেই ঈশ্বরের পূজা করেন।

(২) ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট জগতে বাতাস সৃষ্টি করলেন, যেমন কর্মকার তার শিল্প সৃষ্টি করে। তারপর শূন্যতা থেকে সৃষ্টি শুরু হল।

(৩) ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথম দিকে শূন্যতা থেকে সৃষ্টির শুরু, তারপর সৃষ্টি হয় দিকচক্রকাল এবং তারপর সৃষ্টি হয় ঊর্ধ্বমুখী বৃক্ষরাজির।

(৪) ঊর্ধ্বমুখী বৃক্ষ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবী থেকে দিগন্ত, অদিতি থেকে দক্ষ এবং পরে দক্ষ থেকে অদিতির।

(৫) দক্ষের কন্যা অদিতি, দক্ষ ও অদিতির জন্মের পর দেবতাদের জন্ম হল। দেবতারা পূজা পান এবং অমর।

(৬) ঈশ্বর যখন একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে দেহধারী তখন তাঁর শরীর থেকে প্রবল ধূলির ঝড় ওঠে, মনে হয় তিনি নৃত্যরত।

(৭) ঈশ্বর তাঁর উজ্জ্বল রশ্মির দ্বারা মেঘ যেমন পৃথিবীকে ঢেকে দেয় তদ্রূপই পৃথিবীকে আবৃত করলেন এবং অতঃপর মহাসমুদ্রের গভীর থেকে সূর্যের উত্থান ঘটালেন।

(৮) অদিতির আট পুত্র। অদিতির দেহ থেকে আট পুত্রের জন্ম। সাত পুত্র নিয়ে অদিতি ঈশ্বরের কাছে আসেন এবং মার্তণ্ডকে শূন্যে পাঠিয়ে দেন।

(৯) সাত পুত্র নিয়ে অদিতি তাঁর পূর্বের জন্মে চলে যান, কিন্তু মার্তণ্ডকে রেখে যান মানুষের জন্ম-মৃত্যুর জন্য।

মূলগত এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যায় এই দুই ধরনের সৃষ্টি তত্ত্ব পুরোপুরি আলাদা। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্যতা থেকেই জীবের সৃষ্টি, আর দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী পুরুষ-ই সৃষ্টির আধার। এখন প্রশ্ন হল, কেন একই গ্রন্থে দু-ধরনের সৃষ্টিতত্ত্ব স্থান পেয়েছে? পুরুষ সূক্তর রচয়িতা কেন পুরুষকে দাঁড় করিয়ে তাঁকে সব সৃষ্টির আধার বলে বর্ণনা করলেন?

পুরুষ সূক্ত পাঠ করলেই জানা যায়, সৃষ্টি শুরু হয়েছে গাধা, ঘোড়া ও ছাগল দিয়ে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে কোথাও কিছু বলা হয়নি। একটা সময় যখন মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন এই পর্যায়ের ধারা

ছিন্ন হল এবং আর্য সমাজে শ্রেণী বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হল। প্রকৃতপক্ষে আর্য সমাজে চাতুর্বর্ণের ব্যাখ্যা দেওয়াই পুরুষ সূক্তর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। এই কাজ করতে গিয়ে পুরুষ সূক্ত শুধুমাত্র অন্য তত্ত্ব থেকে যে আলাদা ব্যাখ্যা দিল তাই নয়, ঋকবেদের অন্যান্য অংশের থেকেও আলাদা মতবাদ প্রচার করল।

সমাজে শ্রেণীবিভাগের ব্যাখ্যা দেওয়াকে কোনও মতবাদেই বড় হয়ে দেখা দেয় নি। ওল্ড টেস্টামেন্টের এক নম্বর অণুচ্ছেদের উদ্দেশ্য এবং ভাবধারা পুরুষ সূক্তর অনুরূপ। এতে মানুষ সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের শ্রেণী বিভাগের কিছু বলা হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে, পুরনো ইহুদি সমাজে সামাজিক কোনও বৈষম্য ছিল না। সব সমাজে সব সময়েই সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ছিল। ভারতের আর্য সমাজ তার ব্যতিক্রম নয়। তা সত্ত্বেও শ্রেণী বিভাগের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া কোনও মতবাদ-ই প্রয়োজন মনে করেনি। সুতরাং পুরুষ সূক্ত কেন শ্রেণী বিভাগের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়াকে প্রাথমিক দায়িত্ব বলে মনে করল?

ঋগ্বেদে একমাত্র পুরুষ সূক্তই যে সৃষ্টির মূল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে তাই নয়। ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ সম্পর্কে ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত অণুচ্ছেদগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঋগ্বেদ, ৯৬, ২ : প্রথম ধাপে তিনি অর্থাৎ অগ্নি তাঁর জ্ঞানায়ু দিয়ে এইসব মানব সন্তানদের সৃষ্টি করলেন; তাঁর উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে সৃষ্টি করলেন পৃথিবী এবং জলরাশি, ঈশ্বর অগ্নিকে ধনসম্পদ দাতা হিসাবে ভার দিলেন।

এখানে কিন্তু মানুষের আলাদা শ্রেণী সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই, যদিও এ ব্যাপারে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই যে ঋগ্বেদের সময় থেকেই ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণী বৈষম্য বিরাজ করত। তৎসত্ত্বেও ঋগ্বেদের এই অণুচ্ছেদে মানুষের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের সৃষ্টির কথা। অতএব পুরুষ সূক্ত কেন আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গিয়ে শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করল?

পুরুষ সূক্ত আর একটি বিষয়েও ঋগ্বেদের সঙ্গে বিপরীত ধর্মী মত পোষণ করে। ইন্দো-আর্যদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঋগ্বেদ যে একটি নিরপেক্ষ মতবাদ পোষণ করে তা নিম্নলিখিত অণুচ্ছেদ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

(১) ঋগ্বেদ, i, ৮০.১৬ : প্রার্থনা এবং স্তোত্র ইতিপূর্বেই ইন্দ্রতে এমনভাবে

একত্রীভূত হয়েছিল পিতা মনু এবং দধ্যাঞ্চ তা উদ্‌যাপন করেন।[৫]

(২) ঋগ্বেদ, i, ১১৪, ২ : ত্যাগ ও উৎসর্গের দ্বারা পিতা মনু যে সম্পদের অধিকারী অথবা উদ্ধারকারী হিসাবে অধীশ্বরের ভূমিকা পেয়েছিলেন তা সবই রুদ্রের কর্তৃত্বে আমরা লাভ করতে পারি।[৬]

(৩) ঋগ্বেদ ii, ৩৩, ১৩ : এইভাবে প্রার্থনা করতে হবে, হে মরুত যা কিছু তোমার পবিত্র পূর্ণতার সমাধান। হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যা কিছু তোমার পবিত্র, যা কিছু মঙ্গলকারী, যা কিছু আমাদের পিতা মনু চেয়েছিলেন সেসব কিছু এবং উদ্ধারকারী রুদ্রের আশীর্বাদ সবই আমি চাই।[৭]

(৪) ঋগ্বেদ viii, ৫২, ১ : প্রাচীন কালের বিশ্বাসে ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। পিতা মনু তাঁর উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা করেছেন যার মাধ্যমে ঈশ্বরের সমীপে পৌঁছানো যায়।[৮]

(৫) ঋগ্বেদ iii, ৩, ৬ : অগ্নি, ঈশ্বর এবং মানুষের সন্তানদের সাহায্যে স্তোত্র সহযোগে ষোড়শোপচারে নিবেদন করে।[৯]

(৬) ঋগ্বেদ iv, ৩৭, ১ : 'হে ঈশ্বর, রাজস্‌ ও রিভুক্ষণ, যে পথে দেবতারা করেন, সে পথেই আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হোন, যাতে মানুষ শুভ মুহূর্তে যজ্ঞ করতে পারে।'[১০]

(৭) ঋগ্বেদ vi, ১৪, ২ : মানুয যজ্ঞে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বানকারী বলে স্তব করেন।[১১]

এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যেসব ঋষি ঋগ্বেদের স্তোত্র রচনা করেছিলেন, তাঁরা মনুকে ইন্দো-আর্যদের পূর্বপুরুষ বলে বর্ণনা করেছিলেন। ইন্দো-আর্যদের পূর্বপুরুষ হিসাবে মনুকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই মতবাদের ভিত্তি এতই গভীরে যে তা ব্রাহ্মণে এবং পুরাণেও বর্ণিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণ,[১২]

---

৫. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ: ১৮০
৬. তদেব, পৃষ্ঠা : ১৬২
৭. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১ পৃ : ১৬৩
৮. তদেব, পৃ : ১৬৩
৯. তদেব, পৃ : ১৬৫
১০. তদেব, পৃ : ১৬৫
১১. তদেব, পৃ : ১৬৫
১২. ম্যুর কর্তৃক উদ্ধৃত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা : ১১০-১১২

বিষ্ণু পুরাণ[১৩] এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও[১৪] এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা সত্য যে ব্রহ্মাকেই মনুর পিতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি ঋগ্বেদের তত্ত্ব অনুযায়ী মনুকে যে মানুষের আদি পুরুষ বলা হয়েছে তাও স্বীকার করা হয়েছে।[১৫] সুতরাং পুরুষ সূক্ততে মনুর কোনও উল্লেখ নেই কেন? এটা খুব-ই বিস্ময়ের। কারণ পুরুষ সূক্তর রচয়িতা জানতেন বলেই মনে হয় মনু স্বয়ম্ভুবকে বিরাজ বলা হয় এবং বিরাজকেই বলা হয় আদি পুরুষ।[১৬] কারণ সূক্তর পঞ্চম শ্লোকে মনুকে 'বিরাজো আদি পুরুষ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া আরও একটা কারণে মনে হয় পুরুষ সূক্ত ঋগ্বেদকেও ছাড়িয়ে গেছে। বৈদিক আর্যগণ যথেষ্ট উন্নত ছিলেন এবং তাঁরা শ্রম বিভাগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বৈদিক আর্য সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করতেন। তাঁরা যে শ্রম বিভাগ সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন, তা নিম্নলিখিত শ্লোক থেকেই স্পষ্ট :

ঋগ্বেদ i, ১১৩, ৬ : 'কেউ ক্ষমতার জন্য, কেউ যশ বা খ্যতির জন্য, কেউ সম্পদের আর কেউ বা সেবার জন্য কাজ করছে, ঊষা মানুষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং প্রতিটি মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য বিশেষ বিশেষ আলাদা কাজে বেরিয়ে পড়তে পারে'। ঋগ্বেদ মোটামুটিভাবে এমন কথা বলা হয়েছে, কিন্তু পুরুষ সূক্ততে আরও বেশি কিছু বলা হয়েছে। পুরুষ সূক্ততে শ্রম বিভাগের ধারা অনুসরণ করে কাজের শ্রেণী অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে তাকে স্থায়ী কর্মভিত্তিক শ্রেণীতে পরিণত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং পুরুষ সূক্ততে কেন এই স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে?

এছাড়া আরও একটি বিষয়ে পুরুষ সূক্তর সঙ্গে ঋগ্বেদের প্রভেদ রয়েছে। ঋগ্বেদে শুধুমাত্র মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই নয়; এতে ইন্দো-আর্য জাতির কথাও বলা

---

১৩. ম্যুর কর্তৃক উদ্ধৃত, খণ্ড-১, পৃ : ১০৫-১০৭

১৪. ম্যুর কর্তৃক উদ্ধৃত, খণ্ড-১, পৃ : ১০৮

১৫. বিস্তারিত আলোচনায় গেলে বুঝা যায় যে, অনেক ভ্রান্তি রয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা স্বয়ং নিজেকে নর ও নারীতে ভাগ করেন; এক ভাগ পুরুষ এবং অন্য অর্ধেক ভাগ হল নারী। নারীকে বলা হয়েছে শতরূপা, যে নিরন্তর সাধনায় স্বয়ম্ভু মনুকে প্রতিরূপ হিসাবে লাভ করেন। বিষ্ণু পুরাণে ব্রহ্মার তাঁর কন্যার সঙ্গে সহবাসের কোনও প্রসঙ্গ নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং মৎস্য পুরাণে অন্যপক্ষে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা নিজের কন্যা শতরূপার সঙ্গে সহবাসের ফলে মনুর উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্য পুরাণে একথাও বলা হয়েছে যে, মনু তপস্যা করে অজন্তা নামক সুন্দরী পত্নীলাভ করেন। রামায়ণ (ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ : ১১৭) অনুসারে মনু পরুষ নয়, নারী এবং দক্ষ প্রজাপতির কন্যাও কশ্যপের পত্নী।

১৬. মৎস্য পুরাণ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ : ১১১, এফ এন.

হয়েছে। এই জাতি পাঁচটি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত এবং ঐ গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করে ইন্দো-আর্য জাতি গঠিত হয়েছে। পাঁচটি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে যে এই একটি জাতি গঠিত হয়েছে নিম্নলিখিত স্তোত্রতে তার উল্লেখ রয়েছে।

(১) ঋগ্বেদ vi, ১১.৪ : অগ্নিকে উৎসর্গ করে ঘিরে রয়েছে পাঁচটি গোষ্ঠী—অগ্নিকে তারা শ্রদ্ধা, সম্মান ও অর্ঘ্য নিবেদন করছে, যেন অগ্নি একজন মানুষ।[১৭]

(২) ঋগ্বেদ vii, ১৫.২ : জ্ঞানী ও যৌবন দীপ্ত গৃহকর্তা (অগ্নি) পাঁচটি গোষ্ঠীর প্রতিটি বাড়িতেই অধিষ্ঠিত। এই পাঁচ গোষ্ঠী কারা সে সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।[১৮]

যক্ষ বলেছেন, এই গোষ্ঠীগুলি হল গন্ধর্ব, পিতৃ, দেব, অসুর এবং রাক্ষস।

উপমন্যুর মতে এই গোষ্ঠীগুলি হল চারবর্ণ এবং নিষাদ এই দুটি ব্যাখ্যাই অবাস্তব বলে মনে হয়। প্রথমত, পাঁচটি গোষ্ঠীকে যে যুগ্মভাবে বন্দনা করা হয়েছে তা নিম্নলিখিত স্তোত্র থেকে জানা যাবে :

(১) ঋগ্বেদ, ii, ২, ১০ : 'পাঁচটি গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের গৌরব মহিমান্বিত এবং এই গৌরব অনতিক্রম'।[১৯]

(২) ঋগ্বেদ, vi, ৪৬, ৭ : 'ইন্দ্র, যে বীরত্ব ও শক্তি নহুষ গোষ্ঠীতে বর্তমান অথবা যে গৌরব পাঁচ গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান তা সবই আমাদের'।[২০]

এই পাঁচ গোষ্ঠীর মধ্যে শূদ্রদের যদি অন্তর্ভুক্ত করা হত তাহলে এমন জোরালো বক্তব্য আদৌ পেশ করা যেত না। এছাড়া 'বর্ণ' এই শব্দটিও এখানে ব্যবহার করা হয়নি। যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল 'জন'। এতে পাঁচটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে, চারটি বর্ণের নয় এবং ঋগ্বেদের নিম্নোক্ত শ্লোক থেকেই নিষাদ এই শব্দটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ i, ১০৮, ৮ : যদি ইন্দ্র ও অগ্নি যদু (Yadus), তুর্বস (Turvaśas),

১৭. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ: ১৭৭
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা : ১৭৮
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা : ১৭৮
২০. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ : ১৮০

দ্রুহ্যু (Druhyus), অনু (Anus), পুরুর (Purus) মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন, বিখ্যাত বীররা সমস্ত জায়গা থেকে এসে প্রদত্ত সোমরস পান করবেন।[২১]

এই পাঁচটি উপজাতি যে একটি আর্য জাতিতে পরিণত হয়েছে তা অথর্ববেদে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে :

'মনুর থেকেই এই পাঁচটি উপজাতির উৎপত্তি হয়েছে'।

এক ধরনের একাত্মবোধ এবং সচেতনতা থাকলেই একমাত্র উপলব্ধি করা সম্ভব কেন ঋগ্বেদের ঋষিরা তাঁদের স্তোত্রে এইভাবে পাঁচটি উপজাতির বর্ণনা দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন পুরুষ সূক্ত এই পাঁচটি উপজাতির ঐক্যকে স্বীকার করে নেয়নি এবং তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেয়নি? পরিবর্তে পুরুষ সূক্ত কেন এই উপজাতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছে? কেন পুরুষ সূক্ততে জাতীয়তাবাদের থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

পুরুষ সূক্ততে যে সব ধাঁ-ধা রয়েছে, এগুলি তার কয়েকটি মাত্র। ঋগ্বেদের সঙ্গে পুরুষ সূক্তর তুলনা করলেই বিষয়টি সামনে এসে যায়। তাছাড়া সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি পুরুষ সূক্তকে বিচার করা যায় তাহলে আরও কয়েকটি বিষয় এসে যাবে।

সমাজে আদর্শ রীতি-নীতি থাকা ভাল এবং তার প্রয়োজনও রয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা কোনও সমাজ রীতি-নীতি ছাড়া চলতে পারে না। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রীতি-নীতিও বদলানো দরকার। কোনও রীতি-নীতিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা উচিত নয়। আমাদের সমাজে প্রচলিত যেসব রীতি-নীতি রয়েছে তার অবশ্যই পুনর্মূল্যায়ন হওয়া উচিত। আমাদের সমাজের রীতি-নীতি বা মূল্যবোধকে পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব যদি তার ওপর অলঙ্ঘনীয় শর্ত চাপানো না হয়। আর অলঙ্ঘনীয় শর্ত চাপালেই রীতি-নীতি বা মূল্যবোধের সংস্কার বা পরিবর্তন করা যায় না। তখন বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায়, যখন একে অলঙ্ঘনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে তখন চিরকাল তা বলবৎ থাকবে। পুরুষ সূক্ত চাতুর্বর্ণকে একটি অলঙ্ঘনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে, পরিণত করেছে একে এক দৈবী প্রতিষ্ঠানে। পুরুষ সূক্ত কেন এটা করল যার ফলে একটি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা সমালোচনার ঊর্ধ্বে থেকে যাবে এবং কোনও পরিবর্তন করা যাবে না? কেন পুরুষ সূক্ত একে

২১. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১৭৯

একটি স্থায়ী রীতিনীতি বলে ব্যাখ্যা দিল যা সমালোচনার ঊর্ধ্বে এবং অপরিবর্তনীয় এটাই পুরুষ সূক্তর প্রথম প্রহেলিকা। সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রই এর দ্বার আলোড়িত হয়।

চাতুর্বর্ণ এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরুষ সূক্তর ভূমিকা দুই রকমের। প্রথমত ইন্দো-আর্য সমাজে চারটি বর্ণের অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরুষ সূক্ত ব্যাখ্যা দেয় এবং একে আদর্শ বলে প্রচার করে। এটি একটি প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ এই আদর্শ প্রকৃত ঘটনার থেকে আলাদা নয়। চাতুর্বর্ণকে আদর্শের স্তরে উন্নীত করার পর পুরুষ সূক্তর পরবর্তী কাজ হয় কেন এটি এক আদর্শ তার ব্যাখ্যা দেওয়া। এটাও আর এক ধরনের প্রবঞ্চনা। কারণ, সত্যের মধ্যেই আদর্শ থেকেই যায়, সত্যকে আদর্শ আর আদর্শকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার পুরুষ সূক্তর এই যে প্রচেষ্টা এটা এক ধরনের রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি নিশ্চিত এই ধরনের প্রচেষ্টা অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাবে না। সুতরাং পুরুষ সূক্তর মতবাদকে শঠতা বা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এই ঘটনাকে আদর্শ বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হলে তা হবে অত্যন্ত স্বার্থপর ব্যাপার, কারণ এতে মমতার অভাব রয়েছে। যখন কোনও ব্যক্তি কোনও জিনিসের মধ্যে ব্যক্তিগত সুবিধা খুঁজে পায় তখন-ই সে এই ঘটনাকে আদর্শ বলে মেনে নিতে পারে। এই ধরনের মতাদর্শকে সত্যি বলে প্রচার করার চেষ্টা একটি জঘন্য অপরাধ। এর অর্থ একটি স্থায়ী অসাম্য জিইয়ে রাখা এবং একবার যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা চিরকালের জন্য মেনে নেওয়া। এই ধরনের মতামত নীতিজ্ঞানের চরম পরিপন্থী। যে সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সচেতনতা আছে সেখানে কোনও অবস্থাতেই এই মতবাদ গ্রহণ করবে না। পরন্তু এটা বলা যায়, ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের ফলে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে এমন একটি মতবাদ যা হল, যে বিষয়টি ভুল করে নির্ধারিত হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না এবং অবশ্যই তা পুনরায় নির্ধারিত হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে পুরুষ সূক্তর অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় অপরাধমূলক এবং এর ফল হয় সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। কারণ, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পুরুষ সূক্তর কাজ হল একটি শ্রেণীর জন্য অন্যায়ভাবে সুবিধা করে দেওয়া এবং অন্য শ্রেণীদের ওপর শোষণ করা। পুরুষ সূক্তর এই ধোঁকাবাজির পিছনে কোন্ অভিসন্ধি কাজ করছে? এটি হচ্ছে পুরুষ সূক্তর দ্বিতীয় ধাঁধা। পুরুষ সূক্তর মতবাদকে যদি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় তাহলে চূড়ান্ত

এবং সব থেকে বড় ধাঁধাটি হল পুরুষ সূক্তর বিচারে শূদ্রদের অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়। শ্রেণী বিভাগের অস্তিত্ব নিয়ে পুরুষ সূক্ত ব্যাখ্যা দেয়। পুরুষ সূক্তর বিচারে চতুর্বর্ণ হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি। কোনও মতবাদই এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেনি। পুরুষ সূক্ত নিজেই একটি প্রহেলিকা। আরও সবথেকে অবাক করার মতো কাণ্ড হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীকে ঈশ্বরের বিভিন্ন শ্রেণী বলে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। বিভিন্ন শ্রেণীকে পুরুষ সূক্ত যেভাবে ঈশ্বরের দেহের বিভিন্ন অংশ বলে যুক্তি খাড়া করেছে তা কিন্তু কোনও দৈব ঘটনা নয়। এটি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। এই পরিকল্পনার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সূত্র উদ্ভাবন করা যার মাধ্যমে দুই ধরনের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এর একটি হচ্ছে এর মাধ্যমে চারটি শ্রেণীর কাজকর্ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং দ্বিতীয়টি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক অবস্থান ঠিক করে দেওয়া। বিভিন্ন শ্রেণীকে ঈশ্বরের বিভিন্ন অংশ হিসাবে বর্ণনা করে পুরুষ সূক্ত শ্রেণী বিভাগের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। এতে শ্রেণীর অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে এবং এই সামাজিক অবস্থানই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাজকর্ম নির্দেশ করে দিয়েছে। ব্রাহ্মণকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের মুখ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের মধ্যে মুখই হচ্ছে সর্বোত্তম তাই ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের শ্রেষ্ঠ। যেহেতু বর্ণশ্রেষ্ঠ তাই ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সবথেকে ভাল কাজ। সেই কাজ হল জ্ঞান ও বিদ্যাদানের অধিকার। ক্ষত্রিয়কে বর্ণনা করা হয়েছে ঈশ্বরের হাত রূপে। মানবদেহের অঙ্গ প্রতঙ্গের মধ্যে মুখের পরই হচ্ছে হাত। এই জন্যই ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে ব্রাহ্মণদের পরবর্তী ধাপের কাজ এবং সে কাজ বিদ্যাদানের পরের ধাপ, দেশরক্ষা। বৈশ্যদের সৃষ্টিকর্তার ঊরুদেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অঙ্গ প্রতঙ্গের শ্রেণী-বিন্যাস অনুযায়ী হাতের পরেই ঊরুর স্থান। সুতরাং ক্ষত্রিয়দের পরবর্তী ধাপের কাজ অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রাচীন কালে অর্থাৎ আর্য যুগে সমাজে যোদ্ধাদের পরে ব্যবসায়ীদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল, কারণ তারাই দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান জোগাত। ঈশ্বরের পা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে শূদ্রদের। মানব দেহের সবথেকে নিচের এবং ঘৃণীত অংশ পা। সেই অনুযায়ী শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সামাজিকভাবে সবথেকে নিচু কাজ; অর্থাৎ অন্য বর্ণের জাতিদের সেবা করা।

চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি সম্পর্কে পুরুষ সূক্ত এই ধরনের একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করল কেন? কেন পুরুষ সূক্ত শূদ্রকে ঈশ্বরের পা রূপে বর্ণনা করেছে? চাতুর্বর্ণ সম্পর্কে

পুরুষ সূক্ত অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি কেন? সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে পুরুষ সূক্তর ব্যাখ্যাই সব নয়। বেদের উৎপত্তি সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এ ব্যাপারে তার স্মরণ নেওয়া যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে :[২২]

'প্রজাপতি বিশ্বে উত্তাপ সঞ্চার করলেন এবং সেই উত্তাপের আগুন থেকেই তিনি সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করলেন যেমন, তিনি পৃথিবী থেকে অগ্নি, আকাশ থেকে বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে সূর্য সৃষ্টি করলেন। এই তিন দেবতার মধ্যে প্রজাপতি আবার উত্তাপ সঞ্চার করলেন এবং তাদের উত্তাপ থেকেই সৃষ্টি করলেন অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ এবং সূর্য থেকে সামবেদের। প্রজাপতি এরপর এই তিনটির মধ্যে অগ্নি সঞ্চার ঘটিয়ে সৃষ্টি করলেন ঋগ্বেদ থেকে 'ভূ' যজু থেকে 'ভুব' এবং সাম থেকে 'স্বর'।'

এই ব্যাখ্যায় বিভিন্ন দেবতা থেকে বেদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইন্দো-আর্য সমাজে দেবতার অভাব নেই। ত্রিশ কোটি দেবতা রয়েছেন। চার দেবতা থেকে চাতুর্বর্ণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমেই জন্মসূত্রে চারটি শ্রেণীর মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব। পুরুষ সূক্ত কেন এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি?

তাছাড়া পুরুষের বিভিন্ন মুখ থেকে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়াও পুরুষ সূক্তর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়াও কোনও কষ্টসাধ্য কাজ ছিল না। কারণ পুরুষ সূক্তর পুরুষের এক হাজার মাথা আছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং এক এক মুখ থেকে এক শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যেত। সৃষ্টিতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা পুরুষ সূক্তর অজানা ছিল না, কারণ বিভিন্ন বেদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিষ্ণু পুরাণে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত বক্তব্য থেকে এর সত্যতা বোঝা যাবে :[২৩]

'ব্রহ্মা তাঁর পূর্বমুখ থেকে গায়ত্রী রচনা করলেন। এছাড়া রচনা করলেন ঋগ্বেদ, ত্রিবৃত্ত, সামবেদের-রথান্তর এবং যজ্ঞের মন্ত্র অগ্নিস্তোম। ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখমণ্ডল থেকে সৃষ্টি হল যজুর্বেদের স্তোত্র, ত্রিষ্টুভ ছন্দ, পঞ্চদশ-স্তোম, বৃহত্তম এবং উক্ত। ব্রহ্মা তাঁর পশ্চিম দিকের মুখ থেকে সৃষ্টি করলেন সামবেদের শ্লোক, জগতি ছন্দ, সপ্তদশ-স্তোম, ভৈরূপা এবং অতিরাত্র। আর উত্তর দিকের মুখমণ্ডল থেকে ব্রহ্মা

২২. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-৩, পৃ: ৫
২৩. তদেব, পৃ : ১১

সৃষ্টি করলেন একবিংশ, অথর্বন, অপ্তোর্যমের সঙ্গে অনুষ্টুপ এবং বিরজ ছন্দ।'

বেদের উৎপত্তি সম্পর্কে হরিবংশতে অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হরিবংশের মতে, 'ঈশ্বর তার চোখ থেকে ঋক এবং যজুর্বেদ সৃষ্টি করেছেন, সামবেদের উৎপত্তি হয়েছে তাঁর জিহ্বা থেকে এবং মাথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে অথর্ববেদের'।

এখন কোনও কারণে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে পুরুষ সূক্তর রচনাকারের চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে ঈশ্বরের শরীর এবং বিভিন্ন অংশ ব্যবহার না করে উপায় ছিল না, তা সত্ত্বেও প্রশ্নটি কিন্তু থেকেই যায় সেভাবে পুরুষ সূক্তর রচনাকার বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে পুরুষ সূক্তর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করলেন কেন?

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে দেখা যায়, একমাত্র পুরুষ সূক্তই ঈশ্বরের দেহের বিভিন্ন অংশ উপমা হিসাবে ব্যবহার করছে তাই নয়, ঋষি বৈশম্পায়নও ঐ একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিষয়টি এজন্যই অত্যধিক গুরুত্ব পেয়ে যায়। যজ্ঞের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পুরোহিতদের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনিও ঈশ্বরের দেহের বিভিন্ন অংশের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুরুষ সূক্তর ব্যাখ্যা আর ঋষি বৈশম্পায়নও ব্যাখ্যার মধ্যে কি প্রবল তফাত! হরিবংশ পুরাণে ঋষি বৈশম্পায়নের ব্যাখ্যার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা এইরূপ :[২৪]

'মহিমান্বিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হরি নারায়ণ আসক্তি মুক্ত হয়ে মহাশক্তিশালী হাত নিয়ে মহাসমুদ্রের মত দিগন্ত বিস্তৃত তরল জলরাশির মধ্যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণ তাঁকে অবিনশ্বর বলে মনে করেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর নিজস্ব আলোকে আলোকিত হয়ে কঠোর আত্মসংযমের মধ্যে হরি নারায়ণ নিদ্রামগ্ন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু সবার ঊর্ধ্বে। পুরুষ এবং পুরুষের নামে যা কিছু আছে সবকিছুই নিবেদিত। এখানে যারা ব্রাহ্মণ, যারা পূজা-অর্চনার কাজে নিবেদিত তারা ঈশ্বরের দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে নিবেদনের জন্য। ঈশ্বর তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করলেন, এবং তাঁদের স্থান সবার ঊর্ধ্বে। এরপর তিনি সৃষ্টি করলেন উগতৃ, তাঁরা সামবেদের মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বাহু থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন হোতৃ এবং অধ্যর্যু এর পরের অধ্যায়ে তিনি সৃষ্টি করলেন, প্রস্তোতৃ, মৈত্রবরুণ এবং প্রতিষ্ঠাতৃ। এছাড়া তিনি তাঁর পেট থেকে উৎপন্ন করলেন প্রতিহতৃ এবং পোতৃ।

---

২৪. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ: ১৫৪-১৫৫

ঈশ্বর তাঁর উরুদেশ থেকে তৈরি করলেন অচ্ছাভুক এবং নেস্ত্ৃ। হাত থেকে সৃষ্টি করলেন, অগ্নিধ্র এবং হোতৃয় ব্রাহ্মণ। বাহু থেকে সৃষ্টি করলেন গ্রবণ এবং উন্নেত্রী। এইভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ১৬ জন উত্তম ঋত্বিজকে সৃষ্টি করলেন। তাঁরা যে কোনও যজ্ঞের জন্য মন্ত্র পড়বেন। সুতরাং এঁরা পুরুষ যজ্ঞ থেকে তৈরি এবং বেদ বলে বর্ণিত, এবং তাঁর থেকেই সব বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ এবং যজ্ঞের উৎপত্তি হয়েছে।'

যজ্ঞের জন্য বিভিন্ন ধরনের মোট ১৭ জন পুরোহিত প্রয়োজন। এখন শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তার দেহের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাঁর পা বাদ দিয়ে কারও পক্ষেই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ পুরুষের অঙ্গ প্রতঙ্গের সংখ্যা যাজকদের সংখ্যার তুলনায় কম। তা সত্ত্বেও বৈশম্পায়ন কি করেছেন? তিনি সৃষ্টিকর্তার দেহের একটি অংশ থেকে একাধিক যাজকের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পা থেকে কোনও শ্রেণীর উৎপত্তির বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

হরিবংশে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্পর্কে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আর পুরুষ সূক্ততে যেভাবে শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—এ ব্যাপারে তুলনা করতে গেলে এটি একটি ষড়যন্ত্রের ব্যাপার বলেই মনে হয়। একমাত্র বিদ্বেষবশতই কি পুরুষ সূক্ততে বলা হয়েছে শূদ্র পুরুষের পা থেকে সৃষ্টি এবং তাদের কাজ হল সেবা করা? যদি তাই হয়, তাহলে এই বিদ্বেষের কারণ কি?

চার

শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে যে সমস্ত প্রহেলিকার কথা এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে, পুরুষ সূক্তকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। সমাজে শূদ্রদের অবস্থান সম্পর্কে আরও রহস্য রয়ে গেছে। চাতুর্বর্ণের ক্রম বিবর্তনের ফলে ঐসব রহস্য তথা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এই ফলাফল বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

চাতুর্বর্ণের পরবর্তী পর্যায় প্রধানত দুটি। প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে পঞ্চম বর্ণের সৃষ্টি। এদের অবস্থান শূদ্রদের নীচে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য থেকে শূদ্রদের আলাদা করে দেওয়া। এই পরিবর্তন পুরুষ সূক্তর সঙ্গে এমন-ই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে যে এর দ্বারা যেসব শব্দ বা বক্তব্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে, যার অর্থ

সবারই জানা। এই শব্দগুলি হল স্ববর্ণ, অবর্ণ, দ্বিজ, অদ্বিজ, এবং ত্রৈবর্ণিক। মূল চারটি শ্রেণীর মধ্যে বিভাজন তৈরির জন্য এইগুলিকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য কতটা তা বুঝাতেও এগুলি ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে তুলনামূলক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। কারণ এগুলি নতুন করে আর একটি ধাঁ-ধার সৃষ্টি করে। দুটি কারণের জন্যই প্রধানত এই নতুন ধাঁ-ধা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। প্রথমত এগুলি শুধু নামই নয় বরং নির্দিষ্ট অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার বিষয়—কিন্তু গবেষকরা এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। দ্বিতীয়ত, এই নামের আড়ালে যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, তাতে যে অধিকার ও সুবিধার কথা বলা হয়েছে তা কতটা যুক্তিযুক্ত তা ঐ গবেষকগণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেননি।

এখন এই সমস্ত শব্দের যথার্থ গূঢ় অর্থ কি তা আমাদের দেখা দরকার। স্ববর্ণের সঙ্গে অবর্ণের তুলনা করা হয়ে থাকে। স্ববর্ণের অর্থ চাতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও ব্যক্তি। আর অবর্ণের অর্থ এই চাতুর্বর্ণের বাইরের যে কোনও লোক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হচ্ছে স্ববর্ণ। অস্পৃশ্য অর্থাৎ অতি শূদ্ররা হচ্ছে অবর্ণ। তারা কোনও বর্ণভুক্ত নয়। এখানে যুক্তিতর্কের বিচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র চাতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। আর অস্পৃশ্য বা অতিশূদ্ররা চাতুর্বর্ণের বাইরে। দ্বিজর সঙ্গে অদ্বিজরও তুলনা করা হয়ে থাকে। দ্বিজ শব্দের আক্ষরিক অর্থ—যার দুবার জন্ম হয়। আর অদ্বিজ বলা হয় যাদের একবার মাত্র জন্ম হয়। যাদের পবিত্র উপবীত ধারণ করার অধিকার আছে, তাদের দ্বিজ বলা হয়। আর যাদের পবিত্র উপবীত ধারণ করার কোনও অধিকার নেই, তাদের অদ্বিজ বলা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের উপবীত ধারণ করার অধিকার আছে এবং তারাই দ্বিজ। শূদ্র এবং অতি শূদ্রদের উপবীত ধারণ করার কোনও অধিকার নেই। সুতরাং তারা অদ্বিজ। ত্রৈবর্ণিককেও শূদ্রদের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই তুলনার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নেই। দ্বিজ এবং অদ্বিজর মধ্যে যে পার্থক্য, শূদ্র এবং ত্রৈবর্ণিকার মধ্যেও সেই একই পার্থক্য। তবে একটি পার্থক্য অবশ্য আছে। সেটি হল এই প্রভেদ শুধুমাত্র শূদ্রতেই সীমিত এবং অতিশূদ্ররা তার আওতায় পড়ে না। এর সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, অতিশূদ্ররা আলাদা শ্রেণী হিসাবে পরিচিত হবার আগেই এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল।

সুতরাং একথা মনে রাখতে হবে, যখন শূদ্র এবং অতিশূদ্র উভয়ই অদ্বিজ, তখন শূদ্রদের কেন স্ববর্ণ এবং অতিশূদ্রদের অবর্ণ বলা হয়? কেন শূদ্ররা চাতুর্বর্ণের

অন্তর্ভুক্ত এবং অতিশূদ্ররা চাতুর্বর্ণের বাইরে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র নিয়েই যখন চাতুর্বর্ণ এবং তাদের স্ববর্ণ বলা হয়, তখন কেন শূদ্রদের ত্রৈবর্ণিকের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়?

শূদ্রদের নিয়ে যে প্রহেলিকা রয়েছে, তার থেকেও কি বড় কোনও প্রহেলিকা রয়েছে তাহলে? অবশ্যই রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন তথ্যানুসন্ধান এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার। তাহলে দেখা যাবে, এই শূদ্র কারা এবং কেমন করেই বা তারা ইন্দো-আর্য সমাজে চতুর্থ বর্ণরূপে পরিগণিত হল।

□ □

অধ্যায় ২

শূদ্র সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য মতবাদ

শূদ্র সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের কি ব্যাখ্যা আছে? কোনও সন্দেহ নেই যে বিশ্বের সৃষ্টি, মানুষের ও বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য অনেক কাহিনীতে পূর্ণ। এই সাহিত্য শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনও সূত্রের সন্ধান দিক বা না দিক, শূদ্রদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কোনও গ্রন্থে এই তত্ত্বের অবশ্যই স্থান থাকে। অন্য কোনও কারণে যদি নাও হয়, তথাপি শূদ্রদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার, কারণ এতে তাদের সম্পর্কে সব কিছু জানা সম্ভব হবে। এর জন্য প্রয়োজন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের প্রতি খণ্ড আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা। তাহলে দেখা যাবে প্রতি খণ্ড কীভাবে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে।

এক

বেদ দিয়ে শুরু করতে হলে প্রথমেই ঋগ্বেদের কথাই আসে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ঋগ্বেদে যে কাহিনী প্রচলিত তা এর সূক্ততে পাওয়া যায়। এই সূক্ত পুরুষ সূক্ত নামে পরিচিত। এই পুরুষ সূক্ত সম্পর্কে ইতিমধ্যেই প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন দেখা যাক অন্যান্য বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কি ধরনের আলোচনা হয়েছে।

যজুর্বেদের দুটি টীকা আছে : (১) শুক্ল যজু : এবং (২) কৃষ্ণ যজু :। প্রথমে শুক্ল যজু : নিয়ে আলোচনা করা যায়। শুক্ল যজু:র বাজসনেয়ি (Vajasaneyi) সংহিতায় দুই ধরনের মতবাদের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তর পুনরুল্লেখ মাত্র। শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, ঋগ্বেদে ১৬টি স্তোত্র আছে আর এতে ২২টি স্তোত্র আছে। শুক্ল যজু:র অতিরিক্ত ছটি স্তোত্র নিচে দেওয়া হল :

(১৭) বিস্তৃত জলরাশি থেকে উৎপন্ন করে মেদিনী থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে বিশ্বকর্মা সর্বপ্রথম তাঁকে প্রথম সৃষ্টি করলেন এবং তষ্টা তাঁকে দিলেন আকার। এইভাবে সবার প্রথমে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করে পুরুষের সৃষ্টি হল।

(১৮) অন্ধকার ভেদ করে সূর্যোকরোজ্জ্বলসম এই মহান পুরুষের কথা আমি জানি এবং তাঁকে জানার মধ্যে দিয়েই একজন মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি, এ ভিন্ন অন্য কোনও পথ নেই।

(১৯) অজাত প্রজাপতি গর্ভের মধ্যে সঞ্চার করেন এবং অনেক রূপেই তাঁর জন্ম হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তার উৎস দেখতে পান এবং তাঁরাই মারীচির স্থান গ্রহণ করতে চান।

(২০) দেবতা, দেব-পুরোহিত এবং দেবতাদের পূর্বে জাত যে কেউ-ই ব্রহ্মার সেই সৃষ্টিকে প্রণাম করেন।

(২১) ব্রহ্মার সেই উজ্জ্বল পুরুষ সম্পর্কে দেবতারা গোড়াতেই বললেন, 'ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ এবং দেবতারা তার অধীন থাকবেন'।

(২২) শ্রী এবং লক্ষ্মী তার ভার্যা, দিন-রাত্রি তার উভয় দিক, তারকারা তার অলঙ্কার এবং আশ্বিন তার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। তুমি আমার ইচ্ছাপূরণ করো, তুমি আমার সব কিছুই পূরণ করো।

বাজসনেয়ি (Vajasaneyi) সংহিতায় দ্বিতীয় ব্যাখ্যার যে উল্লেখ আছে পুরুষ সূক্ত থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা।

বা.স. XIV.-[১] 'তিনি একের প্রশংসা করলেন, জীবিত বস্তুরা আকার পেল। তিনি তিনজনের স্তব করলেন, ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি হল। ব্রহ্মাণস্পতি তার নিয়ন্তা। তিনি পাঁচের ধ্যান করলেন, বর্তমানে যা কিছু অস্তিত্ব তার সৃষ্টি হল। ভূতনামপতি তার নিয়ন্তা। সাতজনের স্তবের সঙ্গে সৃষ্টি হল সপ্তর্ষির, ধাত্রী তার ধারক। নয়জনের সঙ্গে প্রশংসা করলেন তিনি, তার থেকে সৃষ্টি হলেন পিতা। অদিতি তার নিয়ামক। এগারোজনের সঙ্গে স্তব করলেন, সৃষ্টি হল ঋতুচক্র, আর্তব তার নিয়ন্তা। তেরোর সঙ্গে স্তব করে সৃষ্টি হল মাসের, বছর তার কেন্দ্রবিন্দু। পনেরোর সঙ্গে স্তব করে সৃষ্টি হল ক্ষাত্র বা ক্ষত্রিয় এবং ইন্দ্র তার নিয়ন্তা। সতেরোর স্তব করে উৎপত্তি হল

১. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ : ১৮

পশুকুলের এবং বৃহস্পতি তাদের রাজা। উনিশ-এর সঙ্গে স্তব করে সৃষ্টি হল শূদ্র ও বৈশ্যদের, দিন ও রাত্রি তাদের নিয়ন্তা। একুশের স্তব করে তিনি সৃষ্টি করলেন অবিভক্ত খুরের জন্তুদের, বরুণ তাদের নিয়ামক। তেইশ থেকে সৃষ্টি হল ক্ষুদ্র জীবজন্তুর, পুষ্প তাদের নিয়ন্তা। পঁচিশের সঙ্গে স্তব থেকে উদ্ভব হিংস্র পশুর এবং বায়ু তাদের রক্ষক। সাতাশের স্বর্গ-মর্ত্য আলাদা হয়ে গেল এবং এরপর বসু, রুদ্র, আদিত্য তার থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং তারাই হল রাজা। উনত্রিশের সঙ্গে স্তবে সৃষ্টি হল জীব জগতের এবং মাসের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধ হল তাদের নিয়ামক। একত্রিশের সঙ্গে স্তবে সব কিছু ধীর-শান্ত রূপ পেল এবং প্রজাপতি পরমেষ্ঠি হলেন তাদের নিয়ামক।

এখন দেখা যাক কৃষ্ণযজু : কি ব্যাখ্যা দেয়। কৃষ্ণযজু:র তৈত্তিরীয় সংহিতায় মোট পাঁচটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শুক্লযজু : XIV. ২৮ বাজসনেয়ি সংহিতার যে ব্যাখ্যা রয়েছে এর IV. ৩.১০-এর সঙ্গে তার পুরোপুরি সাদৃশ্য আছে এবং তা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাকিগুলিতে শূদ্রদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিচে দেওয়া হল।

তৈত্তিরীয় সংহিতা (II. ৪.১৩.১)[২]: 'রাজন্যের গর্ভাবস্থায় দেবতারা তার সম্পর্কে ভীত ছিলেন। দেবতারা গর্ভাবস্থায়ই তাকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং এর ফলস্বরূপ রাজন্যের জন্ম হল একটি সীমারেখার আবেষ্টনীর মধ্যে। যদি তার জন্মে কোনও সীমায় বাধা না থাকে তাহলে সে তো তার শত্রুদের বধ করবে। যদি কোনও রাজন্য মনে করেন, তার জন্ম হবে এই সীমা ছাড়া এবং তার শত্রুদের হত্যা করবেন, তাহলে তাকে ঐন্দ্র-বার্হস্পত্য নৈবেদ্য দান করতে হবে। রাজন্যের মধ্যে ইন্দ্রের চরিত্র রয়েছে এবং ব্রহ্মাই হলেন বৃহস্পতি। ব্রহ্মার মাধ্যমেই রাজন্যকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। তার পায়ে যে বেড়ি আছে, স্বর্গ এবং দান সামগ্রীর মাধ্যমে তা থেকে তার মুক্তি সম্ভব।

(২) তৈত্তিরীয় সংহিতা (VII. ১-১৪)[৩] প্রজাপতি ইচ্ছা করলেন, আমি সৃষ্টি করব। তিনি তার মুখ থেকে ত্রিবৃত্ত স্তোম তৈরি করলেন। তা থেকে সৃষ্টি হল অগ্নি, গায়ত্রী ছন্দ, সাম এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুদের মধ্যে মেষ। এদের প্রধান বলা হয়, কারণ এরা প্রজাপতির মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এরপর

---

২. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ : ২২

৩. তদেব, পৃ : ১৬

প্রজাপতি তার মধ্যদেশ থেকে সৃষ্টি করলেন সপ্তদশ স্তোম এবং এরপর সৃষ্টি করলেন বিশ্বদেব নামক দেবতা, ছন্দের মধ্যে জগতী, সাম, বৈশ্য, এবং মানুষের মধ্যে রাজন্য এবং পশুদের মধ্যে গাভী। তারা হল অত্যন্ত বীর্যবান ও বলশালী কারণ তারা সৃষ্টি হয়েছে তেজ থেকে। খাদ্যের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হল খাদ্যাধার থেকে। অন্যদের তুলনায় এদের সংখ্যা ছিল অধিক। এরপর আরও বেশি দেবতার সৃষ্টি করা হল। এরপর তার পা থেকে সৃষ্টি করলেন একবিংশ স্তোম এবং তারপর অনুষ্টুপ ছন্দ, বৈরাজ নামক সাম এবং মানুষের মধ্যে শূদ্র ও পশুদের মধ্যে অশ্ব। অতএব এই দুই শ্রেণী—শূদ্র ও অশ্ব অন্যান্য জীবের বাহক। সুতরাং শূদ্ররা নৈবেদ্য দানের অনুপযুক্ত কারণ একুশের পর আর কোনও অনুষ্টুপ ছন্দ সৃষ্টি হয়নি। অতএব এই দুই শ্রেণী তাদের পায়ের ওপর জীবিকা নির্ভর করে কারণ তাদের সৃষ্টি পা থেকে'।

এরপর অথর্ববেদ। এতে মোট চারটি ব্যাখ্যা আছে। এর মধ্যে একটি ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তর (XIX. ৬) ব্যাখ্যার সমান। অন্যগুলির কথা এখানে বলা হচ্ছে।

(১) (অথর্ববেদ[৪], IV ৬.১)— প্রথমে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়, তাদের ছিল দশটি মাথা এবং দশটি মুখ। তারা প্রথমে সোমরস পান করে বিষকে নির্বীষ করে দেয়।

(২) (অথর্ববেদ[৫], XV ৮.১)— এরপর আসক্তি বশে তিনি রাজন্যের জন্ম দিলেন।

(৩) (অথর্ববেদ[৬], XV ৯.১)— তারপর সেই রাজন্যের গৃহে আগমন হল অতিথির এবং সেই অতিথির স্থান হল রাজন্যের ওপর। তাদের কোনও প্রকার ক্ষতি না করে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করলেন। তারা জানালো, তাদের বিরাজ হবে কার মধ্যে' ইত্যাদি।

দুই

ব্রাহ্মণের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। শতপথ ব্রাহ্মণে ছটি ব্যাখ্যা রয়েছে। এর মধ্যে দুটি বর্ণভেদ সম্পর্কে এবং এর একটিতে শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে।

---

৪. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ : ২১

৫. তদেব, পৃ : ২২

৬. তদেব, পৃ : ২২

শতপথ ব্রাহ্মণ[৭], (XIV ৪.২.২৩)— 'ব্রহ্মা (ভাষ্যকারের মতে তিনি অগ্নি রূপে বিরাজমান এবং ব্রাহ্মণ) শুরুতে বিশ্ব স্বরূপ একাকী বিরাজিত। একাকিত্বের জন্য সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছিল না। এরপর ব্রহ্মা তাঁর শক্তি থেকে সৃষ্টি করলেন এক সুন্দর রূপ—ক্ষাত্র। দেবতাদের মধ্যে যাঁরা শক্তির আধার—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশান থেকে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করা হল। সুতরাং ক্ষাত্রদের থেকে কেউ বড় নয়। এরপর ব্রহ্মা রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়দের নীচে বসলেন এবং ক্ষত্রিয়দের রাজকীয় গৌরব দান করলেন। এইভাবে ব্রহ্মা হলেন ক্ষত্রিয়দের উৎস স্বরূপ। সুতরাং ক্ষত্রিয়রা ক্ষমতাশালী হয়েও ব্রহ্মা তাদের উৎস রূপে মনে করতে থাকলেন। যদি কেউ তাকে ধ্বংস করে তাহলে তা হবে নিজেদেরই ধ্বংস। তাকে ধ্বংস করায় তিনি নিজেকে অত্যন্ত বিপন্নবোধ করলেন। তাঁর সৃষ্টি ব্যাহত হল। তিনি 'বিস' উৎপন্ন করলেন। এই শ্রেণীতে বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, মরুৎ পড়ে। তিনি অতঃপর শূদ্র শ্রেণী পুষণ সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীকে পুষাণী বলা হয়, কারণ তিনি সব কিছুই পালন করেন। এতেও সৃষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়ায় তিনি তাঁর শক্তি থেকে ধর্ম সৃষ্টি করলেন। ধর্মই ক্ষত্রিয়দের নিয়ামক—এবং যেটি হল ন্যায় বিচার। সুতরাং ন্যায় বিচারের ঊর্ধ্বে কিছুই নয়। দুর্বলরা সবলের বাঁচার জন্য বিচারের আশ্রয় নেয়; আর বিচার করেন রাজা এবং সেই বিচারই সত্য। যে মানুষ সত্য কথা বলে, সেই ন্যায় বিচারের কথা বলে। এর জন্য উভয়ের দরকার। এরাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মার সঞ্চার। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ঐশ্বরীয় ক্ষত্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ ক্ষত্রিয়। ঐশ্বরীয় বৈশ্যের মধ্যে মানুষ বৈশ্য এবং ঐশ্বরীয় শূদ্রদের মধ্যে মানুষ বৈশ্যের সঞ্চার। অতএব দেখা যাচ্ছে দেবতাদের মধ্যে অগ্নি এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণদের অবস্থান'।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আরও কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে :—

(১) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ[৮] (I. ২.৬.৭.) 'দেবতাদের থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি এবং অসুরদের থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি'।

(২) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ[৯] (III. ২.৩.৯) 'শূন্য থেকে শূদ্রদের উদ্ভব'।

---

৭. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২০
৮. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড-১, পৃ : ২১
৯. তদেব, পৃ : ২১

তিন

চাতুর্বর্ণ এবং শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য রয়েছে। পুরাকালের ব্রাহ্মণরা স্পষ্টতই সচেতন ছিলেন যে চাতুর্বর্ণ সমাজে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা এবং সমাজে শূদ্রদের অবস্থানও স্বাভাবিক নয় এবং এর কারণও রয়েছে। এই কারণ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সমাজে চাতুর্বর্ণ এবং শূদ্রদের উৎপত্তির ব্যাখ্যা খোঁজা দুষ্কর।

কিন্তু এই ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যার মধ্যে বৈসাদৃশ এতই বেশি যা, তা বিভ্রান্তিকর। কেউ কেউ মনে করেন পুরুষ থেকেই চাতুর্বর্ণের উৎপত্তি। কারও মতে চাতুর্বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মা থেকে, কারও মতে প্রজাপতি থেকে বা কারও মতে ব্রাত্য থেকে। একই উৎস আবার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়। শুক্লযজু:তে দুই ধরনের ব্যাখ্যা আছে—এর একটি পুরুষ আর অন্যটি প্রজাপতি। আবার কৃষ্ণযজু:তে তিনটি ব্যাখ্যা—দুটি প্রজাপতিকে ঘিরে আর তৃতীয়টি ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়।

অথর্ববেদ আবার চারটি ব্যাখ্যা দেয়। একটি পুরুষ, একটি ব্রাহ্মণ, তৃতীয়টি ব্রাত্য এবং চতুর্থ ব্যাখ্যা প্রথম তিন ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় সিদ্ধান্ত হয়তো এক কিন্তু বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ আলাদা। এর মধ্যে আবার প্রজাপতি এবং ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাগুলি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। অন্যদিকে মনু অথবা কশ্যপ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা মানবতাবাদী। সুতরাং চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় নেই। কোনও কোনও ব্যাখ্যার মধ্যে না আছে ঐতিহাসিক তথ্য অথবা না আছে বাস্তবতা। ব্রাহ্মণ সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লিখিত হল :

'ভারতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণরা নিঃসন্দেহে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সাহিত্য কীর্তি রচনার ক্ষেত্রে তাদের অবদান অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কেউ অবশ্য এটা আশা করে না যে, ঐ আদি যুগে আদিম সমাজে সমৃদ্ধশালী সাহিত্য রচনা হতে পারে, কারণ ঐ সময় যে অবাস্তবতাও বিচারবুদ্ধিহীনতা ছিল তার কোনও তুলনা হয় না। অবশ্য এই সব সাহিত্যের কোনও কোনও ক্ষেত্রে চিন্তা, মতামত, যুক্তি এবং প্রথাগত ঐতিহ্যের অভাব নেই, কিন্তু সে সমুদ্রে বিন্দু, সীসা ও পিতলের মধ্যে মূল্যবান রত্নের মতো। এই সব রচনার বিশেষ কোনও গভীরতা নেই এবং নীরস আড়ম্বরপূর্ণ। রচনাগুলি যাজকোচিত গর্ব এবং পণ্ডিতি-প্রাচীনত্বে ভরা। ঐতিহাসিকদের কাছে

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যাজকতন্ত্র এবং কুসংস্কারের ফলে একটি সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ কীভাবে নষ্ট হচ্ছে তার কারণ অনুধাবন করা। এই ধরনের সামাজিক মহামারীর কাছে একটি সমাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তা আমাদের জানা দরকার। এই রচনাগুলি এমনভাবে অধ্যয়ন প্রয়োজন, যেমন একজন চিকিৎসক যেভাবে নির্বোধের প্রলাপ শোনেন বা উন্মত্ত ব্যক্তির ক্রোধের প্রকাশ দেখেন, ঠিক সেইভাবে'।[১০]

চাতুর্বর্ণ বিশেষ করে শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারা সম্পর্কে পরিচিত হবার পর অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের কয়েকটি কথা অনিবার্যভাবে মনে এসে যায়। উপর্যুক্ত চিন্তাধারা প্রকৃতপক্ষেই নির্বোধের প্রলাপ এবং উন্মত্তের ক্রোধ এবং এজন্যই মানবজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষক ছাত্রদের কাছে এর কোনও গুরুত্ব নেই।

□ □

১০. সংস্কৃত লিটারেচার, ম্যাক্সমূলার (পানিনি অফিস সংস্করণ), পৃ : ২০০

অধ্যায় ৩

শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য মতবাদ

শূদ্র সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য মতবাদ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এখন শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একজনের চোখে পড়বে এক বিরাট হীনম্মন্যতার তালিকা এবং ব্রাহ্মণ্য আইন প্রণেতারা কীভাবে সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতির মাধ্যমে শূদ্রদের নিপীড়ন ও শাস্তি বিধান করেছে তার বিস্তারিত বিষয়।

সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে শূদ্রদের ওপর নিপীড়নের যে কথা পাওয়া গিয়েছে তা নিচে বলা হল :—

(১) কথক সংহিতা এবং (IV. ১.৩; I. ৮.৩) মৈত্রায়ণী সংহিতায় (IV. ১.৩) বলা হয়েছে : 'অগ্নিহোত্রের কাজে ব্যবহৃত দুধ শূদ্ররা গাভী থেকে দোহন করতে পারবে না'।

(২) শতপথ ব্রাহ্মণ (III. ১.১.১০) ও মৈত্রায়ণী সংহিতা এবং পঞ্চবিংশ (VI. ১.১.১১) ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে : 'যজ্ঞের সময় শূদ্রের কথা বলা নিষেধ এবং এমনকি যজ্ঞের সময় তার উপস্থিত থাকাও বারণ'।

(৩) শতপথ ব্রাহ্মণ (XIV. ১.৩১) এবং কথক সংহিতায় (XI. ১০) আরও বলা হয়েছে : 'সোমরস পানে শূদ্রদের কোনও অধিকার নেই'।

(৪) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (VII. ২৯.৪) এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (VI. ১.১১) আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে : 'শূদ্র অন্যদের সেবক এবং তাদের অন্য কিছু ভাবা উচিত নয়'।

শুরুতে এই নিপীড়ণের পরিধি ছিল খানিকটা বজ্রগর্ভ মেঘের মতো এবং কালক্রমে তা প্রবল ঝড়ে পরিণত হয় এবং আক্ষরিক অর্থেই শূদ্ররা এতে দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। কারণ পরবর্তী কালে অপস্তম্ব এবং বুধায়নের মতো সূত্রকার এবং মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকাররা শূদ্রদের নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে যে শাস্তি বিধানের কথা বলেছেন, তার ব্যাপকতা ছিল অসহনীয় এবং চিন্তার অতীত। এই অত্যাচার

এবং নিপীড়ন এতই তীব্র ছিল যে, তা যারা না দেখেছে তাদের পক্ষে বিশ্বাস করাই শক্ত। এই অসহনীয় নিপীড়নের ঘটনা এত বেশি যে, তার সব বিবরণ পেশ করা সম্ভব নয়। তবে সেইসব অত্যাচারের ঘটনা যারা না দেখেছে অথবা না শুনেছে তাদের অবগতির জন্য আমি এখানে কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করলাম। বিভিন্ন সূত্রকার এবং স্মৃতিকাররা তাঁদের আইন গ্রন্থে শূদ্রদের ওপর এইসব নিপীড়নের বিধান দিয়ে গেছেন।

দুই

(ক) অপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে :

চারটি বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র[১]। এদের মধ্যে প্রতিটি পূর্ববর্তী বর্ণ জন্মসূত্রে পরবর্তী বর্ণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।[২]

এই চার বর্ণের মধ্যে শূদ্র এবং অন্যান্য বর্ণের যারা গর্হিত কার্য করেছে তাদের বাদ দিয়ে অপর সকলের (১) উপনয়ন (পবিত্র উপবীত) (২) বেদ পাঠ এবং (৩) পবিত্র অগ্নি (যজ্ঞ করার জন্য) প্রজ্বলনের অধিকার আছে।

(খ) বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে :

চারটি জাতি অর্থাৎ বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের দুইবার জন্ম হয়। প্রথম জন্ম হয় মাতৃগর্ভে আর দ্বিতীয় বার জন্ম হয় পবিত্র উপবীত ধারণের জন্য উপনয়নের সময়। দ্বিতীয় বার জন্মের সময় সাবিত্রী হচ্ছেন মা এবং শিক্ষাগুরু হলেন পিতা[৩]।

শিক্ষাগুরুকে পিতা বলা হয় কারণ তিনিই তাকে বেদমন্ত্রে দীক্ষা দেন। চার জাতিকে তাদের উৎপত্তি এবং তাদের জন্য চিহ্নিত ভগবৎ অনুগ্রহ লাভের মধ্যে দিয়ে আলাদা করা যায়।

বেদের অন্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়দের তার হাত থেকে, বৈশ্যদের তার উরু থেকে এবং শূদ্ররা সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের পা থেকে।

---

১. প্রশ্ন ১, পটল ১, খণ্ড ১, সূত্র : ৪-৫

২. তদেব, সূত্র : ৬

৩. অধ্যায় II, মন্ত্র ১-৪

বেদের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য শূদ্রদের কোনও মন্ত্র বা জপ নেই। ঈশ্বর ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী, ক্ষত্রিয়দের ত্রিষ্টুভ এবং বৈশ্যদের জন্য জগতি মন্ত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু শূদ্রদের জন্য কোনও মন্ত্রের কথা বলা হয়নি।

(গ) এই বিষয়ে মনুস্মৃতি নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

'পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য স্রষ্টা তাঁর মুখ, হাত, উরু এবং পদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দুইবার জন্ম হয় এবং শূদ্রদের জন্ম হয় মাত্র একবার।'

(২)

(ক) অপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে :

তিনটি বর্ণ (দ্বিজ) কখনই শ্মশান অথবা শ্মশানের নিকটবর্তী কোনও স্থানে বেদপাঠ করতে পারবে না।

শ্মশানের ওপর যদি কোনও গ্রাম নির্মিত হয় অথবা শ্মশানের পার্শ্ববর্তী ভূমিতে চাষাবাদ হয়, তবে সেখানে বেদপাঠ নিষিদ্ধ নয়।

তবে ঐ স্থানটি পূর্বে শ্মশান ছিল যদি একথা জানা যায়, তাহলে সেখানে বেদপাঠ নিষিদ্ধ।

শূদ্র এবং পতিত জাতিরা শ্মশানের তুল্য।[৪] (সূত্র ৬ প্রযোজ্য)

কারও কারও মতে একঘরে বসবাস করলেও তাদের এড়িয়ে চলা উচিত।

শূদ্র বংশজাত কোনও রমণী যদি একে অপরের দিকে তাকায়, সেক্ষেত্রে বেদপাঠে বিঘ্ন ঘটে।

ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চবর্ণের মানুষ যদি অপবিত্র অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে তাহলে তা অপবিত্র হয় কিন্তু খাবারের অনুপযোগী হয় না।

কিন্তু অপবিত্র শূদ্র যদি কোনও খাদ্যবস্তু স্পর্শ করে তা আর খাবারের উপযোগী থাকে না।

---

৪. প্রশ্ন ১. পটল ৩, খণ্ড ৯, সূত্র ৬-১১

খাদ্য গ্রহণ অবস্থায় যদি কোনও শূদ্র স্পর্শ করে তাহলে অবশ্যই সে সেই খাদ্যবস্তু পরিত্যাগ করবে।[৫]

(খ) বিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হয়েছে :

শূদ্র কখনও দ্বিজ জাতিভুক্ত হতে পারে না (মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতিভুক্ত হলেও না)। অথবা শূদ্ররা দ্বিজ জাতিভুক্ত লোকদের সদস্যও হতে পারে না। পিতা মাতার পরিচয় সন্তানদের মধ্যেই থাকে (তারা পিতা মাতার কাছে সমান)। কিন্তু শূদ্ররা কখনও দ্বিজ জাতিভুক্ত হতে পারে না, সন্তানের পিতা হলেও না।[৬]

(গ) বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে :

'অতএব এখন আমরা ঘোষণা করব কোনগুলি খাদ্যবস্তু এবং কোনগুলি তার উপযোগী নয়।

চিকিৎসক, শিকারি, নষ্ট চরিত্রের মহিলা, রাজার গদা বহনকারী, তস্কর, অবিশ্বস্ত ব্যক্তি, যোদ্ধা অথবা সমাজে পতিত কোনও ব্যক্তির দেওয়া খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা উচিত নয়।

কৃপণ ব্যক্তি (যজ্ঞ করা সত্ত্বেও), কয়েদী, অসুস্থ ব্যক্তি, সোমবৃক্ষ বিক্রেতা, ছুতোর মিস্ত্রি, ধোবা, মদ্য বিক্রেতা, গুপ্তচর, সুদখোর অথবা মুচির দেওয়া খাদ্যও গ্রহণীয় নয়।

শূদ্রের প্রদত্ত খাদ্যও খাওয়া নিষেধ।[৭]

কেউ কেউ শূদ্রদের শ্মশান ক্ষেত্রের জাতি বলে বর্ণনা করে থাকে।

অতএব শূদ্রের সামনে কোনও অবস্থাতেই বেদ পাঠ করা ঠিক নয়।[৮]

তাঁরা আরও কয়েকটি শ্লোকের কথাও উল্লেখ করেছেন :

'দুষ্ট শূদ্র জাতি স্পষ্টতই একটি শ্মশান ক্ষেত্র, সুতরাং তাদের উপস্থিতিতে বেদপাঠ নিষিদ্ধ।

৫. প্রশ্ন ১, পটল ৫, খণ্ড ১৬, সূত্র ২১-২২
৬. অধ্যায় ১৯, মন্ত্র ১-৪
৭. অধ্যায় ১৪, মন্ত্র ১-৪
৮. অধ্যায় ১৮, মন্ত্র ১১-১৫

কেউ কেউ পবিত্র আচরণ এবং কেউ কেউ কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্য দান গ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন। কিন্তু যে ব্রাহ্মণের উদরে শূদ্রের অন্ন নেই তিনিই দান গ্রহণের সবথেকে যোগ্য ব্যক্তি।[৯]

যদি কোনও ব্রাহ্মণের উদরে শূদ্রের অন্ন থাকা অবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহলে (পরজন্মে) তাকে হয় শূকর হতে হবে অথবা ঐ শূদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

যদি কোনও (ব্রাহ্মণ) শূদ্রের অন্নে প্রতিপালিত হয় তাহলে সে (অগ্নিহোত্র) প্রার্থনা বা বেদপাঠ করতে পারে। তবে সে আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে কখনই পৌঁছতে পারবে না।

কিন্তু শূদ্রের দেওয়া খাদ্য গ্রহণের পর যদি সে সঙ্গমে লিপ্ত হয় সেক্ষেত্রে তার (স্বজাতীয় স্ত্রীর) গর্ভে পুত্র জন্ম হলে সেই পুত্র তার অন্নদাতার-ই হবে এবং ঐ ব্রাহ্মণ স্বর্গে যেতে পারবে না।[১০]

(খ) মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে :

(ব্রাহ্মণ) শূদ্র পরিবেষ্টিত হয়ে অথবা অসদাচারণকারীদের মধ্যে অথবা ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের অথবা নিম্ন বর্ণের জাতিদের মধ্যে বাস করতে পারে না।[১১]

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রদের জন্য যজ্ঞ করে তাকে কোনও শ্রাদ্ধের সময় অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভোজনে নিমন্ত্রণ করা যাবে না। তাহলে ঐ ভোজনের সব মাহাত্ম্যই নষ্ট হয়ে যাবে।[১২]

শূদ্রের মৃতদেহ দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে বের করা উচিত আর দ্বিজ জাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দুয়ার দিয়ে মৃতদেহ বের করা উচিত'।[১৩]

তিন

(ক) অপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে :

৯. অধ্যায় ৬, মন্ত্র ২৬
১০. অধ্যায় ৬, মন্ত্র ২৭-২৯
১১. অধ্যায় ৪, মন্ত্র ৬১
১২. অধ্যায় ৩, মন্ত্র ১৭৮
১৩. অধ্যায় ৫, মন্ত্র ৯২

একজন ব্রাহ্মণ সটান দাঁড়িয়ে তার কর্ণমূলের সমান্তরালভাবে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে অভিবাদন জানাবে। একজন ক্ষত্রিয় তার বুকের সমান্তরালে হাত রেখে অভিবাদন জানাবে। একজন বৈশ্য তার কোমরের সমান্তরালে হাত রেখে অভিবাদন করবে আর একজন শূদ্র দুই হাত জোড় করে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাবে।[১৪]

আর প্রত্যাভিবাদনের সময় প্রথম তিন জাতির মানুষ যাকে প্রত্যাভিবাদন জানানো হচ্ছে তার নামের শেষ স্বর—জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করবে।[১৫]

একজন শূদ্র যদি কোনও (ব্রাহ্মণের) বাড়িতে অতিথি হিসাবে আসে তাহলে সে তাকে কিছু কাজ করতে বলবে। (সে তাকে আহার দিতে পারে ঐ কাজের পরে। কোনও কাজের পরিবর্তে যদি তাকে খাদ্য দেওয়া হয় তাহলে সম্মান দেওয়া হল।)

ব্রাহ্মণ গৃহকর্তার সেবকরা রাজকীয় ভাণ্ডার থেকে তণ্ডুল সংগ্রহ করবে এবং শূদ্রকে অতিথির সম্মান দেবে'।[১৬]

(খ) **বিষ্ণুস্মৃতি বলছে :**

একজন শূদ্রকে আতিথেয়তা প্রদান অথবা বেদযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধনুষ্ঠানে তাকে (শূদ্রকে) ভোজন করালে দণ্ড হবে ১০০ পণ।[১৭]

(গ) **মনুস্মৃতির নির্দেশ :**

একজন ব্রাহ্মণের বয়স দশ বছর এবং একজন ক্ষত্রিয়ের বয়স একশো বছর হলেও তাদের পিতা ও সন্তান তুল্য ভাবা উচিত এবং দুজনের মধ্যে অবশ্যই ব্রাহ্মণ পিতৃতুল্য।

সম্পদ, জ্ঞাতিত্ব, বয়স, গোষ্ঠী এবং জ্ঞান—এই পাঁচটি সম্মানের পাত্র। এর মধ্যে জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ।

তিনটি উচ্চবর্ণের জাতির মধ্যে যার এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে, সেই জাতিই শ্রদ্ধার পাত্র। একজন শূদ্র যত সম্পদশালী এবং যত জ্ঞানবানই হোক না কেন সম্মানের যোগ্য নয়। এক্ষেত্রে একমাত্র বয়স অর্থাৎ যদি কেউ ৯০ বছর

১৪. প্রশ্ন ১, পটল ২, খণ্ড ৫, সূত্র ১৬
১৫. তদেব, সূত্র ১৭
১৬. প্রশ্ন ৮-২, পটল ২, খণ্ড ৪, সূত্র ১৯-২০
১৭. অধ্যায় ৫, সূত্র ১১৫

বয়স অতিক্রম করে, একমাত্র তখনই সে সম্মানের অধিকারী হতে পারে, তার আগে নয়।[১৮]

সুতরাং বয়স নয়, পক্ককেশ নয়, সম্পদ নয়, জ্ঞাতিত্ব নয়, শুধুমাত্র যিনি সম্পূর্ণভাবে বেদ জানেন, তিনিই আমাদের মধ্যে সবার শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে বীরত্ব, বৈশ্যদের ক্ষেত্রে ধন সম্পদ এবং শূদ্রদের ক্ষেত্রে বয়স—এগুলিই সম্মানের মাপকাঠি।

অতএব দেখা যাচ্ছে পক্ককেশ হলেই তাকে বয়স্ক বলা যায় না। একজন যুবকও যদি বেদ জানেন, তিনিই বেশি বয়স্ক বলে বিবেচিত হতে পারেন।[১৯]

একজন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ব্রাহ্মণের বাড়িতে এলে তাকে অতিথি বলা যায় না। তাদের বন্ধু, জ্ঞাতি বা গুরুও বলা যাবে না। একজন ব্রাহ্মণের বাড়িতে কেবলমাত্র একজন ব্রাহ্মণেরই অতিথির সম্মান পাবার অধিকার আছে।

কিন্তু একজন ক্ষত্রিয় যদি কোনও ব্রাহ্মণের বাড়িতে তার আহারের পর যায় তাহলে ঐ ব্রাহ্মণ তাকে খাবার দিতে পারেন।

কিন্তু একজন বৈশ্য বা শূদ্র কোনও ব্রাহ্মণের যদি বাড়িতে অতিথি হিসাবে যায় তাহলে ঐ ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হয়ে তার পরিচারকদের সঙ্গে তাকে খাবার দিতে পারেন।[২০]

(৪)

(ক) অপস্তম্ব ধর্মসূত্রের মতে,

যদি কেউ একজন ক্ষত্রিয়কে হত্যা করে তাহলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে একহাজার গাভী ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে।

একজন বৈশ্যকে হত্যা করলে সে ব্রাহ্মণকে একশ গাভী দান করবে এবং একজন শূদ্রকে হত্যা করলে সে দান করবে মাত্র দশটি গাভী।[২১]

---

১৮. অধ্যায় ২, মন্ত্র ১৩৫-১৩৭

১৯. অধ্যায় ২, মন্ত্র ১৫৪-১৫৬

২০. অধ্যায় ৩, মন্ত্র ১১০-১১২

২১. প্রশ্ন ১, পটল ৯, খণ্ড ২৪, সূত্র ১-৩

(খ) গৌতম ধর্মসূত্র মতে,

একজন ক্ষত্রিয় যদি কোনও ব্রাহ্মণের নিন্দা করে তাহলে তাকে একশত কার্ষাপণ (Karshapanas) (জরিমানা) দিতে হবে। আর যদি কোনও ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তাহলে এই জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ হবে।

কিন্তু যদি একজন ব্রাহ্মণ কোনও ক্ষত্রিয়কে তিরস্কার করে তার জরিমানার পরিমাণ হবে মাত্র পঞ্চাশ কার্ষাপণ (Karshapanas)। কোনও বৈশ্যকে অপমান করলে এই জরিমানার পরিমাণ হবে অর্ধেক আর শূদ্রকে অপমান করলে ঐ ব্রাহ্মণকে কিছুই দিতে হবে না।[২২]

(গ) বৃহস্পতি ধর্মশাস্ত্র বলা হয়েছে,

একজন ব্রাহ্মণ যদি কোনও ক্ষত্রিয়কে অপমান করে তাহলে তাকে ৫০ পণ জরিমানা দিতে হবে, বৈশ্যকে অপমান করলে ২৫ পণ আর শূদ্রকে অপমান করলে সাড়ে বারো পণ জরিমানা দিতে হবে। একজন ধর্মপ্রাণ শূদ্র যে সমাজে নির্ধারিত তার নির্দিষ্ট কাজ করে এবং (সামাজিক নীচু অবস্থানকে মেনে নেয়) তাকে অপমান করে ব্রাহ্মণকে এই জরিমানা দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে দেখতে হবে ঐ শূদ্র কোনও অপরাধ বা অন্যায় করেছে কিনা। তবে ঐ শূদ্র যদি অধার্মিক হয় তাহলে ব্রাহ্মণের কাছে সে অপরাধী বলে গণ্য হবে।

কোনও বৈশ্য যদি কোনও ক্ষত্রিয়কে অপমান করে তাহলে তাকে একশত পণ জরিমানা দিতে হবে আর কোনও ক্ষত্রিয় যদি বৈশ্যকে অপমান করে তাহলে তাকে এর অর্ধেক দণ্ড দিতে হবে।

আর যদি কোনও ক্ষত্রিয় একজন শূদ্রকে গালাগালি দেয় তাহলে তাকে ২৫ পণ দণ্ড দিতে হবে আর যদি বৈশ্যকে তিরস্কার করে তাহলে দণ্ডের পরিমাণ হবে দ্বিগুণ। আর শূদ্রের ক্ষেত্রে বৈশ্যকে অপমান করার দণ্ড হবে ২৫ পণ। ক্ষত্রিয়কে অপমান করলে দণ্ডের পরিমাণ হবে প্রথম উল্লেখের সমান আর ব্রাহ্মণকে অপমান করলে কঠোরতর দণ্ড পেতে হবে।[২৩]

(ঘ) মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে :

একজন ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে অপমান করে তাহলে তার দণ্ডের পরিমাণ হবে

২২. অধ্যায় ১২, সূত্র ৮-১৩

২৩. অধ্যায়, ২০, মন্ত্র ৭-১১

একশত (পণ) : বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণকে অপমান করে তাহলে তাকে দেড়শো থেকে দুশো পণ জরিমানা দিতে হবে আর শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে অপমান করে তাহলে তাকে শারীরিক দণ্ড ভোগ করতে হবে।

কোনও ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে অপমান করে তাহলে তাকে ৫০ পণ দণ্ড দিতে হবে। বৈশ্যের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ হবে অর্ধেক আর শূদ্রকে অপমান করলে পরিমাণ হবে বারো পণ।[২৪]

কোনও ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে হত্যা করে তাহলে তার জমির এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দিতে হবে। বৈশ্যকে হত্যা করলে পরিমাণ হবে এক অষ্টমাংশ এবং শূদ্র হত্যার ক্ষেত্রে তাকে দণ্ড দিতে হবে তার যোলো ভাগের একভাগ।

কিন্তু যদি কোনও দ্বিজ অনিচ্ছাকৃতভাবে একজন ক্ষত্রিয় নিধন করে, তাহলে ঐ তাকে তার আত্মশুদ্ধির জন্য এক হাজার গাভী এবং একটি বলদ দান করতে হবে অথবা তিন বছর পর্যন্ত গ্রামের বাইরে গাছের জটাযুক্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কিন্তু যদি একজন দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) কর্তৃক কোনও বৈশ্য নিধন হয় তাহলে ঐ ব্রাহ্মণকে মাত্র এক বছরের দণ্ড ভোগ করতে হবে এবং তাকে একশো একটি গরু দান করতে হবে। আর শূদ্রের নিধনকারীর দণ্ড হবে মাত্র ছয় মাস অথবা তাকে পুরোহিতকে দশটি শ্বেত গাভী এবং একটি ষাঁড় দান করতে হবে।[২৫]

(ঙ) বিষ্ণুস্মৃতির মতে :—

একজন নীচু বর্ণের লোক তার শরীরের যে অঙ্গ দিয়ে উঁচু বর্ণের কোনও লোককে আঘাত করে বা অপমান করে, দেশের রাজা তার সেই অঙ্গ ছেদন করতে পারেন। যদি নীচু জাতের কোনও ব্যক্তি উঁচু জাতের সঙ্গে একাসনে বসে, তাহলে তার পশ্চাদ্দেশে ছাপ মেরে তাকে নির্বাসিত করা হবে।

যদি কোনও নীচু জাতের লোক উঁচু জাতের লোককে থুথু দেয়, তাহলে তাকে তার দুটি ঠোঁটই কেটে দেওয়া হবে।

যদি নীচু জাতের কোনও লোক উঁচু জাতের লোককে লক্ষ্য করে বায়ু নিঃসরণ করে, তাহলে তার পাছা কেটে দেওয়া হবে।

২৪. অধ্যায় ৮, মন্ত্র ২৬৭-২৬৮

২৫. অধ্যায়, ১১, মন্ত্র ১২৭-১৩১

নীচু জাতের কোনও লোক যদি উঁচু জাতের লোককে গালাগালি দেয়, তাহলে তার জিহ্বা কেটে দেওয়া হবে।

যদি নীচু বর্ণের কোনও লোক অহঙ্কারের বশে উঁচু বর্ণের কোনও লোককে তার কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেয়, তাহলে রাজা তার মুখে গরম তেল ঢেলে দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন।

যদি কোনও শূদ্র উচ্চবর্ণের লোককে ইচ্ছাকৃতভাবে গালাগালি দেয়, তাহলে দশ ইঞ্চি লম্বা গরম লোহার পেরেক তার মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।[২৬]

(৫)

বৃহস্পতিস্মৃতির মতে,

(ক) যদি কোনও শূদ্র ধর্মকথা শোনায় অথবা বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে অথবা কোনও ব্রাহ্মণকে অপমান করে, তাহলে শাস্তিস্বরূপ তার জিহ্বা ছেদন করা হবে।[২৭]

(খ) গৌতম ধর্মসূত্র' মতে,

যদি কোনও শূদ্র ইচ্ছাকৃতভাবে (বেদ) পাঠ শ্রবণ করে, তাহলে কানে গলন্ত সীসা বা লাক্ষা ঢেলে দেওয়া হবে।

যদি সে (বেদ) পাঠ করে তাহলে তার জিভ কেটে ফেলা হবে।

আর যদি তা (বেদ) মনে রাখে, তাহলে তার শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করা হবে।[২৮]

মনুস্মৃতি অনুসারে,

যদি কেউ (শূদ্র) দক্ষিণার বিনিময়ে কোনও গুরুগৃহে পাঠ নেয় তাহলে সেই গুরুকে দেবতার পূজা এবং পিতৃপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়ার অংশগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করা হবে না।

শূদ্রকে কেউ উপদেশ দান করবে না, (তাকে) খাদ্যের ভুক্তাবশেষ দান করবে না অথবা পূজ্য দ্রব্য দেবে না। কেউ তাকে আইন বা ধর্মের বাণী শোনাবে না।

---

২৬. অধ্যায় ৫, সূত্র ১৯-২৫

২৭. অধ্যায়, ১২, মন্ত্র ১২

২৮. অধ্যায় ২০, সূত্র ৪-৬

কারণ যদি কেউ শূদ্রকে ধর্মকথা শোনায় বা নিয়মনীতি শেখায় তাহলে তাকে ঐ শূদ্রের সঙ্গে অসংবৃত নামক অন্ধকার নরকে পতিত হতে হবে।

শূদ্রের উপস্থিতিতে অস্ফূটভাবেও বেদ পাঠ করা উচিত নয়। এমনকি শূদ্রের উপস্থিতিতে রাত্রি শেষেও নয়, (যদিও) পরিশ্রান্ত কেউ আবার ঘুমোতে পারে।[২৯]

(৬)

মনুস্মৃতির উপদেশ :

একজন ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোনও জিনিস নিশ্চিন্ত মনে নিয়ে যেতে পারে। কারণ শূদ্রের যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে তার কিছুই প্রকৃতপক্ষে তার নিজের নয় এবং তার যে কোনও সম্পত্তি প্রভু হিসাবে ব্রাহ্মণ নিয়ে নিতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে, ক্ষমতা এবং সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কোনও শূদ্রের সম্পদের অধিকারী হওয়া উচিত নয়। কারণ কোনও শূদ্রের সঞ্চিত সম্পদ দেখে কোনও ব্রাহ্মণ মনে কষ্ট পেতে পারেন।[৩০]

(৭)

মনুস্মৃতিতে রাজাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এইভাবে,

জন্মসূত্রে একজন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করতে পারেন, অথবা অন্য কেউ নিজেকে যদি ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেন, তাতে আইনের ধারক রাজার অনুমোদন থাকা চাই। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই একজন শূদ্র নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করতে পারে না।

যদি কোনও শূদ্র বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় রাজা তার দিকে তাকান তাহলে ঐ রাজার রাজত্বে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে ঠিক গরু পাঁকে পড়লে যেমন হয় তদ্রূপ।

শূদ্র যদি কোনও রাজ্যের রাজা হয় এবং তার রাজ্যের ওপর দিয়ে কোনও

---

২৯. অধ্যায় ৪, মন্ত্র ৯৯

৩০. অধ্যায়, ১০, মন্ত্র ১২৯

নাস্তিক এবং দুঃস্থ ব্রাহ্মণ চলে যায় তাহলে সেই রাজ্য মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩১]

(৮)

অপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে,

(ক) ধর্মের পবিত্র বিধি মেনে যারা শুদ্ধ জীবন যাপন করে এবং যে শূদ্র ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালপ করে এবং যে অন্ধ, মূক, বধির এবং রুগ্ন ব্যক্তি যতদিন না স্বাভাবিক হয় ততদিন তাদের কর প্রদান থেকে রেহাই দেওয়া হবে।

অন্য তিন বর্ণের লোকদের সেবা করাই শূদ্রদের কর্তব্য। যে বর্ণ যত উঁচু তাদের সেবার ফল তত বেশি।[৩২]

(খ) মনুস্মৃতিতে আরও বলা হয়েছে,

'এখন সব সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হলে সৃষ্টিকর্তা তাঁর মুখ, বাহু, উরু এবং পা থেকে যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য কাজ আলাদা করে দিয়েছেন।

সৃষ্টিকর্তা ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন অধ্যয়ন, শিক্ষাদান, যাগযজ্ঞ, পৌরোহিত্য এবং দান সামগ্রী গ্রহণ এবং প্রদানের কাজ।

ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে দেশরক্ষা, যুদ্ধ বিগ্রহ, দান সামগ্রী প্রদান, পাঠ এবং কোনও স্পর্শকাতর বস্তুর প্রতি আসক্তি না থাকা।

বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট আছে গোচারণ, দান, উৎসর্গ, অধ্যয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ লেনদেন এবং কৃষিকাজ। আর শূদ্রদের সৃষ্টিকর্তা নির্দিষ্ট করেছেন কোনও প্রকার ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ না করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সেবা করা।[৩৩]

(৯)

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে,

---

৩১. অধ্যায় ১০, মন্ত্র ১২৯

৩২. প্রশ্ন ১, পটল ১, খণ্ড ১, সূত্র ৭-৮

৩৩. অধ্যায় ১, মন্ত্র ৮৭-৯৯

(ক) কোনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পুরুষ যদি শূদ্র রমণীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে নির্বাসন দেওয়া হবে আর যদি কোনও শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য রমণীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, তাহলে তার শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড।[৩৪]

গৌতম ধর্মসূত্র মতে,

(খ) যদি কোনও শূদ্র কোনও আর্য রমণীর সঙ্গে ব্যভিচার করে তাহলে তার লিঙ্গচ্ছেদন করা হবে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। আর যদি ঐ রমণীর কোনও রক্ষক থাকে অর্থাৎ সে যদি কোনও কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ থাকে তাহলে উপর্যুক্ত শাস্তি ভোগ করার পর তার মৃত্যুদণ্ড হবে।[৩৫]

(গ) মনুস্মৃতি অনুযায়ী :

যদি শূদ্রজাত কোনও পুরুষ উচ্চ বর্ণ জাত কোনও তরনীর সঙ্গে সহবাস করে, তাহলে তাকে প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হবে।[৩৬]

যদি কোনও শূদ্র পুরুষ উচ্চ বর্ণ জাত রমণীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে সে ঐ পরিবার থেকে ত্যাজ্য হবে এবং তার সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।[৩৭]

আর যদি উচ্চ বর্ণের কোনও পুরুষ তার স্বজাতির রমণীর সঙ্গে সহবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহের অনুমোদন পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনও পুরুষ নীচু বর্ণের মহিলার সঙ্গে যদি কামনাতাড়িত হয়ে সহবাস করে, তাহলে তাকে ঐ রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে হবে।

একজন শূদ্র পুরুষের শুধুমাত্র শূদ্র রমণীই স্ত্রী হিসাবে থাকবে।

বৈশ্যদের ক্ষেত্রে স্বজাতীয় এবং শূদ্র জাত পত্নী থাকতে পারে। ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় জাত এবং বৈশ্য ও শূদ্র জাত স্ত্রী থাকতে পারে এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বংশজাত এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাত পত্নী থাকতে পারে।

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়রা কখনই শূদ্র স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে না। উচ্চ বর্ণের কোনও পুরুষ কামাসক্ত হয়ে যদি কোনও শূদ্র রমণীকে বিবাহ করে, তাহলে তার পরিবার এবং অধস্তন পুরুষ শূদ্রের দশা প্রাপ্ত হবে।[৩৮]

---

৩৪. প্রশ্ন ২, পটল ১০, খণ্ড ২৭, সূত্র ৮-৯

৩৫. অধ্যায়, ১২, সূত্র ২-৩

৩৬. অধ্যায় ৮, মন্ত্র ৩৬৬

৩৭. অধ্যায় ৮, মন্ত্র ৩৭৪

৩৮. অধ্যায় ৩, মন্ত্র ১২-১৫

একজন ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র রমণীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয় এবং তাতে কোনও পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তাহলে ঐ সন্তান ব্রাহ্মণ হওয়ার অধিকার পাবে না।

ঐ ব্রাহ্মণ যদি দেবতা, আত্মা এবং অতিথির উদ্দেশ্যে পূজা-অর্ঘ্য এবং খাদ্য নিবেদন করে তা ঐ দেবতা, আত্মা বা অতিথি গ্রহণ করবেন না, কারণ তার পত্নী শূদ্র জাত। সুতরাং এক্ষেত্রে সে অর্থাৎ ঐ ব্রাহ্মণের স্বর্গ প্রাপ্তি হবে না।

যে ব্রাহ্মণ কোনও শূদ্র রমণীকে চুম্বন করেছে, যার সঙ্গে একত্রে সহবাস হয়েছে এবং যার গর্ভে সে সন্তানের জন্ম দিয়েছে তার কোনও প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই।[৩৯]

(১০)

বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে,

(ক) একথা সবাই অবগত আছেন যে রাগ পুষে রাখা, হিংসা, অসত্য কথা বলা, ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা, সমালোচনা করা এবং নিষ্ঠুরতা সবই শূদ্রদের বৈশিষ্ট্য।[৪০]

বিষ্ণুস্মৃতি মতে,

(খ) ব্রাহ্মণ সন্তানদের নামকরণের মধ্যে পবিত্রতা থাকা উচিত। ক্ষত্রিয় সন্তানের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও বীরত্ব, বৈশ্যের ক্ষেত্রে সম্পদ আর শূদ্র জাত সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে অবজ্ঞাসূচক এবং ঘৃণাভাব থাকা উচিত।[৪১]

গৌতম ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে,

(গ) শূদ্র হচ্ছে চতুর্থ বর্ণের লোক এবং এদের মাত্র একবার জন্ম হয়।

শূদ্ররা উচ্চ বর্ণের মানুষদের সেবাদাস।

তাদের আশ্রয়ে শূদ্র জীবন নির্বাহ করে।

শূদ্ররা উচ্চ বর্ণের মানুষদের পরিত্যক্ত পাদুকা পরবে এবং উচ্ছিষ্ট আহার করবে।

যদি কোনও শূদ্র উচ্চ বর্ণের কোনও মানুষকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয় অথবা তাদের প্রহার করে, তাহলে শরীরের যে অঙ্গ দিয়ে সে একাজ করে তা

---

৩৯. অধ্যায় ৩, মন্ত্র ১৭-১৯

৪০. অধ্যায়, ৬, মন্ত্র ২৪

৪১. অধ্যায় ২৭, সূত্র ৬-৯

ছেদন করা হবে।

যদি কোনও শূদ্র উচ্চ বর্ণের কোনও মানুষের সঙ্গে উপবেশনে, শয়নে, আলাপ-চারিতায় অথবা গমনে সমকক্ষ হবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে শারীরিক দণ্ড ভোগ করতে হবে।[৪২]

ঐ একই মত অনুসরণ করে মনুস্মৃতি বলেছে,

(ঘ) যদি কোনও ব্রাহ্মণ ক্ষমতা ও লালসার বশে অন্য কোনও উচ্চ বর্ণের মানুষকে (যাদের উপবীত হয়েছে) তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেবাদাস হিসাবে কাজে লাগায়, তাহলে দেশের রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে ছশো পণ দণ্ড দিতে পারেন।

কিন্তু কোনও শূদ্র ক্রীতদাস হোক বা না হোক, তাকে কোনও ব্রাহ্মণ তার সেবায় বাধ্য করতে পারেন। কারণ শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের সেবা করার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

আর যদি মনিব তাকে মুক্তিও দেন, তাহলেও শূদ্রের দাসত্বমোচন হয় না, কারণ দাসত্ব তার জন্মগত, এটা কেউ নিতে পারে না।[৪৩]

এইভাবে কোনও শূদ্র যদি তার এই ধরনের জীবনকে মেনে নেয় এবং কোনও অভিযোগ না করে তাহলে পার্থিব এবং অপার্থিব উভয় জগতের জন্য সে কিছু সঞ্চয় করতে পারে।[৪৪]

এখন পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য শূদ্রের সব থেকে বড় কাজ হল বেদজ্ঞ পুরোহিতদের প্রতি অনুগত থেকে জীবিকা নির্বাহ করা।

কোনও শূদ্র যদি তার আচরণে পবিত্রতা এবং বাক্যে সংযম ব্যবহার করে। কোনও প্রকার আত্মাভিমান না রেখে উচ্চ বর্ণের মানুষদের প্রতি বাধ্য থাকে এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগত তাহলে পরজন্মে সে উচ্চ বর্ণ জাত হয়ে জন্ম নিতে পারে।

এখন কোনও শূদ্র তার জীবন ধারণের জন্য একজন ক্ষত্রিয় বা প্রয়োজনবশত একজন বৈশ্যের বাড়িতে সেবা কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারে।

---

৪২. অধ্যায় ১০, সূত্র ৫০, ৫৬-৫৯ এবং অধ্যায় ১২, সূত্র ১-৭

৪৩. অধ্যায়, ৮, মন্ত্র ৪১২-৪১৪

৪৪. অধ্যায় ১০, মন্ত্র ৩৩৪-৩৩৫

কিন্তু একজন ব্রাহ্মণকে সে সেবা করবে স্বর্গ লাভের জন্য অথবা স্বর্গ লাভ এবং জীবন ধারণ এই দুইয়েরই জন্য। কারণ ব্রাহ্মণের দ্বারাই তার ইহকাল ও পরকালের সব প্রাপ্তি ঘটবে।

শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের সেবা করাকেই শূদ্রের সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর বাইরে যদি সে অন্য কোনও কাজ করে তাতে তার কোনও প্রাপ্তি নেই।

ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদের কর্মদক্ষতা, প্রত্যুপন্নমতিত্ব এবং তার পোষ্যদের সংখ্যা হিসবে করে তাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করবেন।

শূদ্ররা ব্রাহ্মণবাড়ির উচ্ছিষ্ট খাবার খাবে এবং তাদের পুরনো কাপড় এবং পুরনো আসবাবপত্র ব্যবহার করতে পারবে।[৪৫]

ব্রাহ্মণরা পবিত্র, ক্ষত্রিয়রা বীর ও ক্ষমতাশালী, বৈশ্যরা সম্পদশালী এবং শূদ্ররা ঘৃণার যোগ্য হয়েই থাক।

ব্রাহ্মণের নামে পারমার্থিক উন্নয়ন, ক্ষত্রিয়ের নামে সুরক্ষা, বৈশ্যের নামে ধন সম্পদ এবং শূদ্রের নামে সেবা কাজ চিহ্নিত হয়ে থাক।[৪৬]

যদি কোনও শূদ্র দ্বিজ বর্ণের কোনও লোককে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয় তাহলে তার জিভ কেটে ফেলা উচিত, কারণ সে নীচু জাতের লোক।

যদি কোনও শূদ্র উঁচু বর্ণের কোনও লোককে অপমান বা অসম্মান করে, তাহলে দশ আঙ্গুল লম্বা গরম লোহার রড তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত।

আর যদি সে কোনও পুরোহিতকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, তাহলে দেশের রাজা তার কানে এবং মুখে গরম তেল ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দেবেন।

নীচু বর্ণের কোনও লোক যদি উঁচু বর্ণের কোনও লোককে আঘাত করে তাহলে তাকে কেটে ফেলতে হবে। এটা মনুর নির্দেশ। যদি হাত দিয়ে সে উঁচু বর্ণের লোককে প্রহার করে তাহলে তার সেই হাত কেটে ফেলা হবে এবং পা দিয়ে আঘাত করলে সেই পা-ও কেটে ফেলা হবে।

---

৪৫. অধ্যায় ১০, মন্ত্র ১২১-১২৫

৪৬. অধ্যায়, ২, মন্ত্র ৩১-৩২

যদি নীচু বর্ণের কোনও লোক উঁচু বর্ণের লোকের সঙ্গে একসঙ্গে বসার দুঃসাহস দেখায়, তাহলে তার পশ্চাদ্দেশে ছাপ মেরে তাকে নির্বাসনে পাঠানো উচিত অথবা রাজা তার পশ্চাদ্দেশ কেটে দেওয়ারও আদেশ দিতে পারেন।

যদি নীচু বর্ণের কোনও লোক ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উঁচু জাতের কোনও লোকের গায়ে থুথু দেয়, তাহলে রাজা তার ঠোঁট দুটি কেটে দেবার আদেশ দিতে পারেন। আর যদি প্রস্রাব করে তাহলে তার পুরুষাঙ্গ এবং বায়ু নিঃসরণ করলে তার গুহ্যদ্বার কেটে দেওয়া হবে।

যদি সে হাত দিয়ে আক্রমণ করে তাহলে কোনও প্রকার ইতস্তত না করেই তার দুটি হাতই কেটে ফেলার জন্য রাজা নির্দেশ দিতে পারেন। আর যদি পা দিয়ে আক্রমণ করে তাহলে তার পা, দাড়ি, ঘাড় এবং অণ্ডকোষ কেটে দেওয়া হবে।

যদি কেউ অন্য কারও চামড়া ছিঁড়ে দেয় এবং শরীরে রক্তপাত ঘটায় তাহলে তার পাঁচশো পণ জরিমানা হতে পারে, আর মাংস কেটে নেয় তাহলে জরিমানার পরিমাণ হবে ছয় নিষ্ক এবং হাড় ভেঙে দিলে তার দণ্ড হবে নির্বাসন।[৪৭]

নারদস্মৃতিতে বলা হয়েছে,

(ঙ) শূদ্র বর্ণের কোনও মানুষ যদি তার অভ্যাসবশত কোনও আর্য বংশোদ্ভূত দ্বিজ জাতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, তাহলে রাজার লোকজন তার জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলতে পারে এবং তার জীবন নিয়ে বাজি রাখতে পারে।

যদি কোনও শূদ্র উঁচু বর্ণের কোনও লোককে অসম্মান করে, তাহলে তার জিভ কেটে ফেলা হবে, কারণ সে নীচু জাতের।

কোনও শূদ্র যদি নিন্দা ও অবজ্ঞাভরে কোনও উঁচু বর্ণের মানুষের নাম উচ্চারণ করে, তাহলে দশ আঙ্গুল লম্বা গরম লোহার শিক তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

যদি ঔদ্ধত্যভরে সে কোনও ব্রাহ্মণকে উপদেশ দেয়, তাহলে দেশের রাজা তার মুখে ও কানের মধ্যে গরম তেল ঢেলে দেবার আদেশ দেবেন। শূদ্র তার যে অঙ্গ দিয়ে ব্রাহ্মণকে আঘাত করবে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তার সেই অঙ্গ কেটে ফেলা হবে।

৪৭. অধ্যায় ৮, মন্ত্র ২৭৯-২৮৪

নীচু বর্ণের কোনও লোক যদি উঁচু বর্ণের লোকের সঙ্গে একাসনে বসার চেষ্টা করে, তাহলে তার পশ্চাদ্দেশে ছাপ দিয়ে তাকে নির্বাসিত করা হবে অথবা রাজা তার পশ্চাদ্দেশ কেটে ফেলারও আদেশ দিতে পারেন।

আর যদি উঁচু বর্ণের কোনও লোকের গায়ে সে থুথু দেয়, তাহলে তার ঠোঁট, প্রস্রাব করলে পুরুষাঙ্গ এবং বায়ু ছাড়লে গুহ্যদ্বার কেটে দেওয়া হবে।[৪৮]

তিন

ব্রাহ্মণ্য আইন প্রণেতারা শূদ্রদের হেয় এবং বিরুদ্ধাচরণ করে এই ধরনের আইন রচনা করে গেছেন। নিম্নলিখিতভাবে ঐ সব আইনের সারসংক্ষেপ করা যায় :

(১) সামাজিক অবস্থানে শূদ্র সবার নিচে।

(২) শূদ্ররা অপবিত্র জাতি সুতরাং তাদের দর্শনে এবং শ্রবণে কোনও পবিত্র কাজ করা উচিত নয়।

(৩) অন্যান্য বর্ণের মানুষের মত শূদ্রদের সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না।

(৪) শূদ্রদের জীবনের কোনও মূল্য নেই এবং তাদের হত্যা করলে কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। আর যদি দিতেও হয়, তার পরিমাণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুলনায় নেহাতই নগণ্য।

(৫) শূদ্রদের বিদ্যার্জনের কোনও অধিকার নেই এবং তাদের শিক্ষা দেওয়া অপরাধ ও পাপ।

(৬) শূদ্রের সম্পত্তির কোনও অধিকার নেই, একজন ব্রাহ্মণ খুশিমতো তার সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারেন।

(৭) শূদ্রের রাজ সরকারে কাজের কোনও অধিকার নেই।

(৮) শূদ্রের একমাত্র কর্তব্য ও মুক্তির পথ হল উচ্চ বর্ণের মানুষের সেবা করা।

(৯) উচ্চ বর্ণের লোক শূদ্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। তারা অবশ্য শূদ্র রমণীকে উপপত্নী হিসাবে রাখতে পারে। কিন্তু কোনও শূদ্র যদি উচ্চ

---

৪৮. অধ্যায় ১৫, মন্ত্র ২২-২৭

বর্ণের রমণীকে স্পর্শ করে, তাহলে তার ফল হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

(১০) শূদ্রের জন্ম দাস হয়েই এবং চিরকাল দাস হিসাবেই জীবন কাটাতে হবে।

এই সারাংশ পাঠ করলে যে কোনও ব্যক্তি দুটি ব্যাপারে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন। বিষয়টি জেনে তিনি আরও অবাক হবেন, ব্রাহ্মণ আইন প্রণেতারা আইন রচনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শূদ্রকেই বলিপ্রদত্ত হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। এই বিস্ময় আরও বেড়ে যাবে যখন দেখা যায়, ইন্দো-আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নিপীড়িত শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত ছিল বৈশ্যরা—শূদ্ররা নয়। এ ব্যাপারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা বিশ্বামিত্র এবং শ্যার্পণ ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর যজ্ঞের সোমরস পানের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। কাহিনীটি বর্ণনা করতে গিয়ে বৈশ্যদের সম্পর্কে এইভাবে বলা হয়েছে।

'এরপর (পুরোহিত) দধি আনবেন। সেই দধি যদি বৈশ্যদের দ্বারা বাহিত হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে ঐ দধি বৈশ্যদেরই দিয়েই খাওয়াতে হবে। বৈশ্যদের জন্ম অন্যদের সেবার জন্য, উপনদী যেমন মূলনদীকে পরিপুষ্ট করে তদ্রূপ। অন্য বর্ণের লোকেরা বৈশ্যদের সেবা কাজে লাগায়, যেমন খুশি ব্যবহার করে এবং তাদের খুশিমত নিপীড়ন করা চলে'।[৪৯]

এখন প্রশ্ন হল, বৈশ্যদের ছাড় দিয়ে শূদ্রদের ওপর কেন নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হল?

শূদ্রদের অক্ষমতা এবং অসহায় অবস্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সীমাহীন সুযোগ-সুবিধার তুলনা করলে যে কোনও লোক অবাক হয়ে যাবেন। শূদ্রদের অবস্থান তিন বর্ণের নিচে এবং তিনটি বর্ণের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তিন বর্ণের সব শ্রেণীরই শূদ্রদের বিরুদ্ধে সমান নিপীড়নের অধিকার থাকবে। কিন্তু বাস্তবে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের শূদ্রদের ওপর প্রভাব খাটানোর বিশেষ কোনও অধিকার নেই। তিন বর্ণের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বিশেষ অধিকার ও সুবিধা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের কাছে কোনও অপরাধ করে তাতে শূদ্রদের যে শাস্তি হয়, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের কাছে শূদ্র সেই একই

৪৯. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৪৩৬-৪৪০

অপরাধ করলে তার সেই শাস্তি হয় না। যজ্ঞের জন্য যদি কোনও সম্পত্তির প্রয়োজন হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সেই সম্পত্তির দখল নিয়ে নিতে পারে এবং তার জন্য তার কোনও অপরাধ হয় না। ব্রাহ্মণদের অসম্মান হতে পারে, সেজন্য শূদ্র কোনও ধন সম্পত্তি জমাতে পারে না। যে দেশের রাজা শূদ্র সে দেশে কোনও ব্রাহ্মণের বাস করা উচিত নয়।

এসব কেন হবে? ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের যে বিশেষ শত্রু বলে ভাবে তার কি কোনও কারণ আছে?

এর থেকেও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। এর জন্যই কি সাধারণ ব্রাহ্মণ শূদ্রদের ওপর নিপীড়ন করে?

তাদের ধ্যান-ধারণায় যে এটি একটি বিস্ময়কর এবং লজ্জাজনক ঘটনা তা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। ব্রাহ্মণরা কি এই কথা মানবেন? এতে অবাক হবার কিছুই নেই যদি শূদ্রদের ওপর এই ধরনের নিপীড়ন তাদের ওপর কোনও প্রভাববিস্তার না করে। তার কারণও রয়েছে। প্রথমত দীর্ঘদিনের অভ্যাস এবং সামাজিক প্রথা চালু থাকার জন্য তার চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্র এতটাই অনুর্বর হয়ে গেছে যে শূদ্রদের ওপর কেন এই অপমান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঐ ব্রাহ্মণরা তা নিয়ে আর ভাবতে রাজি নয়। দ্বিতীয়ত যারা এ ব্যাপারে সচেতন তাঁরা মনে করেন, অন্যান্য দেশেও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকেও অনুরূপ নির্যাতন ভোগ করতে হয় এবং এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা বা লজ্জার কিছু নেই। দ্বিতীয় এই ধারণার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এই ধারণা অত্যন্ত ঠুনকো এবং এই ধারণাকে লালন করার কারণ যে এর দ্বারা দাসত্ব বোধ সম্পর্কে সচেতন থেকে মর্যাদা রক্ষা করা যায়।

ঘটনা যা আছে তাকে এড়িয়ে কোনও লাভ নেই। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সারা বিশ্বে এই ধরনের অপমান ও নিপীড়নের নজির আর নেই এবং তা আমাদের তুলে ধরার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্য আইনের সঙ্গে মানুষের অধিকার ও নিপীড়ন নিয়ে অন্য কোনও দেশের আইনের তুলনা করা চলে না। ব্রাহ্মণ্য আইন এবং রোমান আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলেই এর সত্যতা প্রমাণ হয়ে যাবে।

চার

রোমান আইনের আওতায় যে সব শ্রেণী সুবিধাভোগ করত এবং যাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হত তার সঙ্গে তুলনার মধ্যে দিয়ে আমরা এই আলোচনা শুরু করতে পারি। রোমান আইন বিশারদগণ মানুষকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ :

(১) অভিজাত ও নীচু বংশীয় শ্রেণী।

(২) মুক্ত নাগরিক ও ক্রীতদাস।

(৩) নাগরিক ও বিদেশি।

(৪) বিচারবিভাগীয় এবং বিচারবিভাগের বাইরের লোক এবং

(৫) খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ।

রোমান আইনে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীরা হল (১) অভিজাত বংশীয়। (২) মুক মানুষ। (৩) নাগরিক। (৪) বিচারবিভাগীয় এবং (৫) খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ।

আর রোমান আইনে যারা নিপীড়ন ভোগ করত তারা হল (১) নীচু বংশজাত ব্যক্তি। (২) ক্রীতদাস। (৩) বিদেশি। (৪) বিচারবিভাগের বাইরের লোক এবং (৫) অ-খ্রিস্টানগণ।

রোমান আইনে মানুষদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল। নাগরিক অধিকার ছিল দুই ধরনের—বিবাহ সংক্রান্ত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত। বিবাহ সংক্রান্ত অধিকার অনুযায়ী কোনও নাগরিক আইন মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত এবং তা থেকে সে পিতৃত্বের অধিকার অর্জন করতে পারত। এছাড়া এতে সগোত্রীয় অধিকারও তার ওপর বর্তাতো। এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ উইল না করে মৃত্যুর ক্ষেত্রে এর দ্বারাই সে সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত। আর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অধিকার অনুযায়ী সে সব সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় করতে পারত এবং এক্ষেত্রে সে রোমান আইনের বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। রোমান আইনে রাজনৈতিক অধিকার বলতে আমরা বুঝি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার এবং সরকারি কাজে নিয়োগের অধিকার।

ক্রীতদাস এবং মুক্ত মানুষদের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, ক্রীতদাসরা ছিল

মালিকের অধীন এবং তাদের অধিকার অর্জনের কোনও ক্ষমতা ছিল না।

বিদেশিদের বলা হত ভ্রমণকারী এবং যেহেতু তারা রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, নাগরিকদের মতো তাদের কোনও প্রকার রাজনৈতিক অথবা সামাজিক অধিকার ছিল না। রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের রক্ষাকবচের আওতায় থাকা ছাড়া বিদেশিদের কোনও প্রকার সুরক্ষার অধিকার ছিল না।

বিচারবিভাগের বাইরের এবং ভিতরের লোকদের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে প্রথমোক্তদের কর্তৃত্ব অন্যের ওপর ন্যস্ত ছিল কিন্তু দ্বিতীয়রা এর থেকে মুক্ত ছিল। কর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করা হত বিভিন্নভাবে। যেমন (১) 'পোটেস্টাস্' (Potestas, উত্তরসূরীর ওপরও রোমের নাগরিকদের আইনি অধিকার) (২) 'মানুস্' (Manus, এই নামের দ্বীপের অধিবাসী বা উক্ত ভাষাভাষী) এবং (৩) 'ম্যানসিপীয়াম' রোমের স্বাধীন নাগরিকদের বিশেষ অধিকার) অবশ্য সকলেরই প্রভাব এক-ই রকম ছিল। রোমান আইনে 'পোটেস্টাস'-এর অন্তর্ভুক্ত হল (১) ক্রীতদাস, (২) শিশু, (৩) মানুস্-এর স্ত্রী, (৪) আদালত কর্তৃক উত্তমর্ণের সঙ্গে যুক্ত অধোমর্ণ এবং (৫) ভাড়া করা মল্ল যোদ্ধা। অন্যের কৃত অন্যায় কাজকে সমর্থনের জন্য কায়েমী স্বার্থের বশবর্তী হয়ে 'পোটেস্টাস'-দের ওপর দায়িত্ব চাপানো হত।

বিচারবিভাগীয় লোকদের থেকে বাইরে থাকার 'পোটেস্টাস'-দের কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করতে হত। এগুলি হল—(১) তারা মুক্ত জীবনযাপন করতে পারত না। (২) তারা সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। এবং (৩) তাদের জন্য কৃত কোনও অন্যায় বা আঘাতকে তারা সমর্থন করতে পারত না।

খ্রিস্টান ধর্মের উৎপত্তির শুরু থেকেই অ-খ্রিস্টানদের ওপর নিপীড়ন শুরু হয়ে যায়। খ্রিস্ট ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে সব রোমান-ই পূজা, ধর্ম এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে এক-ই অবস্থানে ছিল, কিন্তু খ্রিস্টীয় সম্রাটদের আমলে ধর্মত্যাগী, স্বধর্ম বিরোধী, অ-খ্রিস্টীয়গণ এবং ইহুদিদের ওপর অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। বিশেষ করে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বেশি করে অনুভূত হত। যে সমস্ত গোঁড়া খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বীগণ সম্রাটের অনুশাসন মেনে চলত, তারাই একমাত্র পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারত।

রোমান আইনে উল্লিখিত অধিকার এবং নিপীড়নের সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের

মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আসতে পারে যে, একমাত্র ব্রাহ্মণ্য আইনেই যে কিছু শ্রেণীর ওপর নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, রোমান আইনও এর ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য আইনের নিপীড়নের মত রোমান আইনের নিপীড়ন অত কঠোর নয়। কিন্তু এই নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে যদি ব্রাহ্মণ্য আইন এবং রোমান আইনের মধ্যে তুলনা করা হয় তাহলে ব্রাহ্মণ্য আইনের কঠোরতাই প্রকট হয়ে পড়বে।

প্রথমেই দেখা যাক রোমান আইনে অধিকার ও নিপীড়নের ভিত্তি কি ছিল। রোমান আইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান রয়েছে এমন কোনও লোকও জানে যে এর ভিত্তি ছিল দুটি বিষয়ের ওপর। এগুলি হল (১) 'ক্যাপট্' (Caput) এবং (২) 'ইগজেইস্টোসমিও' (Existimatio)।

ক্যাপট্-এর অর্থ কোনও ব্যক্তির নাগরিক মর্যাদা। রোমানদের নাগরিক মর্যাদা বলতে প্রধানত তিনটি বিষয়কে বুঝাত। এগুলি হল স্বাধীনতা, নাগরিকতা এবং পরিবার। স্বাধীনতা বলতে বুঝায় একজন মুক্ত নাগরিকের কথা—ক্রীতদাসের নয়। মুক্ত কোনও ব্যক্তি যদি রোমান নাগরিক হত, তাহলে সে নাগরিকের মর্যাদা ভোগ করত। এর ওপরই যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার ভোগ নির্ভর করত তাই নয়, তাকে সমাজে ভদ্রভাবে বসবাসেরও সুযোগ দিত। পরিশেষে পারিবারিক মর্যাদা বলতে একজন নাগরিকের কোনও পরিবারে অন্তর্ভুক্তির বিষয় বুঝায় এবং সেই পরিবারের সদস্য হিসাবে সে কতকগুলি অধিকার ভোগ করে। কারণ সগোত্র হিসাবেই একমাত্র সে পরিবারের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

যদি তার বর্তমান সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয় বা পরিবর্তিত হয়, তাহলে পরিবারের সদস্য হিসাবে আগে তার যে অধিকার ছিল তা হয় পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে লুপ্ত হতে পারে। তিন ভাবে এই পরিবর্তন হত এবং তার ফলও হত বিভিন্ন প্রকার। এই পরিবর্তনগুলি এইরূপ—সব থেকে বেশি, মাঝামাঝি এবং নামমাত্র। সব থেকে বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি তার স্বাধীনতা, নাগরিকতা এবং পরিবারের সদস্যপদ হারাত, যদি কোনও রোমান নাগরিক যুদ্ধবন্দী হত অথবা তার অপরাধের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত হত। কিন্তু শত্রু কর্তৃক ধৃত ব্যক্তি তার বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এলেই সে তার সব নাগরিক অধিকার ফিরে পেত।

পরবর্তী পরিবর্তন হল নাগরিকত্ব এবং পারিবারিক অধিকার হারানো। তবে এতে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা নষ্ট হত না। যদি কোনও নাগরিক অন্য কোনও দেশের নাগরিকত্ব বরণ করত, সেক্ষেত্রে এইরূপ ঘটত। এই অবস্থায় তার জল ও আগুন

ব্যবহারের অনুমতি থাকত না। এমতাবস্থায় তার রোম সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হত অথবা রোম সাম্রাজ্যেরই মধ্যে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হত।

পরিশেষ যখন কোনও ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ও নাগরিকত্ব না হারিয়ে পরিবারের সদস্যপদ হারাত তখন পরিবর্তন হত যৎসামান্য। উদাহরণস্বরূপ কোনও ব্যক্তির ওপর যদি অন্যের কর্তৃত্ব আরোপিত হত অথবা পরিবারের কোনও পুত্রসন্তান যদি 'পোটেস্টস্' (Potestas), উত্তরসূরী অধিকার রক্ষা আধিকারিক-এর অধিকারে যেত তাহলে আইনগত দিক দিয়ে তার পিতা তাকে মুক্ত করে দিতেন।

নাগরিকত্ব প্রথমত অর্জিত হয় জন্মসূত্রে। আইন সিদ্ধ বিবাহের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয়, সে তার পিতার মতোই নাগরিকত্ব পায়। এটা হবে সন্তানের জন্মদাতা যদি সে হয়, তবেই। আর যদি সন্তানের জন্মদাতা সে না হয়, তাহলে সেই সন্তান তার মায়ের নাগরিকতা পায়। দ্বিতীয়ত, ক্রীতদাসত্ব মোচন হলে কোনও ব্যক্তি নাগরিক হতে পারে। রোমান আইন অনুসারে এক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। আইন সংশোধন হয়ে এটি চালু হয়। মুক্ত ব্যক্তিরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারত আবার ক্রীতদাসেরা নিয়মিত ভোটে অংশগ্রহণ করলে নাগরিকের মর্যাদা পেত। তৃতীয়ত, অনুকম্পাবশতও কোনও ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব দেওয়া হত। রাষ্ট্রীয় উৎসবের সময় কোনও ব্যক্তি বা সমষ্টিকে নাগরিকতা প্রদান করা হত। রাজা অনেক সময় দয়াপরবশ হয়েও নাগরিকত্ব দিতেন। বর্তমান রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তিকে যেমন নাগরিকত্ব দেয়, এই ব্যবস্থা ছিল তদ্রূপ।

নাগরিকতা হারাতে হত প্রথমত স্বাধীনতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই। উদাহরণস্বরূপ যখন কোনও ব্যক্তি যুদ্ধবন্দী হত। দ্বিতীয়ত দাবি পরিত্যাগ করলেও নাগরিকত্ব নষ্ট হত। কোনও ব্যক্তি অন্য কোনও দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তার পূর্বের নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হত। তৃতীয়ত কোনও অপরাধীকে যদি দেশ ছাড়া করা হত অথবা নির্বাসন দেওয়া হত, সেক্ষেত্রেও তার নাগরিকতা নষ্ট হয়ে যেত।

রোমান আইনে কোনও ব্যক্তির নাগরিক মর্যাদা বলতে তার নাগরিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার যেমন ভোটদানের অধিকার এবং কোনও সরকারি পদে নিযুক্ত হবার অধিকারকে বুঝাত। রাজনৈতিক অধিকার নির্ভর করত সেই ব্যক্তির আইনের চোখে কতটা মর্যাদা আছে তার ওপর। একজন রোমান নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক-উভয় মর্যাদাই থাকত। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে সে নাগরিক হিসাবে অধিকার ভোগ করত কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারত না।

তবে যার সামাজিক মর্যাদা এবং আইনের চোখে মর্যাদা উভয়ই থাকত সে নাগরিক এবং রাজনৈতিক উভয় অধিকারই ভোগ করতে পারত। কিন্তু আইনের চোখে মর্যাদাপূর্ণ নয় এমন কোনও ব্যক্তি শুধুমাত্র নাগরিক অধিকার ভোগ করার অধিকারী হত, রাজনৈতিক অধিকার পেত না। সে রাজনৈতিক অধিকারের দাবিও করতে পারত না।

আইনের চোখে দুই ভাবে তার মর্যাদা নষ্ট হত। প্রথমত তার ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলে অথবা কোনও অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলে।[৫০] কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট হলে আইনের চোখে সে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হত। এই পরিস্থিতি নির্ভর করত তার অপরাধের গুরুত্বের ওপর। অপরাধের গুরুত্ব যদি বেশি হত তাহলে আইনের চোখে তাকে বলা হত 'ইনফ্যামিয়া' (Infamia), আর অপরাধের মাত্রা কম হলে বলা হত 'টুরপিটুডো' (Turpitudo). 'ইনফ্যামিয়া'-র অর্থ আইনের চোখে সম্পূর্ণ মর্যাদালুপ্ত কোনও ব্যক্তি। রোমান আইনে যাকে ইনফ্যামিয়া বলা হত সে হত প্রতিবাদী। চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি এবং সঙ্ঘর্ষে যুক্ত কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইনফ্যামিয়া প্রযুক্ত হত। ঠিক তদ্রূপ কোনও রক্ষক, ঋণ গ্রহীতা, অনুশাসিত ব্যক্তি এবং কোনও খাজাঞ্চী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তার কর্তব্য কর্মে গাফিলতি দেখাত, তাহলেও তাকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ইনফ্যামিয়া হতে হত।

ইনফ্যামিয়া বলে ঘোষিত হওয়ার অর্থ রাজনৈতিক অধিকার[৫১] ভোগ থেকে সে পুরোপুরি বঞ্চিত হবে। সে সরকারি কোনও পদে বহাল থাকতে পারবে না এবং নির্বাচনে ভোটদানেরও তার কোনও অধিকার থাকবে না।

রোমান আইনের অধিকার ও নিপীড়নের এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা থেকে এটা পরিষ্কার যে এই আইন সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হত। এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে কোনও প্রকার প্রভেদ ছিল না। রোমান আইনে অধিকার ও নিপীড়ন

---

৫০. যেমন চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, অভিনেতা বা মল্ল হিসাবে মঞ্চাভিনয়, সেনাবাহিনী থেকে কলঙ্কজনক ছাটাই, বেশ্যাবৃত্তি, অন্য অনৈতিক কাজ, ইত্যাদি।

৫১. 'ইনফ্যামিয়া'র অন্য কয়েকটি দিকও ছিল। যেমন, অ্যাটর্নি পদে নিযুক্ত না করা, আদালতে মোক্তার নামার অধিকার অথবা সাক্ষ্য দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। 'ইনফ্যামিয়া' দুই ভাবে প্রয়োগ করা হত—বিবাচন (censor) বা আদালতের রায়ে। বিবাচনের অধিকারের মধ্যে ছিল, জনসাধারণের নৈতিকতা পালন করানো, সাংসদদের বিশেষ অধিকার রদ, সামন্তদের আদেশ পালন, এমন কি কোনও নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করব। বিনা বিবেচনায় লোকমতের অনুরূপ নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা ছিল এদের। আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করতে পারত। কেবল সম্রাট এই অধিকার হরণ করতে পারত।

নির্ধারিত হত সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং সেইভাবেই নির্ধারিত হত কে নাগরিক অধিকারের ভোগের যোগ্য এবং কে আইনের চোখে অবাঞ্ছিত। সমাজে ও আইনের চোখে গ্রহণীয় ব্যক্তি সব অধিকার-ই ভোগ করতে পারত। কিন্তু অন্যথা হলে তাকে দণ্ডভোগ করতে হত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আইনে কি দেখা যায়? অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সেখানে দেখা যায় অধিকার এবং দণ্ডভোগ সাধারণ বিচারের মানদণ্ডে নির্ধারিত হয় না। তা ঠিক করা হয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণ্য আইনের ভিত্তি হল প্রথম তিন বর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা সব অধিকার ভোগের অধিকারী এবং একমাত্র শূদ্ররাই সব রকম দণ্ডভোগ করবে।

ব্রাহ্মণ্য আইনের গোঁড়া সমর্থকরা একথা বলতে পারেন যে এই ধরনের তুলনা দ্বারা রোমান আইনের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হচ্ছে। তাঁরা আরও বলেন, রোমান আইনে অধিকার ও নিপীড়ন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ধারিত হত না বলে যে কথা বলা হয় তা সঠিক নয়। এটা যদি মেনেও নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে অভিজাত শ্রেণী ও নীচু বংশজাতদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নীতিই অনুসরণ করা হত। কিন্তু এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখতে হবে।

প্রথমত এটি মনে রাখতে হবে যে নীচু বংশজাতীয়রা কখনই দাস ছিল না। তারা ছিল স্বাধীন এবং সম্পত্তি ক্রয়ে তা নিজের দখলে রাখায় এবং হস্তান্তর করার ব্যাপারে তাদের অধিকার ছিল। তাদের ওপর অসাম্য বলতে বুঝাত তাদের কোনও সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। দ্বিতীয়ত আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে তাদের দণ্ডভোগ স্থায়ী ব্যাপার ছিল না। তবে তাদের দুই ধরনের সামাজিক অসাম্য ভোগ করতে হত। প্রথমত অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে তাদের বৈবাহিক ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ ছিল।[৫২] রোমান আইনের দ্বাদশ অনুচ্ছেদে এই বিধিনিষেধ সংযোজিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৫ সালে ক্যানুলেনিয়ান (Canulenian) আইন পাশের মধ্যে দিয়ে এই অসাম্য দূর করা হয়। ঐ আইনে অভিজাত এবং নীচু বংশজাতদের মধ্যে বিয়েকে মেনে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ব্যাপারটি ছিল নীচু বংশজাত ব্যক্তিরা রোমান মন্দিরের যাজক বা দৈবজ্ঞ পদে বহাল হতে পারত না, এই অসাম্যও খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালে ওগুলনিয়ান (Ogulnian) আইন পাশ করে বিলোপ করা হয়।

---

৫২. এই ব্যবস্থা দ্বাদশ বিচারকের বিচার-ব্যবস্থা থেকে অনেক প্রাচীন ছিল। দ্বাদশ বিচারকের বিচার কেবল একে স্বীকৃতি দেয়।

'প্লিবিঅ্যান' (Plebeians) অর্থাৎ নীচু বংশজাত ব্যক্তিরা জনগণের সংসদে পরিবর্তনকালে ভোটদানেরও অধিকার পায়। ষষ্ঠ রোম সম্রাট সার্ভিয়স টুলিয়স-এর সময় নতুন সংবিধানে তাদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। তবে তখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের প্রতি রাজনৈতিক অসাম্য ছিল। যেমন তারা সরকারি পদে বহাল হতে পারত না। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব ৫০৯ সালে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তাদের ওপর থেকেই এই অসাম্যও দূর হয়ে যায়। এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৪ সালে। ঐ বছরই প্লিবিঅ্যানরা সর্বপ্রথম ভোটদানের মাধ্যমে শাসনকর্তা নিয়োগ করে। এরপর অবস্থার আরও পরিবর্তন হয়। প্লিবিঅ্যানদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে 'কেস্টারশিপ' (Questership ফ্রান্স সংসদের আর্থিক দায়প্রাপ্ত তিনজনের একজন) পদ উন্মুক্ত হয় খ্রিস্টপূর্ব ৪২১ সালে এবং চূড়ান্তভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪০৯ সালে। দেশের বাণিজ্য দূতের পদে তারা বহাল হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৭ সালে এবং 'ক্যুরুল এডিলশিপ' (Curule-acdileship প্রাচীন রোমে নগরোন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট আধিকারিক) পদে খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৬-তে, শাসকের পদে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬-তে, 'সেন্সরশিপ'-এর পদে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫১-তে এবং 'প্র্যাক্টরশিপ' (Praetorship, দণ্ডাধিকারী) পদে খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬ সালে তারা প্রথম বহাল হয়। অবশেষে তাদের চূড়ান্ত জয় আসে খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭ সালে। এ বছরই হোরটেশিয়ন আইন পাশ হয়। ঐ আইন অনুসারে উপজাতিদের পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব কোনও প্রকার সংশোধন ছাড়াই সরাসরিভাবে রোমানদের ওপর কার্যকর হয়। সাম্যতার দৃষ্টিকোণ বিচারে এর মাধ্যমে অভিজাত ও নীচু বংশজাতদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক একীকরণ ঘটে যায়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের বিচারে নীচু বংশজাত প্লিবিঅ্যানদের অভিজাতদের (Patricians) সঙ্গে সম অবস্থানে শুধু উন্নীত করা হল তাই নয়, প্লিবিঅ্যান-দের অভিজাত শ্রেণীর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার রাস্তাও সুসম হয়ে গেল। রোমান সমাজে জন্ম এবং ভাগ্য ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু এছাড়া ক্যুরুল ম্যাজিস্ট্রেট পদ অলঙ্কৃত করাও এক বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল। যে কোনও নাগরিক, তা সে অভিজাত হক আর নীচু বংশজাত হক ঐ পদে আসীন হলে সে এক বিরাট সম্মানের অধিকারী হত। এই সম্মান তার অধস্তন পুরুষদের ওপরও বর্তাতো তারা এক অভিজাত শ্রেণী গঠন করত এবং সাধারণের থেকে আলাদা হয়ে যেত। প্লিবিঅ্যানদের জন্য এই পদটি উন্মুক্ত হয়ে

যাওয়ায় অনেক প্লিবিঅ্যান[৫৩] অভিজাত হয়ে যায় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা অভিজাত শ্রেণী অর্থাৎ 'প্যাট্রিশন'দেরও (Partician, রোম সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরও) ছাড়িয়ে যায়।

এটা অবশ্য ঠিক যে রোমান আইনে অধিকার এবং দণ্ডভোগের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈষম্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখার বিষয় এই যে নীচু বংশজাত অর্থাৎ প্লিবিঅ্যানদের দণ্ডভোগ স্থায়ী কোনও ব্যাপার ছিল না। প্রথম দিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য থাকলেও পরবর্তী কালে তা আইন করে দূর করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য আইনের গোঁড়া সমর্থকদের নিজেদের পক্ষে কিছুই বলার নেই। রোমান আইনেও অসাম্য আছে এই ধুয়ো তুলে তারা আত্ম সুখ অনুভব করতে পারেন না। তাদের জবাবদিহি করতে হবে কেন ব্রাহ্মণ্য আইনে তিন বর্ণের সঙ্গে এবং শূদ্রদের প্রভেদ রয়েছে। রোমান আইনের মতো তা দূর করে সমতা বিধান করতে পারলেন না? সুতরাং এই উপসংহারে আসা যেতে পারে, রোমান আইনে অধিকার ও নিপীড়ন সম্প্রদায়ভিত্তিক ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আইনে তা পুরোমাত্রায় ছিল।

রোমান আইন এবং ব্রাহ্মণ্য আইনের মধ্যে এটাই শুধু একমাত্র প্রভেদ ছিল না। পার্থক্য ছিল আরও দুটি ক্ষেত্রে। এর মধ্যে একটি হল, অপরাধের ক্ষেত্রে আইনের চোখে সবাই সমান। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে রোমান আইনে সমতা ছিল না একথা ঠিক, কিন্তু কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে রোমান আইনে একে অন্যের মধ্যে পার্থক্য করা হত না এমনকি প্লিবিঅ্যান এবং প্যাট্রিশনদের মধ্যেও এ ব্যাপারে কোনও তারতম্য করা হত না। এক-ই অপরাধের এক-ই শাস্তি। এটাই ছিল নিয়ম। কে অভিযোগকারী এবং কে অভিযুক্ত সেকথা বিচার করা হত না। অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তির মাত্রা হত এক-ই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আইনে স্মৃতি ও ধর্মসূত্রে আমরা কী দেখতে পাই? সেখানে সম্পূর্ণ আলাদা নীতি অনুসরণ করা হয়। একই অপরাধের জন্য শাস্তি আলাদা। এক্ষেত্রে বিচার্য, কে অভিযোগকারী এবং কে অভিযুক্ত। অভিযোগকারী যদি শূদ্র হয় এবং অভিযুক্ত যদি কথিত তিন বর্ণভুক্ত কেউ হয়, তাহলে তার শাস্তি হবে অনেক কম আর উল্টোটা হলে শাস্তির মাত্রা হবে অধিক। ত্রিবর্ণভুক্ত কোনও ব্যক্তি যদি অভিযোগকারী হয় এবং অভিযুক্ত হয়

---

৫৩. প্লিবিঅ্যানদের মধ্যে একজন যখন ক্যারুল ম্যাজিস্ট্রেট পদ অলঙ্কৃত করতেন, এবং অভিজাত পরিবারের স্থাপক হিসাবে চিহ্নিত হতেন, তখন তাকে বলা হত নতুন মানুষ।

কোনও শূদ্র, তাহলে সেই শূদ্রের শাস্তির মাত্রা হবে অনেক বেশি। ব্রাহ্মণ্য আইনে এটা ছিল এক ধরনের বর্বরতা এবং এর জন্যই ব্রাহ্মণ্য আইনের সঙ্গে রোমান আইনের পার্থক্য।

পরবর্তী ধাপে রোমান আইনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য আইনের পার্থক্যের বিষয়টি অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি দণ্ডভোগ বিলোপ করা সংক্রান্ত। প্রথমত, রোমান আইনে দণ্ডভোগের বিষয়টি ছিল ঘটনাসাপেক্ষ। কিছু কিছু ঘটনা যতক্ষণ স্থায়ী হত, ততক্ষণই এই দণ্ডভোগ করতে হত। যে মুহূর্তে ঐ ঘটনার পরিবর্তন হত, তখনই নিপীড়ন বন্ধ হয়ে যেত এবং আইনের চোখে সমান করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হত। দ্বিতীয়ত, রোমান আইনে আরোপিত শর্তগুলি স্থায়ী ছিল না এবং ফলে নিপীড়ন বিলোপ করা যেত। যাদের ওপর ঐ নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হত সেই প্লিবিঅ্যান, দাস, বিদেশি এবং অন্য ধর্মের লোকদের ওপর থেকে শর্তসাপেক্ষে সেই দণ্ডভোগ প্রত্যাহারও করে নেওয়া হত।

দণ্ডভোগ নিতে রোমান আইনে এই বিষয় দুটি মনে রাখলে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে ব্রাহ্মণ্য আইনে স্মৃতি ও ধর্মসূত্রে শূদ্রদের ওপর কি ধরনের অন্যায় নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিপীড়ন এতটা নৃশংস হত না যদি তা শর্তসাপেক্ষ হত এবং যাদের নিপীড়িত হতে হত তাদের যদি তা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আইনে কি দেখা যায়? এতে যে শুধুমাত্র শূদ্রদের ওপর নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, আইনের অনুশাসনে তা স্থায়ী করা হয়েছে। তা ভঙ্গ করা কঠোর অপরাধ এবং অপরাধীকে কঠোরতম দণ্ডভোগ করতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ্য আইনে নিপীড়ন শুধু চাপিয়ে দেয়নি তাকে স্থায়ী করার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ-ই দেওয়াই যথেষ্ট। শূদ্রের কোনও প্রকার বৈদিক ক্রিয়াকর্মে অধিকার নেই, নেই বৈদিক মন্ত্র পাঠ করারও। এই ধরনের অসাম্য নিয়ে কেউ বিরোধ করতে যাবে না। কিন্তু ধর্মসূত্র এখানেই থেমে নেই। ধর্মসূত্র আরও একধাপ এগিয়ে বলেছে, শূদ্রের বেদ পাঠ এবং শ্রবণ দুই-ই অপরাধ, এবং যদি সে এই ধরনের অপরাধ করে তাহলে তার জিহ্বা কেটে ফেলা হবে অথবা গলন্ত সীসা তার কানের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হবে। এর থেকে বর্বরতা আর কি হতে পারে? কোনও লোক কি তার ওপর আরোপিত অসাম্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না? এই ধরনের বর্বর নিপীড়নের কি কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে? কেন ব্রাহ্মণ্য আইন প্রণেতারা

শূদ্রদের ওপর এই ধরনের অমানবিক নিষ্ঠুরতা চাপিয়ে দিলেন? ব্রাহ্মণ্য আইনের গ্রন্থে শুধুমাত্র এই ধরনের নিপীড়নের উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। এতে বলা হয়েছে, শূদ্রদের উপনয়নের কোনও অধিকার নেই। শূদ্ররা কোনও সরকারি পদেও নিয়োগ পাবে না। আরও বলা হয়েছে শূদ্ররা কোনও প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু বলা হয়নি কেন? পুরো ব্যাপারটিই একটি স্বেচ্ছাচার। শূদ্রদের ওপর নিপীড়নের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আচরণের কোনও সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে তার কলঙ্কের কোনও যোগ নেই। শূদ্রদের শাস্তি দেওয়া হয় শুধুমাত্র তারা শূদ্র বলেই। এর পিছনে কি রহস্য আছে, তার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। ব্রাহ্মণ্য আইনের গ্রন্থ এ ব্যাপারে কোনও প্রকার আলোকপাত করবে না। এর ব্যাখ্যা অন্যত্র খুঁজে নিতে হবে।

□ □

অধ্যায় ৪

শূদ্র বনাম আর্য

I

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তাতে সুস্পষ্ট যে ব্রাহ্মণ্য আইন প্রণেতারা শূদ্র কারা এবং কীভাবে তারা চতুর্থ বর্ণভুক্ত হল সে সম্পর্কে কোনও সূত্রের সন্ধান দেননি। সতরাং পশ্চিমী লেখকগণ এ ব্যাপারে কি সূত্র দেন তা আমাদের দেখতে হবে।

শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে পশ্চিমী লেখকদের নির্দিষ্ট কিছু তত্ত্ব রয়েছে। এই মতবাদের প্রতিটি বিষয় নিয়ে তারা একমত না হলেও কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। বিষয়গুলি এইরূপ :

(১) বৈদিক সাহিত্য রচয়িতারা আর্য জাতিভুক্ত ছিল।

(২) আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসে ভারত আক্রমণ করে।

(৩) ভারতবর্ষের আদিবাসীরা দাস ও দস্যু (Dasyus) নামে অভিহিত হত।

(৪) আর্যরা ছিল শাদা চামড়ার লোক আর দাস ও দস্যুরা ছিল কৃষ্ণ বর্ণের।

(৫) আর্যরা দাস-দস্যুদের জয় করে নেয়।

(৬) দাস-দস্যুদের জয় করে আর্যরা তাদের শূদ্রে পরিণত করে।

(৭) আর্যদের মধ্যে বর্ণভিত্তিক সংস্কার ছিল এবং তার ভিত্তিতে তারা চাতুর্বর্ণ গঠন করে। চাতুর্বর্ণ গঠন করে তারা সাদা ও কালো জাতিকে আলাদা করে দেয় এবং কৃষ্ণ বর্ণের মানুষরাই দাস-দস্যুতে পরিণত হয়।

ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্রদের উৎপত্তি এবং অবস্থান সম্পর্কে পশ্চিমী লেখকগণ মূলত এই মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। এই মতবাদ যথার্থ কিনা সেকথা অন্য। কিন্তু একথা অবশ্যই বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্য মতবাদে সামাজিক বিবর্তনের যে ক্লান্তিকর দৈবিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে পশ্চিমী লেখকদের দেওয়া মতবাদ

আলোচনা করলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায় একথা ভেবে যে, তাঁরা এই সামাজিক বিবর্তনের একটা স্বাভাবিক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য মতবাদকে শুধুমাত্র নির্বোধের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সামাজিক উত্তেজক পরিবেশ তৈরি করার জন্যই এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে কিছু নয়। এতে সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেছে। আধুনিক মতবাদে অন্তত এর থেকে বেরিয়ে যাবার একটি রাস্তা খোঁজা যায়।

এই মতবাদের যথার্থতা প্রমাণ করতে হলে সব থেকে ভাল উপায় হল এর প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং দেখতে হবে তা কতটা প্রামাণিক।

এই মতবাদের মূল বিষয়টি নির্ভর করছে আর্য নামে একটি জাতি বাস করত এই প্রস্তাবনা ওপর। এই বিষয়টির ওপরই আমাদের প্রশ্ন নির্ভর করছে।

কারা এই আর্য জাতি? আর্য জাতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে Race অর্থাৎ জাতি শব্দের অর্থ বলতে আমরা কি বুঝি। এই প্রশ্ন আসে এই কারণে যে জাতির সঙ্গে ব্যক্তির ভুল হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। এ ব্যাপারে ভুলের সবথেকে বড় উদাহরণ হল ইহুদিরা। অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে ইহুদিরা একটি জাতি। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত কি?

অধ্যাপক রিপ্লে[১] ইহুদির উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন :

'আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাহলে এইরূপ। এটা একটি ধাঁধা হলেও সত্য। আমরা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত। ইহুদিরা কোনও জাতি নয়। তারা শুধু একটি জনগোষ্ঠী। তাদের মুখের গঠনে আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাই। তাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা নিশ্চিত হই যে, তারা যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না। এই বৈশিষ্ট্য তাদের এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে উত্তরণ ঘটায়, এবং তা কোনও অবস্থাতেই একটি জাতির উত্তরাধিকার নয়'।

একটি জাতি কাকে বলে? একটি সমষ্টি যাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং যেগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত তাদের জাতি বলে আখ্যা দেওয়া

১. রিপ্লে ডব্লু. ই., দি রেসেস্ অব্ ইউরোপ, পৃ : ৪০০

হয়। এক সময় মনে করা হত জাতি গঠন করতে হলে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা হল (১) মস্তিষ্কের গঠন, (২) চুল ও চোখের বর্ণ, (৩) চামড়ার রঙ এবং (৪) দৈহিক উচ্চতা। কিন্তু বর্তমান কালের মতবাদ হল জীবদেহের কোষ এবং দৈহিক উচ্চতা এবং এগুলি জলবায়ু এবং বাসস্থানের ওপর নির্ভর করে। মানুষের জাতির উৎপত্তি নির্ণয় করতে হলে এই লক্ষণ বিচার্য নয়। শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য মত হল, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন এবং এর দ্বারাই নির্ধারিত হয় মানব দেহের উচ্চতা, বহর ও দৈর্ঘ্য এবং এর জন্যই নৃ-বিজ্ঞানী ও জাতিবিজ্ঞানীরা এই বৈশিষ্ট্যকে জাতি নির্ধারণের সম্ভাব্য সব থেকে ভাল উপায় বলে মনে করে থাকেন।

একজন মানুষ কোন্ জাতিভুক্ত তা নির্ধারণের জন্য নৃ-বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের গঠনকেই প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক বলে মনে করে থাকেন। একে মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিদ্যা বলে। মস্তিষ্কের গঠন নির্ণয় করার জন্য এতে দুটি সূত্রের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল (১) মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় এবং (২) মুখাবয়ব সংক্রান্ত। এটিই কোনও জাতি নির্ধারণের চিহ্নস্বরূপ। মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় সূত্রে কানের উপরিভাগ থেকে মাথার প্রসারের সঙ্গে কপাল থেকে পিছনের দৈর্ঘ্যের মধ্যে শতকরা অনুপাত ধরা হয়েছে। ধরা যাক দৈর্ঘ্য ১০০ এবং এক্ষেত্রে বহর ধরতে হবে এর ভগ্নাংশ। মস্তিষ্কের বহর যদি তুলনামূলকভাবে বেশি হয় তাহলে মস্তিষ্ক আরও গোলাকার হবে। ওপর থেকে নিচু এইভাবে দেখলে—এটি আরও বেড়ে যায়। যখন এটি ৮০র ওপর ওঠে তখন মস্তিষ্ককে বলা হয় লঘু মস্তিষ্ক (Brachycephalic) আর যদি ৭৫-এর নিচে পড়ে যায় তখন একে বলা হয় দীর্ঘ মস্তিষ্ক (Dalichocephalic), ৭৫ আর ৮০র সেই মস্তিষ্ককে মধ্য মস্তিষ্ক (Mesocephalic) বলা হয়। এগুলি সবই ব্যুৎপত্তিগত নাম। জাতি গঠন সংক্রান্ত প্রশ্নে সর্বদাই সাহিত্যের ভিতর এগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কেউ যদি এসব সম্পর্কে অবহিত না হয় তাহলে স্পষ্টতই এই সংক্রান্ত আলোচনা ঠিকমত অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং এগুলি সম্পর্কে আমি প্রচলিত জনপ্রিয় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করতে পারি এবং তাতে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। মধ্য মস্তিষ্ক এর প্রচলিত অর্থ হল মস্তিষ্কের মাঝারি গঠন সংক্রান্ত এবং এতে বুঝায় মাথার খুলির প্রস্থ হবে দৈর্ঘ্যের তিন-চতুর্থাংশ এর চার-পঞ্চমাংশ। দীর্ঘ মস্তিষ্ক য়ে বুঝায় লম্বাটে ধরনের মস্তিষ্ক। এই তত্ত্বে করোটির প্রস্থ হবে দৈর্ঘ্যের চার-পঞ্চমাংশের নিচে।

মুখাবয়ব সংক্রান্ত সূত্রে মুখাকৃতি এবং ললাটের মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক বুঝায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের ললাট বেশি চওড়া তাদের মুখাবয়ব গোলাকার হয়। এক্ষেত্রে তার ললাট থেকে চিবুকের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে চিবুকের হাড়ের পশ্চাদভাগের তুলনা করা হয়। পরিমাপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সমতার অভাবের জন্যই এপর্যন্ত এক্ষেত্রে সঠিক তুলনা করা যায়নি। তদ্‌সত্ত্বেও এই পদ্ধতিই সবথেকে নিরাপদ—লম্বাকৃতি মাথা-ডিম্বাকৃতি মুখ এবং হ্রস্বমাথা-গোলাকার মুখ। মস্তিষ্ক সংক্রান্ত এই পরিমাপ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে অধ্যাপক রিপ্লে[২] এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন, মস্তিষ্ক ও মুখাবয়ব বিবেচনায় সমগ্র ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীকে তিনটি পৃথক জাতিতে ভাগ করা যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাপক রিপ্লে মানুষের জাতি নির্ণয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত নিচের সারণিতে দেওয়া হল।

ইউরোপীয় জাতির শ্রেণীবিভাগ

	মস্তক	মুখাবয়ব	চুল	চোখ	উচ্চতা	নাক
(১) টিউটনিক Tuetonic	লম্বা	লম্বা	খুব হালকা	নীল	লম্বা	সরু
(২) আলপাইন Alpine (Celtic)	গোলাকার	চওড়া	হালকা বাদামি	ধূসর	মাঝারি মোটা	মোটা ভারি
(৩) ভূমধ্যসাগরীয় Mediteranean	লম্বা	লম্বা	ঘোর বাদামি অথবা কৃষ্ণবর্ণ	কালো	মাঝারি	চওড়া

আর্য বলে আদৌ কোনও জাতি ছিল কি? এ বিষয়ে দুটি মতবাদে আর্য জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই মতবাদ অনুযায়ী আর্যদের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে লম্বা, তীক্ষ্ণ নাসা, লম্বাটে সরু মুখমণ্ডল, উন্নত গঠন এবং উঁচু লম্বা মুখাবয়ব। দৈহিক দিক দিয়ে তারা বেশ লম্বা এবং দেহের গঠন সর্বত্র আনুপাতিক সুসম।

অন্য মতবাদটি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের। তাঁর মতে আর্য শব্দের তিনটি অর্থ

২. রিপ্লে ডব্লু. ই., দি রেসেস্ অব্ ইউরোপ, পৃ : ১২১

আছে। তিনি তাঁর 'Science of Language' গ্রন্থে বলেছেন :

'আর্য বলতে আমি পৃথিবীর অন্যতম পুরনো একটি নামের কথা বুঝি যারা জমি চাষ করত, যারা সংস্কৃতের মধ্যে হারিয়ে গেছে কিন্তু সংরক্ষিত আছে গ্রীক ভাষার মধ্যে। গ্রীক ভাষায় এতে সময় সূচিত করে। সুতরাং আর্য বলতে প্রথমে বুঝাত ভূমির মালিক এবং যিনি ভূমি কর্ষণ করতেন এবং অন্যদিকে বৈশ্য বলতে বুঝাত গৃহকর্তাকে। মনুর কন্যা ইড়া হল কর্ষিত ভূমির অন্য নাম এবং ইদা সম্ভবত আর্যের সংশোধিত অর্থ'।

দ্বিতীয় যে অর্থে আর্য বলতে ভূমি কর্ষণকে বুঝাত সে সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেছেন :

'আর্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলতে আমি একমাত্র বুঝি যারা জমি চাষ করে। আর্যদের এই নাম গ্রহণ করার একটি কারণ আছে। যাযাবর তুরানিয়ান জাতির সঙ্গে পার্থক্য করার জন্যই তারা এই নাম গ্রহণ করে। তুরা শব্দের অর্থ হল কোবান অশ্বারোহী, তারা ছিল যাযাবর জাতি।'

তৃতীয় অর্থ হল আর্য শব্দটি বৈশ্যদের সাধারণ নামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত এবং বৈশ্যরাই সমগ্র জনসমষ্ঠি গঠন করে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার পানিনির ওপর নির্ভর করেন। আর্য শব্দের চতুর্থ আর একটি অর্থ আছে। সেটি হচ্ছে অভিজাত বংশ। শেষের দিকে এই বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

আর্য জাতি সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যে মতামত দিয়েছেন তার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন[৩]

'রক্তের সম্বন্ধে আর্য বলে কোনও জাতি নেই। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আর্য কোনও জাতির ক্ষেত্রে কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যদি আর্য জাতি সম্পর্কে কোনও কিছু বলি, তাহলে আমাদের জানা উচিত আর্য শব্দের একমাত্র অর্থই হচ্ছে তাদের ভাষা।'

আমি একথা বারে বারে বলেছি যে আর্য বলতে আমি বুঝি রক্ত, অস্থি, চুল বা করোটি কিছুই নয়। আমি একমাত্র বুঝি যারা আর্য ভাষায় কথা বলে তাদের। ঐ এক-ই কথা হিন্দু, গ্রীক, রোমান, জর্মন, কেল্ট এবং স্লাবদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আমি যখন তাদের কথা বলি, সেই কথার মধ্যে কোনও শল্য

৩. ম্যাক্সমুলার, বায়োগ্রাফি অব্ ওয়ার্ডস্, পৃ : ৮৯ এবং ১২০-২১

চিকিৎসকের বৈশিষ্ট্য কাজ করে না। নীল চোখ এবং উজ্জ্বল চুলের অধিকারী স্কান্ডিনেভীয়রা বিজিত বা বিজেতা যে কোনওটিই হতে পারে। তারা তাদের প্রভু বা বিজিতদের ভাষা গ্রহণ করতে পারে অথবা তার উল্টোটাও হতে পারে। আমি যখন তাদের হিন্দু, গ্রীক, রোমান, জার্মান, কেল্ট এবং স্লাব বলি তখন তাদের ভাষাই একমাত্র আমার কাছে বিবেচ্য। এই অর্থের ওপর ভিত্তি করে আমি বলতে পারি একজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হিন্দু এবং সাদা চামড়ার স্কান্ডিনেভীয় ভাষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে একই। এটি একটি অত্যন্ত উন্নত ভাষা। কিন্তু সেই নিরিখে সব কিছু নির্ধারণ করা যায় না। আমার মতে যে নৃ-বিজ্ঞানী আর্য জাতি, আর্য রক্ত, তাদের চুল এবং চোখের কথা বলেন, আর যে ভাষাবিদ মস্তিষ্কের গঠনের ব্যুৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করেন তারা সমান অপরাধ। বিষয়টি ব্যাবিলনীয় ভাষার থেকেও বিভ্রান্তিকর এবং চরম মিথ্যাচার। ভাষার মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করার জন্য আমরা পরিভাষা ব্যবহার করি তদ্রূপ নৃ-বিজ্ঞানীরা করোটি, চুল এবং রক্তের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস করার জন্য তাদের পরিভাষা ব্যবহার করুন।

উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার একসময় আর্য জাতি তত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন এবং এই তত্ত্বের একজন বড় প্রচারক ছিলেন। যাঁরা এই বিষয়টি জানে তাদের কাছে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের এই মতামতের গুরুত্ব অনেক।

এই মতের মধ্যে স্পষ্টতই কোনও মিল নেই। এক মত অনুসারে শারীরিক গঠন বৈচিত্র্য অনুযায়ী আর্য জাতির অস্তিত্ব ছিল। মস্তিষ্ক এবং মুখের গঠনের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্য ছিল। আর দ্বিতীয় মত হল অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের। এই মতানুযায়ী ভাষাগতভাবে আর্য জাতির অস্তিত্ব ছিল। কারণ তারা এক-ই ভাষায় কথা বলত।

মতবাদের এই বিভিন্নতার জন্য বৈদিক সাহিত্যের প্রমাণের জন্য কেউ প্রশ্ন করতে পারে। বৈদিক সাহিত্য খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় ঋগ্বেদে দুটি শব্দ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে অর্য এবং যার শুরু হ্রস্য 'অ' দিয়ে এবং অন্যটি হল আর্য এবং যার শুরু দীর্ঘ 'আ' দিয়ে। হ্রস্য 'অ' দিয়ে অর্য শব্দটি ঋগ্বেদের[৪] ৮৮ জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। কোন্ অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়েছে? চারটি

৪. পরিশিষ্ট I, দ্রষ্টব্য

বিভিন্ন অর্থ[৫] বোঝাবার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (১) শত্রু, (২) অভিজাত ব্যক্তি, (৩) ভারতের নাম এবং (৪) মালিক, বৈশ্য অথবা নাগরিক।

অন্যদিকে দীর্ঘ 'আ' দিয়ে আর্য শব্দটি ঋগ্বেদের[৬] ৩১ জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোনও জায়গায়ই তা জাতি বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি।

ওপরের এই আলোচনা থেকে কোনও প্রকার বিতর্ক ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বেদে উল্লিখিত অর্য বা আর্য শব্দ দুটি কোনও অবস্থাতেই জাতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি।

এছাড়া আরও প্রশ্ন উঠতে পারে। আর্যদের মস্তিষ্ক লম্বাটে বলে বর্ণনা করা হয়েছে—নৃ-বিজ্ঞানে তার প্রমাণ কোথায়? এই বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। অধ্যাপক রিপ্লে-এর দেওয়া ব্যাখ্যায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লম্বাটে মাথা বিশিষ্ট দুই ধরনের জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। এর মধ্যে কারা আর্য সে সম্পর্কে এখনও সংশয় আছে।

দুই

আমরা এখন এর পরবর্তী প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করি। ধরা যাক আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে, তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে এবং স্থানীয়বাসীদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। এখন কয়েকটি প্রশ্ন আলাদা আলাদাভাবে করা যাক। আর্যরা কোথা থেকে ভারতে এসেছে? আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে বহু ধরনের পরস্পরবিরোধী মতামত রয়েছে। বেনফে (Benfey)-এর মতে আর্যদের আদি বাসভূমি নির্ণয় করতে গেলে অবশ্যই তাদের ব্যবহৃত ভাষার ওপর নির্ভর করতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক আইজাক টেলর (Isaac Taylor),[৭] ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ :

'সমস্ত আর্য ভাষার শব্দভাণ্ডারের মধ্যে সাযুজ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে হয়তো এমন কোনও সূত্র পাওয়া যাবে যে আর্যদের মধ্যে ভাষাগত অমিল হওয়ার পূর্বে কোন্ এলাকায় তারা বসবাস করত। তিনি আরও বলেন কিছু

৫. পরিশিষ্ট II, দ্রষ্টব্য

৬. পরিশিষ্ট III, দ্রষ্টব্য

৭. আইজাক টেলর, দি অরিজিন অব্ আর্যস, পৃ : ২৪-২৬

কিছু পশু, যেমন ভল্লুক এবং নেকড়ে এবং কিছু কিছু বৃক্ষ, যেমন বীচ এবং বার্চ প্রভৃতির সঙ্গে প্রাচীন আর্যরা পরিচিত ছিল। এগুলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশু ও বৃক্ষ এবং সর্বোপরি ইউরোপেও এইসব পশু ও বৃক্ষ দেখা যায়। অন্যদিকে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের পশু ও বৃক্ষ, যেমন সিংহ ও বাঘ এবং পাম জাতীয় গাছ শুধুমাত্র ভারতীয় ও ইরানিদের কাছেই পরিচিত ছিল।'

অধ্যাপক আইজাক টেলর বলেন, প্রাচীন আর্যদের শব্দভাণ্ডারে এশীয় অঞ্চলের এই দুটি শিকারী পশু সিংহ ও ব্যাঘ্র এবং এশীয় অঞ্চলের পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আর একটি পশু উটের নাম না থাকায় কাস্পিয়ান পূর্ববর্তী এলাকা থেকে যে আর্যরা ভারতে এসেছিল—এই মতবাদের ব্যাখ্যা করা খুবই শক্ত। গ্রীকরা সিংহকে যে সেমিটিক নামে অভিহিত করত এবং ভারতীয়রা যে নামে ডাকত তার সঙ্গে আর্যদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এতে মনে হয় গ্রীক এবং ভারতে সিংহ অপরিচিত ছিল।'

'এব্যাপারে বেনফের বক্তব্য কিন্তু অধিকতর ফলপ্রসূ এবং গেইজার ও নিজেকে বেনফের শিবিরভুক্ত বলে দাবি করেন। গেইজার অবশ্য আর্যদের বাসভূমি কৃষ্ণ সাগরের উত্তর এলাকা থেকে আরও বিস্তৃত হয়ে উত্তর-পশ্চিমে মধ্য ও পশ্চিম জার্মানি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। বেনফে আর্যদের বাসভূমি কৃষ্ণ সাগরের উত্তর এলাকায় ছিল বলে মনে করেন। গেইজার-এর মতবাদ অর্থহীন বলে মনে হয় না। বৃক্ষের নামের ভিত্তিতে প্রধানত তিনি তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই নামগুলি প্রাচীন আর্যদের শব্দভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত। ফার, উইলো, আশ, অ্যাল্ডার, হেজেল প্রভৃতি বৃক্ষের সঙ্গে তিনি বার্চ, বীচ এবং ওফকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ওফ এবং বীচের মধ্যে যে ভাষাগত সামঞ্জস্য ছিল তার জন্যই গেইজার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গ্রীকরা বীচের দেশ ছেড়ে ওকের দেশে পাড়ি দেয়। এইসব গাছের ফল ছিল খাবার উপযোগী এবং আর্যরা এক ফল গাছের দেশ থেকে অন্য ফলের গাছের দেশে চলে যায়।'

অন্য আর একটি মতবাদ হল আর্য জাতির আদি বাসভূমি ছিল ককেসাস অঞ্চল। এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে আর্যদের মত ককেসিয়ানরা স্বর্ণাভ কেশ, উন্নত ও তীক্ষ্ণ নাসা এবং সুন্দর মুখের অধিকারী ছিল। এই বিষয়ে অধ্যাপক রিপ্লের বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন :

'বিভ্রান্তিপূর্ণ ককেসীয়দের আর্যদের মত নীল চোখ এবং স্বর্ণাভ কেশ আছে

বলে যা বলা হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং এর প্রমাণ পাওয়া যায় দুটি অভ্রান্ত তথ্যের মাধ্যমে। প্রথমত ককেসাস অঞ্চলের শত শত মাইল এলাকার মধ্যে প্রকৃত স্বর্ণাভ কেশের অধিকারী কাউকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত বিরাট বিস্তৃত ককেসাস এলাকার মধ্যে এমন কোনও উপজাতির সন্ধান পাওয়া যাবে না যারা সঠিক আর্য ভাষা বা প্রত্যয়গতভাবেও ঐ ভাষা ব্যবহার করে।

এমন কি ওসেটীয়রা (Ossetes) যাদের ভাষা প্রত্যয়গতভাবে আর্য ভাষার সঙ্গে মিল আছে, তারাও আর্য বলে দাবি করে না। আর যদি ওসেটীয়রা আর্য হয়ও তাহলেও একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে আর্যরা ইরানের দিক থেকে এসেছিল এবং তারা স্থানীয় ককেসীয় নয়। তাদের মস্তিষ্কের গঠন এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধরে তাদের অধিকৃত ভূখণ্ডের বিস্তার (Darriel) পাশের এলাকা বরাবর দক্ষিণাঞ্চল থেকে) এই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ওসেটীয়রা আর্য হোক বা না হোক, অন্যান্য জাতির কাছে তারা বিশেষ গুরুত্ব পায় না। তাদের মধ্যে সৌন্দর্য ও সাহস কোনওটিই নেই। একথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে রুশদের কাছে কীভাবে কোনও প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই নির্লজ্জভাবে তারা বশ্যতা স্বীকার করে।'

'এই ককেসীয়রা কোনও প্রকারেই প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রতিনিধিত্বকারী হতে পারেও না। ইউরোপ ও এশিয়া অর্থাৎ ইউরেশিয়া মহাদেশের প্রায় প্রত্যেকের শারীরিক ও পারিবারিক গঠন বৈচিত্র্যের প্রায় প্রতিটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। এই ব্যতিক্রমটি হল দীর্ঘ দেহ এবং স্বর্ণালী কেশের অধিকারী আর্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিষয়টি শুধু অসম্ভব নয় অবাস্তবও বটে। ককেসাস অঞ্চল জন্মভূমি নয়, এটি বরং মানুষের ভাষার, রীতি-নীতি ও শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যের সমাধিস্থল। প্রথমেই আমাদের এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। ককেসাস পর্বতমালার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের মানুষের বসতি। তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা। এমন সমাবেশ অন্য কোথাও ঘটেনি।'

তিলক[৮] বলেছেন, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল উত্তর মেরু বা সুমেরু অঞ্চলে। তিনি তাঁর এই তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উত্তর মেরু অঞ্চলের জলবায়ু এবং জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তিনি তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত

---

৮. তিলক, বি.জি., দি আর্কটিক হাউস অব্ বেদস, পৃ : ৫৮-৬০

করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন :

'দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জাতিগত পৃথকীকরণ রয়েছে। একটি হল সঠিক উত্তর মেরুতে অবস্থানরত কোনও পর্যবেক্ষকের জন্য, আর অন্যটি এমন পর্যবেক্ষকের জন্য যিনি অবস্থান করছেন মেরু বৃত্ত অঞ্চলে অথবা উত্তর মেরু বৃত্ত এবং উত্তর মেরুর মধ্যবর্তী কোনও এলাকায়'।

তিলক এই পার্থক্যকে মেরু এবং মেরু বৃত্ত এই দুই অঞ্চলে ভাগ করেছেন, বিষয়টিকে তিনি এইভাবে দেখেছেন :

(১) মেরু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য

(ক) সূর্য ওঠে দক্ষিণ দিকে।

(খ) তারাদের কোনও উদয়-অস্ত নেই, কিন্তু তারা আনুভূমিক ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে এবং চব্বিশ ঘন্টায় এক পাক পূর্ণ করছে। একমাত্র উত্তর গোলার্ধ মাথার ওপর থাকে এবং সারা বছরই দৃশ্য। দক্ষিণ গোলার্ধ সব সময়ই অদৃশ্য।

(গ) সারা বছরে মাত্র একটি দীর্ঘ দিন এবং একটি দীর্ঘ রাত্রি এবং সেই দিন আর রাত্রি ছয় মাস করে।

(ঘ) সারা বছর মাত্র একবার সূর্য ওঠে এবং একবার অস্ত যায়, সুতরাং বছরে একটি মাত্র সকাল এবং একটি করে সন্ধ্যা। কিন্তু সকাল বা সন্ধ্যায় একটা অস্পষ্ট আলো থাকে এবং তা একটানা দুইমাস স্থায়ী হয় অথবা চব্বিশ ঘন্টা করে ৬০ বার। কিন্তু সকালের রক্তিম আলো অথবা সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো দিগন্তের কোনও একটি বিশেষ এলাকায় আবদ্ধ থাকে না—তা সে পূর্ব অথবা পশ্চিম যে কোনও দিগন্তেই হোক না কেন, তা সর্বদাই সঞ্চারশীল। তারারা যেমন দিগন্তরেখা বরাবর ঘূর্ণিপাক খায়, ঠিক যেন কুম্ভকারের চক্রের মত। চব্বিশ ঘন্টায় একবার করে ঘোরে। সকালের এই রক্তিম আলো ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না সূর্যের বৃত্ত দিগন্ত রেখার ওপরে না আসে। এই ভাবে সূর্য ছয়মাস ধরে একই গতিপথে পরিক্রমা করে এবং এই পরিক্রমায় ছয়মাস সূর্য অস্ত যায় না। ঐ পর্যবেক্ষণকে ঘিরে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় একবার করে তার পরিক্রমা শেষ হয়।

(২) মেরু বৃত্তের বৈশিষ্ট্য

(১) সূর্য সর্বদা পর্যবেক্ষকের মাথার ওপর দক্ষিণ দিকে অবস্থান করবে। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থানরত কোনও পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেও ঐ এক-ই অবস্থা হবে এই বিবেচনায় একে কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যায় না।

(২) বিরাট সংখ্যক তারা মেরু বৃত্তে অবস্থান করে এবং তারা তাদের গতিপথে পরিক্রমণের পুরো সময়টাই দিগন্তের ওপরে থাকে এবং সেইজন্যই তারা সবসময় দৃশ্য। বাকি তারাগুলির নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মত উদয়-অস্ত হয় কিন্তু তারা অধিকতর বক্রাকারে আবর্তিত হয়।

(৩) বৎসরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) একটি দীর্ঘ রাত্রি। তার শুরু শীতে দক্ষিণায়নে এবং তার স্থায়িত্ব চব্বিশ ঘন্টার বেশি কিন্তু ছয় মাসের কম। সেটি নির্ভর করবে ঐ স্থানের অক্ষাংশের ওপর।

(খ) রাতের মতো ঐ এক-ই রকম দীর্ঘ একটি দিন এবং তার শুরু গ্রীষ্মে উত্তরায়নে। এবং

(গ) একটি পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত্রি বাকি সময়ের জন্য। একটি দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ অথবা একত্রে দিন-রাত্রি। তবে এর স্থায়িত্ব চব্বিশ ঘন্টার বেশি হবে না। দীর্ঘ একটানা রাত্রির পর যে দিন আসে তা প্রথমে রাত্রির চেয়ে ছোট হয় এবং আস্তে আস্তে সময় বাড়তে বাড়তে একটি দীর্ঘ দিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার দীর্ঘ একটানা দিনের পর রাত্রি আসে। সেই রাত্রি প্রথম দিকে দিনের চেয়ে ছোট হয় এবং আস্তে আস্তে সময় বৃদ্ধি পেয়ে দীর্ঘ একটানা রাত্রিতে পরিণত হয় এবং সেইভাবেই বছর শেষ হয়।

(৪) দীর্ঘ একটানা রাত্রির শেষে যে প্রভাত হয় তা, বেশ কয়েক দিন স্থায়ী হয়। কিন্তু এর স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্য উত্তর মেরুর থেকে অনেক কম এবং তা নির্ভর করে ঐ স্থানের অক্ষাংশের ওপর। উত্তর মেরুর কয়েক ডিগ্রির নিকটবর্তী এলাকায় সকালের আলোর পরিক্রমণের বিষয়টি আরও ভাল করে দেখা যায়। অন্যান্য সাধারণ দিন ও রাত্রির মধ্যে যে প্রভাত হয় সেগুলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মতোই। সেগুলি মাত্র কয়েক ঘন্টার স্থায়ী হয়। যখন একটানা দিন

চলে, তখন সূর্য দিগন্ত রেখার ওপরে থাকে। পরিক্রমারত সেই সূর্য অস্ত যায় না, এবং পর্যবেক্ষককে ঘিরে উত্তর মেরুর মতো তা আবর্তন করে, কিন্তু এই আবর্তন হয় একটু বক্রাকারে, ঠিক আনুভূমিক বৃত্তে নয়। দীর্ঘ রাত্রির সময় সূর্য দিগন্ত রেখার নিচে চলে যায়। বৎসরের অন্যান্য সময় সূর্যের উদয় ও অস্ত হয়। ঐ সময় সূর্য চব্বিশ ঘন্টার কিছু অংশ দিগন্ত রেখার ওপরে থাকে। এটি নির্ভর করে সূর্যের পরিক্রমা পথে তার অবস্থানের ওপর।

তিলক তাঁর এই ব্যাখ্যার বিশ্লেষণের পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

'এখানে আমাদের কাছে মেরু এবং মেরু বৃত্ত অঞ্চলের দুই ধরনের পৃথকীকরণ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য ভূ-মণ্ডলের ওপরিভাগে অন্য কোথাও দেখা যায় না। এছাড়া লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার মতো পৃথিবীর মেরু অঞ্চল এখনও এক-ই রকম রয়েছে। ওপরে বর্ণিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বকালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য মেরু অঞ্চলের জলবায়ুতে আগের তুলনায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে।'

উত্তর মেরু বা সুমেরু অঞ্চলের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তিলক আরও বলেছেন :

'বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনায় অথবা তাদের ঐতিহ্যের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্যের যদি কোনও একটির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে আমরা অত্যন্ত নিরাপদভাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এই ঐতিহ্য মেরু। অথবা মেরু বৃত্ত কেন্দ্রিক। এই ঘটনা কবির চোখে প্রকৃতভাবে ধরা না পড়লেও তা তার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। এই ঘটনা ঐতিহ্যবাহী হয়ে পুরুষানুক্রমে পরবর্তী ধাপে পৌঁছে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে বৈদিক সাহিত্যে এর অনেক উদ্ধৃতি বা উল্লেখ রয়েছে। আমাদের সুবিধার জন্য আমরা একে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, যে সমস্ত অধ্যায়ে সরাসরিভাবে দীর্ঘ রাত্রি অথবা দীর্ঘ প্রভাতের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলি এবং দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত ধর্মীয় এবং কল্প কাহিনী বর্ণিত আছে সেগুলি। এগুলির অপ্রতক্ষ্যভাবে প্রথমটির সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এবং প্রথমোক্ত বক্তব্যকেই সমর্থন করে।'

তিলক এই দেখে খুব খুশি হন, বেদে যে সব প্রাকৃতিক ঘটনা এবং ধর্মীয় কাহিনী ও উপকথার উল্লেখ রয়েছে তার সঙ্গে উত্তর মেরুতে যে সব প্রাকৃতিক

বৈশিষ্ট্য তার মিল রয়েছে। এতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বৈদিক কবিরা অর্থাৎ বৈদিক যুগের আর্যরা উত্তর মেরু অঞ্চলে অবশ্যই তাদের বসতি স্থাপন করেছিলেন।

এটি অবশ্য একটি অত্যন্ত আদি মতবাদ। এখানে সম্ভবত একটি বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, বৈদিক যুগের আর্যদের কাছে অশ্ব ছিল অত্যন্ত প্রিয় পশু। তাদের জীবন এবং ধর্মের সঙ্গে অশ্বের যোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর্য যুগের রানীদের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের[১০] অশ্বের সঙ্গে সঙ্গম করার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত তাতেই প্রমাণিত হয় বৈদিক আর্যদের কাছে অশ্বের কতটা গুরুত্ব ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুমেরু অঞ্চলে কি ঘোড়া ছিল? এর উত্তর যদি না বাচক হয় তাহলে সুমেরু অঞ্চলে আর্যরা বসবাস করতেন—এই মতবাদটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

তিন

আর্যরা যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে স্থানীয় অধিবাসীদের পদানত করেছিল তার কি প্রমাণ আছে? ভারতের বাইরে থেকে আর্যরা এসে ভারত আক্রমণ করে দখল করেছিল ঋগ্বেদে (x. ৭৫.৫) এমন কোনও প্রমাণ নেই। শ্রী পি. টি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার[১১] এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে বলেছেন :

'আর্য, দাস এবং দস্যু এই শব্দগুলি যেখানে আছে সেই স্থানের মন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ঐগুলি কোনও জাতি সম্পর্কে উল্লেখ করে না বরং এতে জোর দেওয়া হয়েছে ভক্তি ও বিশ্বাসের ওপর। এই শব্দগুলি মূলত রয়েছে ঋগ্বেদ সংহিতায় যেখানে মন্ত্রের মধ্যে আর্য শব্দটি ৩৩ বার রয়েছে। সেখানে মোট শব্দ রয়েছে এক লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৭২টি। এই বিরল ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে, যে জাতি আর্য বলে নিজেদের অভিহিত করে তারা আক্রমণকারী ছিল না। আক্রমণকারীর বেশে তারা এদেশ জয় করে এদেশের আদি বসবাসকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি। কারণ বিজেতা জাতি সর্বদাই সাধারণত তাদের বিজয় গৌরব সম্পর্কে উদ্ধত হয়ে থাকে।'

---

১০. যজুর্বেদের মাধবাচার্য ভাষ্য

১১. পি.টি. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, লাইফ ইন এইনশনট ইন্ডিয়া ইন দি এজ অব্ মন্ত্রস্, পৃ : ১১-১২

আর বৈদিক সাহিত্যে প্রমাণের কথা যদি বলতে হয় তাহলে দেখা যায় যে আর্যদের বাসভূমি ছিল ভারতের বাইরে—এই মতবাদ সেখানে অচল। এব্যাপারে ঋগ্বেদে সপ্ত নদী সম্পর্কে যে কথার উল্লেখ আছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক ডি. এস. ত্রিবেদ[১২] এ সম্পর্কে বলেছেন—নদীগুলিকে সম্বোধন করা হয়েছে—আমার গঙ্গা, আমার যমুনা, আমার সরস্বতী এইভাবে...। কোনও বিদেশি এইভাবে কোনও নদীকে অতি পরিচিত এবং উদাত্তভাবে আহ্বান করতে পারে না, যদি না তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংযোগ এবং মানসিক একাত্মতা না থাকে।

অন্যদিকে জয় এবং প্রভুত্ব বিস্তার সম্পর্কেও ঋগ্বেদে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে আর্যরা দাস ও দস্যুদের শত্রু মনে করত এবং অনেক স্তোত্র আছে যেখানে বৈদিক ঋষিরা তাদের হত্যা ও ধ্বংস করার জন্য দেবতাদের স্মরণাপন্ন হয়েছেন, কিন্তু আর্যদের এই অভিযানও প্রভুত্ব সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত পৌছনোর আগে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে।

প্রথমত, আর্য এবং দাস-দস্যুদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে ঋগ্বেদে এমন কোনও ঘটনার উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদে যে ৩৩টি স্থানে আর্যদের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে আট জায়গায় দাস এবং সাত জায়গায় দস্যুদের সঙ্গে তাদের বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। এতে মনে করা হত উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। কিন্তু এতে নিশ্চিতভাবে জয় করা বা প্রভুত্ব বিস্তারের কথা বুঝায় না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল দাসদের সম্পর্কে। তাদের সঙ্গে আর্যদের যে সংঘাতই থাকুক না কেন, তারা সম্ভবত একটি পারস্পরিক সমঝোতায় এসেছিল। সেই সমঝোতা ছিল শান্তি এবং সম্মানের। ঋগ্বেদে একথার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে দাস এবং আর্যরা একত্রে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি স্মরণ করা যেতে পারে :

ঋগ্বেদ — VI. ৩৩.৩
VII. ৮৩.১
VIII. ৫১.৯
X. ১০২.৩।

১২. ডি. এস. ত্রিবেদ, দি অরিজিন্যাল হোম অব্ দি এরিয়ানস, খণ্ড ২ পৃ : ৬২

তৃতীয় বিষয়টি হল, তাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ছিল তা জাতিকেন্দ্রিক নয়। এই সংঘর্ষ হত মূলত তাদের ধর্মের বিভেদকে কেন্দ্র করে। উভয়ের মধ্যে এই সংঘর্ষ যে জাতিকেন্দ্রিক ছিল না, ছিল ধর্মভিত্তিক তার প্রমাণ ঋগ্বেদে রয়েছে। এখানে দস্যুদের[১৩] সম্পর্কে বলা হয়েছে :

বলা হয়েছে :

তারা অব্রত, আচারানুষ্ঠান (আর্য) ছাড়া (ঋগ্বেদ! ৫১.৮.৯; i. ৫১.৮; i. ১৩২.৪; iv. ৪১.২; vi. ১৪.৩); অপব্রত (ঋগ্বেদ, v. ৪২.২); অন্যব্রত, বিভিন্ন আচারানুষ্ঠানের (ঋগ্বেদ, .vii. ৫৯.১১; x. ২২.৮); অনগ্নিত্র (ঋগ্বেদ, v. ১৮৯), অয়জু, অয়জবান, যজ্ঞহীন (ঋগ্বেদ, i. ১৩১.৪৪; i. ৩৩; viii. ৫৯.১১); অব্রহ্ম, প্রার্থনাহীন (এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াও) (ঋগ্বেদ, iv. ১৫.৯; x. ১০৫.৮), অনরিচা ঋক্ ছাড়া (ঋগ্বেদ, x. ১০৫.৮); ব্রাহ্মণদ্বেষী, ব্রাহ্মণদের ঘৃণাকারী (ঋগ্বেদ, v. ৪২.৯); এবং অনিন্দ্র, ইন্দ্র ছাড়া (ঋগ্বেদ, i. ১৩৩.১; v. ২.৩; vii ১৮.৬; x. ২৭.৬; x ৪৮.৭). তাদের রীতিনীতি আলাদা, তাদের যজ্ঞে করা যায় না, তাদের কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই, তারা ব্রাহ্মণদের ঘৃণা করে, তাদের কোনও ইন্দ্র নেই এবং ইন্দ্রকেও তারা ঘৃণা করে, তাদের আচার ব্যবহার নম্র নয় এবং তারা ব্রাহ্মণকে কোনও প্রকার দান করে না।

ঋগ্বেদের (x. ২৮.৮) আরও এক জায়গায় বলা হয়েছে :

'আমরা দস্যু জাতি পরিবৃত্ত হয়ে বাস করি। এই দস্যুরা কোনও প্রকার দানধ্যান করে না এবং কোনও কিছুতে বিশ্বাস করে না। তাদের ক্রিয়াকর্ম আলাদা। তাদের মানুষ বলে গণ্য করা যায় না। শত্রু ধ্বংসকারী হে দেবতা তুমি তাদের বিলুপ্ত করো এবং দাসদের আঘাত করো।'

ঋগ্বেদে বর্ণিত এই কথার পর এই মতবাদ আর মেনে নেওয়া যায় না যে আর্যরা সামরিক অভিযান চালিয়ে অনার্য দাস এবং দস্যুদের পদানত করেছিল।

চার

আর্য, তাদের ভারতবর্ষ অভিযান এবং দাস-দস্যুদের ওপর তাদের প্রভুত্ব বিস্তার নিয়ে অনেক কিছু বলা হল। তবে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা আর্যদের

১৩. পি.টি. শ্রী নিবাস আয়েঙ্গার, লাইফ ইন এইনশনট্ ইন্ডিয়া ইন দি এজ অব মন্ত্রস্, পৃ : ১৩

কেন্দ্র করে। এখন দাস-দস্যুদের দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। দাস এবং দস্যু কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়? এর দ্বারা কি কোনও জাতিগত ব্যাপার বুঝায়?

দাস ও দস্যু বলতে যারা কোনও জাতিগত ব্যাপার বুঝায় তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে (১) ঋগ্বেদে মৃধ্রাবাক (Mridhravak) এবং অনাস (Anasa) শব্দ দুটি দস্যুদের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কি কোনও প্রকার জাতিগত ব্যাপার সূচিত করে? ঋগ্বেদে দাসদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের কৃষ্ণবর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মৃধ্রাবাক (Mridhravak) শব্দটি ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত স্থানে উল্লিখিত আছে :

(১) ঋগ্বেদ, i. ১৭৪.২;

(২) ঋগ্বেদ, v. ৩২.৮;

(৩) ঋগ্বেদ, vii. ৬.৩;

(৪) ঋগ্বেদ, vii. ১৮.৩।

মৃধ্রাবাক এই বিশেষণটি বলতে কি বুঝায়? মৃধ্রাবাক অর্থ হচ্ছে যে লোক অত্যন্ত অভদ্র এবং অসংযত ভাষায় কথা বলে। এই অসংযত এবং অভদ্র ভাষার ব্যবহার কি এই জাতিগত পার্থক্যের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হতে পারে? এর ওপর ভিত্তি করে জাতিগত পার্থক্যের বিচার করা একেবারেই অর্থহীন।

অনাস (Anasa) শব্দটি আছে ঋগ্বেদের (v. ২৯.১০)। এর অর্থ কি? শব্দটির দুই প্রকারের অর্থ করা হয়েছে। একটি অর্থ করেছেন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার, আর অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন সায়নাচার্য। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের মতে এর অর্থ হচ্ছে এমন লোক যার নাসা নেই অথবা যার নাসা চ্যাপ্টা। আর এর ওপর ভিত্তি করে মনে করা হয়েছে আর্য এবং দস্যুরা আলাদা জাতি ছিল। অন্যদিকে সায়নাচার্য এর অর্থ করেছেন এমন ব্যক্তি যার মুখ নেই অর্থাৎ দুর্মুখ যে কোনও ভাল কথা বলতে পারে না। এই দুই ধরনের অর্থ করার কারণ হচ্ছে, দুইজনে দুইভাবে শব্দটি উচ্চারণ করছেন। সায়নাচার্য শব্দটি পড়েছেন অন-আসা, অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এটিকে উচ্চারণ করেছেন অ-নাসা। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের উচ্চারণ অনুযায়ী এই শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার কোনও নাক নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দু'জনের এই উচ্চারণের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক? সায়নাচার্যের উচ্চারণ যে

ভুল একথা মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং বলা যেতে পারে এটি সঠিক। প্রথমত এই শব্দটির কোনও অর্থ হয় না এমন নয়। দ্বিতীয়ত অন্য কোথাও যখন দস্যুদের নাসাহীন বলে বর্ণনা করা হয়নি, তখন অন্য প্রকারের অর্থ করার জন্য শব্দটি অন্যভাবে পড়ার কি কোনও অর্থ হতে পারে? সব থেকে ভাল হল মৃদ্রবকের প্রতি শব্দ হিসাবেই এটি পড়ে। সুতরাং দস্যুরা যে আলাদা জাতি ছিল এমন কথা বিশ্বাস করার কোনও প্রমাণ নেই।

অন্যদিকে দাসদের কথা বলতে গিয়ে তাদের কৃষ্ণ যোনি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের (iv. ৪৭.২১) য়ে এই বর্ণনা আছে। কিন্তু এর কি অর্থ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা করার আগে অনেকগুলি বিষয় নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রথমত, ঋগ্বেদের মাত্র এই একটি স্থানেই দাসদের কৃষ্ণ যোনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটি আক্ষরিক অর্থে অথবা ভাষার আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তৃতীয়ত, এটি একটি সত্য ঘটনা না তিরস্কার, তা আমরা জানি না। যতক্ষণ না পর্যন্ত এইসব বিষয় পরিষ্কার না হচ্ছে এই মতবাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে, যেহেতু দাসদের কৃষ্ণ যোনি বলা হয়েছে, তারা কৃষ্ণ বর্ণের জাতি।

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ থেকে নিম্নলিখিত স্তোত্রগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) ঋগ্বেদ, vi ২২.১০ : 'ওহ বৃত্রার তুমি দাস থেকে আর্যদের সৃষ্টি করেছ, খারাপ লোক থেকে ভাল লোক সৃষ্টি করেছ, তুমি তোমার শক্তিতে এইসব করেছ, তুমি আমাদের সেই শক্তি দাও যাতে আমরা শত্রুদের জয় করতে পারি'।

(২) ঋগ্বেদ x. ৪৯.৩ : (ইন্দ্র বলেছেন) 'আমি দাসদের আর্য উপাধি থেকে বঞ্চিত করেছি'।

(৩) ঋগ্বেদ i. ১৫১.৮ : 'ওহ ইন্দ্র, আর্য কারা এবং দাস কারা চিহ্নিত করে তুমি তাদের আলাদা কর'।

এই শ্লোকগুলির অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, আর্য এবং দাস ও দস্যুদের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, তা বর্ণভিত্তিক বা শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে কোনও প্রকার জাতিগত প্রভেদ ছিল না। সুতরাং এক্ষেত্রে একজন দস্যু বা আর্য হতে পারে। আর এর জন্যই আর্যদের সঙ্গে দাস-দস্যুদের আলাদা করার দায়িত্ব ইন্দ্রের ওপর দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ

আর্য জাতি সম্পর্কে পশ্চিমী লেখকদের মতবাদ যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ নিঃসন্দেহেই সেকথা বলা যায়। বিষয়টি কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কারণ পশ্চিমী চিন্তাবিদ্‌রা সাধারণত গভীর অনুসন্ধান এবং সতর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের মতবাদ ব্যর্থ হল কেন? কেন ব্যর্থ হল তা অবশ্যই জানা প্রয়োজন। এই তত্ত্ব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর দ্বিবিধ ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত এই মতবাদ আগের মতবাদকে সন্তুষ্ট করার মনোভাব নিয়েই রচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সত্যানুসন্ধান সেখানে অনুমতি পায়নি। বরং এই তত্ত্বের ভিত্তি পূর্বচিন্তিত এবং তাকে প্রমাণ করার জন্য কিছু ঘটনাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

আর্য জাতি তত্ত্ব একটি ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ড: বোপ এর ভাষা বিদ্যা সংক্রান্ত প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করেই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। ড: বোপ এর সেই যুগান্তকারী গ্রন্থটি হল 'তুলনামূলক ব্যাকরণ'। ১৮৩৫ সালে এটি প্রকাশিত হয়। ড: বোপ তাঁর ঐ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ইউরোপের অধিকাংশ ভাষা এবং এশিয়ার কিছু ভাষার মূল একই। ইউরোপীয় ভাষা এবং এশীয় ভাষার মধ্যে ড: বোপ যে যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছেন, তাকে বলা হয় ইন্দো-জর্মন (Indo-Germanik), সম্মিলিতভাবে তাদের বলা হয় আর্য ভাষা। এর কারণ বৈদিক ভাষা বলতে আর্যদের বুঝায় এবং একইভাবে একে ইন্দো-জার্মান গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়। এই ধারণাই প্রধান বিষয় এবং এর ওপরই আর্য জাতি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

এই ধারণা থেকে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। এক জাতির ঐক্য এবং দুই হল আর্য জাতি। যুক্তি এই প্রকার—এইসব ভাষা যদি পূর্বপুরুষদের একই আদি ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এমন একটি জাতি ছিল যাদের মাতৃভাষা ছিল একই এবং যেহেতু এই মাতৃভাষা আর্য ভাষা নামে পরিচিত ছিল। যারা এই ভাষায় কথা বলত তাদের বলা হত আর্য জাতি। সুতরাং একটি পৃথক এবং আলাদা আর্য জাতির অস্তিত্ব শুধুমাত্র ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা আর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। সেটি হল এদের আদি বাসভূমি ছিল একই। একটি কথা বলা হয়ে থাকে যে একই এলাকায় বসবাসকারী এবং পারস্পরিক নৈকট্য না থাকলে ভাষার মধ্যে সাযুজ্য থাকতে

পারে না। একই এলাকায় বসবাস এই সিদ্ধান্ত সুতরাং এই ধারণা থেকেই এসেছে।

আর্যরা ছিল আক্রমণকারী—এটা একটি আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের প্রয়োজন ছিল। কারণ এটি একটি ভিত্তিহীন ধারণা এবং এর ওপরেই পশ্চিমী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। ধারণা এই যে ইন্দো-জর্মনরা আদি আর্যদের খাঁটি আধুনিক উত্তরসূরি। এদের আদি বাসভূমি ইউরোপের কোনও অঞ্চলে ছিল বলে মনে করা হয়। এই ধারণা থেকে একটি প্রশ্ন আসে। কীভাবে আর্য ভাষা ভারতে এল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব, যদি মনে করা হয়, বাইরে থেকে আর্যরা ভারতে এসেছে। এই কারণেই আবিষ্কার করা হয়েছে যে আর্যরা ছিল আক্রমণকারী।

তৃতীয় আর একটি ধারণা হল আর্যরা ছিল উন্নততর জাতি। এই ধারণা এই বিশ্বাস থেকে তৈরি হয়েছে আর্যরা ছিল ইউরোপীয় জাতি এবং ইউরোপীয় জাতিসমূহ এশীয় জাতিদের তুলনায় উন্নততর ছিল। উন্নততর জাতি এই ধারণা থেকেই কেন তারা উন্নততর ছিল তা প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু হয়ে যায়। আর্যরা আক্রমণকারীর বেশে এসে এদেশের জাতিসমূহকে পদানত করেছিল—আর্যরা যে উন্নততর জাতি এই ধারণাকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এর থেকে ভাল মতবাদ আর কি হতে পারে? পশ্চিমী গবেষকগণ এইভাবে আর্যদের ভারত আক্রমণের কাহিনী রচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে তাঁরা এদেশ আক্রমণ করে স্থানীয় দাস-দস্যুদের[১৪] পরাজিত করে।

এ সম্পর্কে চতুর্থ ধারণাটি হল, ইউরোপীয় জাতিদের গাত্র বর্ণ ছিল শাদা এবং এই গাত্র বর্ণ নিয়ে স্থানীয় কৃষ্ণ বর্ণ জাতিদের প্রতি তারা বিদ্বেষ পোষণ করত। আর্যরা ছিল যেহেতু ইউরোপীয় জাতি, ধারণা করে নেওয়া হয় তাদেরও এই বর্ণ বিদ্বেষ ছিল। সুতরাং যে আর্য জাতি ভারতে এসেছিল, তাদের মধ্যেও যে বর্ণবিদ্বেষ ছিল এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করার কাজ শুরু হয়ে যায়। এর প্রমাণ চাতুর্বর্ণ প্রতিষ্ঠা। যেসব আর্য ভারতে এসেছিল তারাই এই চাতুর্বর্ণের প্রতিষ্ঠা করে। আর এই গবেষকদের মতে বর্ণের ওপর ভিত্তি করেই এই চতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ গবেষকগণ জাতির শ্রেণী বিভাগ বলতে এই বর্ণকেই বুঝে থাকেন।

এই ধারণার কোনওটিই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আর্য জাতির উৎপত্তির সূত্র ধরেই আলোচনা শুরু করা যাক। আর্য জাতির মধ্যে শারীরিক গঠন এবং

১৪. দাস ও দস্যুদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য।

তাদের মধ্যে ভাষাগত মিল যে এক জিনিস নয়, এই মতবাদে তা স্বীকার করা হয়নি। আর আর্য বলে যদি কোনও জাতি থাকে তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে শারীরিক দিক থেকে সম গঠন সম্পন্ন ব্যক্তিদের এক-ই বাসভূমি হতে পারে এবং যাদের মধ্যে ভাষাগত মিল রয়েছে তাদের বাসভূমি অন্য হবে। আর্য জাতিতত্ত্ব সমভাষা সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই ভাষাগত মিল ধরে নেওয়া হয় কারণ এর গঠনে একটা নৈকট্য আছে। আর্যরা বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষ জয় করেছিল এমন ধারণা প্রমাণ করা যায় না। আর দাস-দস্যুরা যে এদেশের আদি বসিন্দা[১৫] তাও প্রমাণ করা যায় না।

এছাড়া চাতুর্বর্ণ এই বিষয়টি আর্যদের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ—এই প্রস্তাবনাটিও বড় বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। জাতি বিভাগ যদি বর্ণভিত্তিক হত, তাহলে চাতুর্বর্ণভুক্ত চারটি শ্রেণীর বর্ণ আলাদা হত। একথা কেউ বলে না কি সেই চারটি বর্ণ এবং কোন্ সেই চারটি জাতি যাদের চতুরাশ্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এই তত্ত্ব দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সূচনা—এদের মধ্যে এক দলের গাত্রবর্ণ শাদা আর অন্য দলের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ।

আর্য জাতিতত্ত্বের রচয়িতারা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এত বেশি সচেষ্ট যে, তাঁরা কোনও প্রকার অবাস্তব বিষয় নিয়ে অবতারণা করছেন কিনা তা তাঁদের খেয়াল নেই। তাঁরা একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যস্ত যে তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবেনই এবং এ ব্যাপারে তাঁরা বেদ থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করতে ইতস্তত করেননি। বরং তাঁরা মনে করেছেন এটাই ভাল পন্থা। অধ্যাপক মাইকেল ফস্টার কোথাও বলেছেন যে, 'অনুমানই বিজ্ঞানের ভিত্তি'। অনুমান ছাড়া কোনও প্রকার ফলপ্রসূ গবেষণা সম্ভব নয়। কিন্তু একথাও সমভাবে সত্য, যেখানে একটি ধারণাকে প্রমাণ করার চেষ্টা খুব বড় হয়ে দেখা দেয়, সেখানে ঐ ধারণা বিজ্ঞানের পক্ষে বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমী গবেষকগণ যে আর্য জাতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা এমনই অনুমাননির্ভর যে বিষয়টি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়ভাবে বিষবৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর্য জাতিতত্ত্ব এতটাই অবাস্তব যে বহুদিন পূর্বেই তা লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে এটি এখনও জনসাধারণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চেপে বসে আছে। এই ঘটনার ক্ষেত্রে দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া

---

১৫. এ-বিষয়ে অধ্যাপক রিপ্লের পর্যালোচনা, ইফ্রা দ্রষ্টব্য। পৃ : ৭৬

যেতে পারে। প্রথমত ব্যাখ্যাটি হল এই যে, এটি ব্রাহ্মণদের সমর্থনপুষ্ট। এটি একটি অদ্ভুত ঘটনা। হিন্দু হিসাবে তাদের উচিত আর্য তত্ত্বের প্রতি সমর্থন না করা এবং ইউরোপীয় জাতিরা যে এশীয়দের তুলনায় উন্নততর তা দ্বিধাহীনভাবে মেনে না নেওয়া। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এই ধরনের কোনও মনোভাব তো নেই-ই এবং বিষয়টিকে তারা স্বাগত জানায়। এর অবশ্য কারণ আছে। ব্রাহ্মণরা দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করে। তারা আর্য জাতির প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবি করে এবং মনে করে বাকি হিন্দুরা সব অনার্য। এই তত্ত্ব তাদের সঙ্গে ইউরোপীয় জাতির যে সম্পর্ক ছিল তা সূচিত করে এবং তাদের মধ্যে ইউরোপীয় জাতির ঔদ্ধত্য এবং নাক উঁচু মনোভাব এনে দেয়। তারা এই তত্ত্বের এই অংশটি পছন্দ করে, যেখানে বলা হয়েছে আর্যরা ছিল আক্রমণকারী এবং অনার্য জাতি সমূহকে তারা পরাজিত করেছে। এই তত্ত্বই অনার্য জাতির ওপর তাদের প্রভুত্ব বিস্তারে সহায়তা করে।

দ্বিতীয় যে কারণে আর্য জাতিতত্ত্ব লুপ্ত হয়ে যায়নি তা হল ইউরোপীয় গবেষকদের চাপ। তাঁরা বর্ণ বলতে মনে করেন গায়ের রঙ এবং বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই মতবাদকে সমর্থন করেন। আর এই বিষয়টিই আর্য তত্ত্বের প্রধান স্তম্ভ। যতদিন পর্যন্ত বর্ণের এই ব্যাখ্যা চলতে থাকবে, ততদিন এই আর্য তত্ত্ব বলবৎ থাকবে। আর্যতত্ত্বের এই অংশটি সুতরাং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এক), ইউরোপীয় জাতিদের গাত্রবর্ণ কি শাদা ছিল না কালো ছিল?

দুই), ভারতীয় আর্যদের গাত্রবর্ণ কি শাদা ছিল?

তিন), বর্ণ শব্দের আদি অর্থ কি?

ইউরোপের আদিবাসীদের গাত্রবর্ণ সম্পর্কে অধ্যাপক রিপ্লে নিশ্চিতভাবে এইমত ব্যক্ত করেছেন যে তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণের। অধ্যাপক রিপ্লে যা বলেছেন :[১৬]

'আমাদের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ় হয়ে আছে যে ইউরোপের আদি বাসিন্দাদের শুধু যে লম্বাটে ধরনের মাথা ছিল তাই নয়, তাদের গাত্রবর্ণও ছিল কৃষ্ণ। বিভিন্নভাবে গবেষণা করে আমরা এই তথ্য পেয়েছি। আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাসকারী (ক্রো-ম্যাগনন (Cro-Magnon) জাতির প্রাগৈতিহাসিক পরিচিতি নিয়ে

১৬. রিপ্লে, ডব্লু. ই, রেসেস্ অব্ ইউরোপ, পৃ : ৪৬৬

অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি সেখানকার কৃষকদের কালো চুল এবং কালো উজ্জ্বল চোখ ছিল। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গেছে ওয়েলস্, আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের অধিবাসীরা শ্যামলা গাত্রবর্ণের অধিকারী ছিল এবং ব্রিটেনের জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশই ছিল তারা। উপরন্তু যে গরফাগনন (Garfagnan) নামক স্থানে সেখানে প্রাচীন উত্তর ইতালির লিঙ্গুরিয়ান (Lingurian) জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে তাদেরও গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণ। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিকোণের বিচারে অথবা স্থানীয় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইউরোপের আদি বাসিন্দাদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ ছিল। ভূমধ্যসাগরের এলাকায় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের গাত্রবর্ণের মিল ছিল—কিন্তু স্কান্ডিনেভীয়দের সঙ্গে নয়'।

এখন আর্যদের মধ্যে কোনও প্রকার বর্ণবিদ্বেষ ছিল কিনা, সে ব্যাপারে বেদে কি দেখা যায়? এ বিষয়ে ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত অণুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় :

ঋগ্বেদের i. ১১৭.৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে অশ্বিন এর। তিনি শ্বেত্যা এবং রুশত্-র মধ্যে বিবাহ সংযোগ ঘটিয়েছেন। শ্বেত্যা ছিল কালো এবং রুশত্র গাত্রবর্ণ ছিল উজ্জ্বল ফর্সা।

ঋগ্বেদের i. ১১৭.৫ এ বন্দনার উল্লেখ রয়েছে। তার গাত্রবর্ণ ছিল সোনালি এবং সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অশ্বিনের কাছে প্রার্থনা করছে।

ঋদ্বেদের ii. ৩.৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে একজন আর্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে সুপুত্রের কামনা করে। ঐ আর্যর গাত্রবর্ণ ছিল বাদামি।

এইসব উদাহরণ প্রমাণ করে যে বৈদিক আর্যদের কোনও প্রকার বর্ণবিদ্বেষ ছিল না। আর তা হবেই বা কি করে? কারণ বৈদিক আর্যদের এক-ই ধরনের গাত্রবর্ণ ছিল না। তাদের গাত্রবর্ণ ছিল বিভিন্ন ধরনের—কারও সাদা, কারও তামাটে আবার কারও বা কালো। দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের গায়ের রঙ ছিল শ্যাম অর্থাৎ কালো। যদুবংশ আর্য জাতির একটি শাখা। এই বংশের অধস্তন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর গাত্রবর্ণও ছিল শ্যাম। দীর্ঘতমা ঋষির ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করেছেন। তাঁরও গাত্রবর্ণ কালো ছিল। তাঁর নামের সঙ্গে দেহের বর্ণের সাযুজ্য ছিল বলে মনে করা হয়। কন্বমুনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আর্য ঋষি। ঋগ্বেদে যে বর্ণনা রয়েছে, তার গাত্রবর্ণ সম্পর্কে তাতে দেখা যায় তিনি কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন।

তৃতীয় এবং শেষ বিষয়টি হল বর্ণ[১৭] শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার। প্রথমেই দেখা যাক ঋগ্বেদে বর্ণ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণ শব্দটি ঋগ্বেদের[১৮] ২২টি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি ক্ষেত্রে বর্ণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অগ্নি, ঊষা এবং সোম প্রভৃতি দেবতাদের উল্লেখ করার জন্য এবং এর অর্থ হল বৈশিষ্ট্য, জাঁকজমক এবং বর্ণ। দেবতাদের সম্পর্কে যেহেতু এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু ঋগ্বেদে মানুষের সম্পর্কে কি অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা নিশ্চিত নয়। ঋগ্বেদের পাঁচ জায়গায় বর্ণ শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্থানগুলি হল :

(১) i. ১০৪.২,

(২) ii. ১৭৯.৬,

(৩) ii. ১২.৪;

(৪) iii. ৩৪.৫ এবং

(৫) ix. ৭১.২

এগুলির দ্বারা কি প্রমাণ হয় ঋগ্বেদে বর্ণ শব্দটি গাত্রবর্ণ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? ঋগ্বেদের তিন, ৩৪.৫ অনুচ্ছেদটিতে সংশয় রয়েছে, শুক্লা বর্ণের অর্থ বৃদ্ধি—এই ধরনের উক্তির দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এর অর্থ এই হতে পারে ইন্দ্র ঊষাকে তার আলো ছড়িয়ে দিতে বলছেন এবং এর ফলে আস্তে আস্তে শাদা রঙ বাড়ছে। অথবা এর অর্থ এমন হতে পারে যে স্তোত্র রচয়িতাদের শাদা গাত্রবর্ণ ছিল এবং বংশানুক্রমিকভাবে এই বর্ণের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। দ্বিতীয় অর্থটি খুবই সুদূরপ্রসারী কারণ সাদা গাত্রবর্ণের লোক সংখ্যা বৃদ্ধিই এর ফলস্বরূপ এবং ঊষার আলোই এর কারণ।

ঋগ্বেদের ix. ৭১.২ য়ে অসুর বর্ণ পরিত্যাজ্য বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা পরিষ্কার নয়। সূক্ত-র বর্ণিত অন্যান্য অংশের তুলনায় এই উক্তি স্বচ্ছও নয়। এই সূক্ত 'পবমান সোম দেবতা'র অংশ। একথা মনে রেখে 'অসুর বর্ণ পরিত্যাজ্য' এই কথাটি সোম-এর বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে অবশ্যই মনে করা যেতে পারে। এখানে বর্ণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে। এর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, কালো আচ্ছাদন পরিত্যাগ করে সে উজ্জ্বল আচ্ছাদন পরিধান করেছে। এর থেকে পরিষ্কার যে বর্ণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অন্ধকার বুঝানর জন্য।

১৭. মহারাষ্ট্র জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৩, পৃ : ৩৯-৪২

১৮. পরিশিষ্ট vi. দ্রষ্টব্য

ঋগ্বেদের i. ১৭৯.৬ অনুচ্ছেদটি এ ব্যাপারে খুবই সহায়ক। এখানে বলা হয়েছে অগস্ত্য মুনি প্রজা, সন্তান এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য লোপামুদ্রার সঙ্গে সহবাস করেন এবং এর ফলে দুটি বর্ণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখানে এই দুটি বর্ণ বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার নয়, যদিও মনে করা হয় এই দুটি বর্ণ বুঝাতে আর্য এবং দাসদের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যে যাই বুঝাক না কেন, এখানে বর্ণ বলতে শ্রেণী মনে করা হয়েছে, গাত্রবর্ণ বুঝায়নি।

ঋগ্বেদের i. ১০৪.২ এবং ii. ১২.৪ এই দুটি অনুচ্ছেদে বর্ণ বলতে দাস বুঝানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্ণ বলতে কি বুঝায় যখন তা দাসদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়? এতে কি দাসদের গাত্রবর্ণ বুঝায় না দাসদের একটি পৃথক শ্রেণী বুঝায়? এই দুটির কোন্ অর্থটি সঠিক সে সম্পর্কে সঠিক কোনও সিদ্ধান্ত পৌছান যায় না।

অতএব ঋগ্বেদে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, তাতে কোনও উপসংহার টানা যায় না। এই প্রসঙ্গে একথা মনে করা যেতে পারে যে এই শব্দটি ইন্দো-ইরানীয় সাহিত্যের কোথাও উল্লেখ আছে কিনা।[১৯] যদি থাকে তার অর্থ কি? এটি জানতে পারলে পরিস্থিতির পক্ষে সহায়ক হবে।

সৌভাগ্যক্রমে শব্দটি জেন্দ আবেস্তাতে রয়েছে। এখানে শব্দটি বরণ অথবা বরেণ এইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বিশেষভাবে 'ধর্মীয় বিশ্বাস, উপদেশ, ধর্মীয় মতামত' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি মূল শব্দ 'বর' থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করা। এহ বরেণ অথবা বরেণ শব্দটি গাথায় প্রায় ছয়বার ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস, উপদেশ এবং ধর্মমত।

বিষয়টি গাথা অহুনাবৈতি য়শনা হা ৩০, অনুচ্ছেদ দুইয়ে রয়েছে। এটি অনুবাদ করলে এই অর্থ দাড়ায় :

'তুমি তোমার কর্ণের দ্বারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ কর এবং আমি যে পরম সত্যের কথা বলছি তা অনুধাবন কর। তুমি তোমার মনের আলোকে এই সত্য দর্শন কর। প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজের জন্য তার বিশ্বাস অবশ্যই স্থির করবে। এর পূর্বে আমরা যে সত্যের সন্ধান দিচ্ছি সে সম্পর্কে প্রতিটি মানুষই অবহিত হোক'।

গাথার এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে জরথুস্ত্র প্রতিটি মানুষকে

১৯. ইন্দো-ইরানীয় সাহিত্যে 'বর্ণে'র অর্থ বুঝতে আমি আমার এই বিষয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিত দস্তুর বোড়ের সাহায্য নিয়েছি।

ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছেন। যে সব শব্দ এতে রয়েছে যেমন, অবরেনাও বৈচিত্যহ্য এর মধ্যে অবরেনাও অর্থ বিশ্বাস এবং বৈচিত্যহ্য অর্থ পার্থক্য করা, বিষয় নির্ধারণ করা'।

গাথা অহুনাবৈতি—য়শনা হা ৩১, অনুচ্ছেদ ১১তে রয়েছে একটি শব্দ আছে —এটি হচ্ছে বরেণ শব্দের বহুবচন এবং এর অর্থ বিশ্বাস। এই অনুচ্ছেদে জরথুস্ত্র মানুষ সৃষ্টির তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। মানুষের সৃষ্টির কথা বলার পর শেষ অর্ধপংক্তিতে জরথুস্ত্র বলেছেন, 'মানুষকে তার ধর্ম বিশ্বাসে স্থির করার স্বাধীনতা দেওয়া হল'।

গাথা উশতাবৈতি—য়শনা হা ৪৫, অণুচ্ছেদ ১য়ে বরেণ-র অনুকরণ করা হয়েছে। এই স্তোত্রের শেষ চরণে জরথুস্ত্র বলেছেন, 'অন্যায় বিশ্বাসের জন্য জিহ্বাতে শয়তান ভর করে'।

গাথা উশথাবৈতি—য়শনা হা ৪৫, অণুচ্ছেদ দুইয়ে বরেণ-র অনুকরণে বলা হয়েছে বিশ্বাস ও ধর্মমতের কথা। এই অনুচ্ছেদে জরথুস্ত্র মানুষের মনের দুটি সত্তা—ভাল ও মন্দের কথা বলেছেন। এই অনুচ্ছেদে মানুষের দুই ধরনের মন ভাল ও মন্দ একে অন্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বলছে, 'চিন্তায়, বাক্যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, কাজে, ধর্ম বিশ্বাসে, সহিষ্ণুতায়, প্রজ্ঞায় এবং আত্মায় আমরা এক নই'।

বরেণঙ্-এর পদ্ধতিতে গাথা পেস্ত মহন্যু—য়শনা হা ৪৮ অনুচ্ছেদ ৪-য়ে যা বলা হয়েছে তার অর্থ বিশ্বাস ও ধর্ম। এই অনুচ্ছেদে জরথুস্ত্র বলেছেন, 'যে মানুষ তার মনকে পবিত্র করবে এবং তার কথা ও কাজের প্রজ্ঞাকে পবিত্র করে সেই মানুষের ইচ্ছাই তার বিশ্বাস ও ধর্ম'।

গাথা পেস্ত মইন্যু য়শনা হা ৪৯, অনুচ্ছেদ তিন বরেণোয় বিভক্তিগত অর্থ বলা হয়েছে, ধর্ম। ঐ একই অনুচ্ছেদে আর একটি শব্দ আছে থেশই এবং এর অর্থ হচ্ছে ধর্ম, বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আইন। এই দুটি শব্দ বরেণোয় এবং থেশই একই অনুচ্ছেদে থাকায় আমাদের যুক্তি আরও দৃঢ় হয়, কারণ থেশ শব্দটির সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে ধর্ম। এটি পাওয়া যাবে যৌগিক শব্দ অহুরকেশ এবং এর অর্থ 'আহুরিয় ধর্ম'। থেশ শব্দটি পহ্‌ল্‌ভি ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় কিশ এবং এর অর্থ ধর্ম। জরথুস্ত্রর স্বাস্থ্য বিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ বেঁদিদাদ আমরা একটি শব্দ পাই। আবেস্তা

ভাষায় লেখা ঐ শব্দটি হচ্ছে অন্যো বরণ এখানে অন্যো অর্থ অন্য এবং বরেণ অর্থ ধর্ম। অর্থাৎ অন্যো বরেণ বলতে বুঝায় অন্য ধর্মমতের মানুষ। এছাড়া বেঁদিদাদ এ অন্যো থেশা শব্দটির অর্থও হচ্ছে অন্য ধর্মের মানুষ।

গাথাতে মুখে মুখে চলে আসছে এমন শব্দও আছে। এগুলি মূল সূত্র থেকে সংগৃহীত। অহুনাবৈতি—যশনা হা ৩১ অনুচ্ছেদ তত্র এগুলি রয়েছে। জরথুস্ট্র ঘোষণা করেন—'যা যবন্তো বিসপেং ভৌরয়, এখানে ভৌরয় এই ক্রিয়াপদের অর্থ আমি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। যশনা হা ২৮, অনুচ্ছেদ ৫-এ ভৌরয়মেদি নামে একটি ক্রিয়াপদ আছে যার অর্থ, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি।

গাথা বহিস্ত তৈশতিস, যশনা হা ৫৩, অনুচ্ছেদ আমরা আর একটি শব্দ দুজ বরেনৌস এর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এটি একটি বহুবচন শব্দ। এর প্রথম অংশ দুজ এর অর্থ হচ্ছে শয়তান বা খারাপ এবং বরেনৈ এর অর্থ বিশ্বাসী। অর্থাৎ এই শব্দের অর্থ হচ্ছে খারাপ ধর্মের লোক অথবা দুষ্ট প্রকৃতির লোক। জরাথুস্ট্র ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছেন যশনা হা এখানে আমরা আর একটি শব্দ ফ্রাবরণ-এর সঙ্গে পরিচিত হই। এর অর্থ আমি আমার বিশ্বাসকে স্বীকার করি। আমার বিশ্বাস হচ্ছে মাজদাযশনো জরথুস্ট্ররিশ এবং আমি জরথুস্ট্রীয় ধর্মমতে বিশ্বাস করি। জরথুস্ট্রীয় প্রার্থনার প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের পদ সমষ্টি রয়েছে। জরথুস্ট্রের স্বীকারোক্তিতে আরও একটি বিষয় আছে। এটি হচ্ছে যশনা ১২, যা বরেণ এখানে যা একটি তুলনামূলক সর্বনাম এবং এর অর্থ হচ্ছে কোনটি এবং বরেণর অর্থ বিশ্বাস বা ধর্মমত। অতএব এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোন্ ধর্মমত। এই যা বরেণ শব্দটি যশনা ১২তে নয়টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস বা ধর্মমত। এখানে আবার বরেণ শব্দটি তাশেষ শব্দের একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর অর্থও ধর্ম।

যশনা ১৬ জরথুস্ট্র বরণমচা ক্ষেমচা যাজখেদে ইসসে জরস্থু তে একটি বেশ মজার জিনিসের উল্লেখ রয়েছে। এখানে জরথুস্ট্রর বরেণ এবং তাশেষ শব্দ দুটিতে অর্ঘ্য নিবেদন করা বুঝায়। এই সমস্ত শব্দ দ্বারা জরথুস্ট্রর ধর্ম ও বিশ্বাসকে সূচিত করে। উপরোক্ত পংক্তির অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় 'আমরা জরথুস্ট্রর বিশ্বাস ও ধর্মমতকে পূজা করি'।

জেন্দ আবেস্তার প্রমাণ অনুযায়ী বর্ণ শব্দের অর্থ একটি শ্রেণী যা একটি ধর্ম বিশ্বাসকে বুঝায় এবং এর সঙ্গে গাত্রবর্ণের কোনও সম্পর্ক নেই। এখন পশ্চিমীতত্ত্বের

বিশ্লেষণ করে যে সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় তা হল এই :

(১) আর্য জাতি বলে কোনও জাতির অস্তিত্ব বেদ জানে না।

(২) আর্যদের ভারত আক্রমণ এবং স্থানীয় অধিবাসী দাস ও দস্যুদের পরাজিত করা এমন কোনও প্রমাণ বেদে নেই।

(৩) আর্য এবং দাস-দস্যুদের মধ্যে জাতিগত প্রভেদ ছিল এমন কোনও প্রমাণ বেদে নেই।

(৪) দাস-দস্যুদের থেকে আর্যদের গাত্রবর্ণ আলাদা ছিল বেদ এই ধারণা সমর্থন করে না।

□ □

অধ্যায় ৫

আর্যদের বিরুদ্ধে আর্য

এক

পশ্চিমী গবেষকগণ আর্য জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে যে সব মতামত তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং এ সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে। আর পশ্চিমী গবেষকদের এই মতবাদ ব্রাহ্মণগণ দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদ সাধারণ মানুষের মনের ওপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে বসে আছে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হোক না তার তেমন কিছু প্রভাব নেই। এই মতবাদকে সর্বজ্ঞানে নষ্ট করা উচিত। সুতরাং এই মতবাদের অন্তসার শূন্যতাকে প্রমাণ করার জন্য এর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন।

যারা আর্য জাতিতত্ত্বের এই মতবাদে বিশ্বাস করেন যে, আর্যরা ভারত আক্রমণ করে দাস-দস্যুদের জয় করে তারা ঋগ্বেদের কয়েকটি স্তোত্রকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। এই স্তোত্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে আর্যরা এসে এদেশ আক্রমণ করে অনার্যদের পরাভূত করেছিল—ঋগ্বেদের ঐসব সূক্তর উল্লেখ ব্যতিরেকে এমন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই অর্থহীন। ঋগ্বেদের ঐ সব সূক্ত যা আমার মনে আছে তা নিচে দেওয়া হল :

(১) ঋগ্বেদ, vi. ৩৩.৩—'হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের উভয় শত্রু দাস এবং আর্যদের সংহার করেছ'।

(২) ঋগ্বেদ, vi. ৬০.৩—'ইন্দ্র এবং অগ্নি, এই দুই শুভ-শক্তি আমাদের আক্রমণকারী দাস ও আর্যদের দমন কর'।

(৩) ঋগ্বেদ, viii. ৮১.১—'ইন্দ্র এবং বরুণ, শূদ্রদের শত্রু দাস ও আর্যদের হত্যা করে তাদের হাত থেকে শূদ্রদের রক্ষা করেছেন'।

(৪) ঋগ্বেদ, viii. ২৪.২৭—'হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের রাক্ষস এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী আর্যদের হাত থেকে রক্ষা করেছ এবং তুমি দাসদের তাদের অস্ত্র থেকে বঞ্চিত কর'।

(৫) ঋগ্বেদ, x. ৩৮.৩—হে ইন্দ্র, তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আমাদের শত্রু এবং অধার্মিকদের দমন করার জন্য তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর এবং তোমার সাহায্যে আমরা তাদের বধ করব'।

(৬) ঋগ্বেদ, x. ৮৬.১৯—'হে ইন্দ্র, যারা তোমার শরণাগত তাদের তুমি শক্তি দাও। তোমার শক্তির সাহায্যে আমরা আমাদের শত্রু আর্য এবং দস্যুদের ধ্বংস করব'।

যদি কেউ এই সূক্তগুলি পাঠ করে এবং স্থির ভাবে চিন্তা করে তাহলে পশ্চিমী মতবাদ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারবে না। ঋগ্বেদের এই সূক্তগুলির রচয়িতারা যদি আর্য হত, তাহলে এই সূক্তগুলির অর্থ এমনই দাঁড়ায় যে, দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্য জাতি ছিল এবং তারা শুধু যে আলাদা ছিল তাই নয় একে অন্যের মধ্যে শত্রুতাও ছিল। দুটি আর্য জাতির অস্তিত্ব শুধু যে ধারণা বা ব্যবস্থাই শুধু নয়। এটি একটি ঘটনা এবং এর সমর্থনে বিস্তর সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।

দুই

প্রথম প্রমাণ হিসাবে যা উপস্থাপিত করা যায়, তা হল বিভিন্ন বেদের পবিত্রতা সম্পর্কে দীর্ঘ দিন ধরে পৃথক ধারণা পোষণ করা হত। বেদের সব ছাত্রেরই জানা আছে, প্রকৃত অর্থে বেদ দুইভাগে বিভক্ত—(১) ঋগ্বেদ এবং (২) অথর্ববেদ। সাম বেদ এবং যজুর্বেদ ঋগ্বেদেরই ভিন্নরূপ। বেদ শাস্ত্রের অধ্যয়নকারী ছাত্রদের আরও জানা আছে যে, দীর্ঘ দিন ধরে ব্রাহ্মণরা অথর্ববেদকে ঋগ্বেদের মতো পবিত্র বলে স্বীকার করেনি। কেন এই ধরনের পার্থক্য করা হল? কেন ঋগ্বেদকে পবিত্র বলে মেনে নেওয়া হল? আর অথর্ববেদকে অমার্জিত বলা হল? এর উত্তর হিসাবে আমি বলতে চাই যে, এই দুই প্রকারের বেদ দুই পৃথক আর্য জাতির ধর্মগ্রন্থ ছিল, এবং একমাত্র যখনই দুই আর্য গোষ্ঠী একত্রিত হয়, তখনই অথর্ববেদকে ঋগ্বেদের সমান সম্মান দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও আরও অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের বিভিন্ন

স্থানে বিক্ষিপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণে এটাই সুস্পষ্ট যে আদর্শগত দিক থেকে, বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে মতবাদে বিভিন্নতা থাকায় দুটি আর্য জাতির অস্তিত্ব ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর একটি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দ্বিতীয়টি সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে।

বেদ দিয়েই শুরু করা যাক। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নিম্নলিখিত আদর্শের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা[১] vi. ৫.৬.১—'অদিতি পুত্রের কামনা করে দেবতা সাধ্যের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য রান্না করে উৎসর্গ করেন। দেবতা অদিতিকে ঐ নৈবেদ্যর কিছু অংশ দান করেন এবং অদিতি তা ভক্ষণ করেন। এর ফলে অদিতির গর্ভসঞ্চার হয় এবং অদিতির গর্ভে চার আদিত্যের জন্ম হয়। অদিতি দ্বিতীয় বারের জন্য নৈবেদ্য রান্না করেন। তাঁর মনে হল নৈবেদ্যর অবশিষ্টাংশ খেয়ে আমার গর্ভে চার পুত্রের জন্ম হয়েছে। এখন আমি যদি নৈবেদ্য ঈশ্বরের নিবেদনের আগেই ভক্ষণ করি তাহলে আমার গর্ভে আরও কৃতী পুত্রের জন্ম হবে। একথা মনে করেই তিনি প্রথমেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করলেন। তার গর্ভসঞ্চার হল এবং তিনি প্রসব করলেন একটি অপুষ্ট ডিম। এর পর অদিতি আবার তৃতীয়বার আদিত্যদের জন্য নৈবেদ্য রান্না করলেন। অদিতি মনে করলেন তার এই ধর্মীয় শ্রম তার আনন্দ দেওয়ার কাজে লেগেছে। অদিত্যরা বললেন আমরা একটি বর বেছে নেব। এর থেকে যার জন্ম হবে সে একমাত্র আমাদেরই আনন্দ বিধানের জন্য হক। এর ফলশ্রুতি হিসাবে আদিত্য বৈবস্বত জন্ম নিলেন। ইনি হলেন আদিত্যের বংশধর তথা মানুষ। এই মানুষের মধ্যে যে নিজেকে উৎসর্গ করে সেই কৃতী হয় এবং সেইই ঈশ্বরের কাছে আনন্দের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

এখন ব্রাহ্মণদের দিকে নজর দেওয়া যাক। তাদের সৃষ্টির কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ রয়েছে। বিষয়টি নিচে দেওয়া হল : শতপথ ব্রাহ্মণ,[২] i. ৮.১.১

(১) প্রত্যুষে তারা মনুর প্রক্ষালনের জন্য জল নিয়ে এলো, যেমন মানুষ হাতে করে মুখ প্রক্ষালনের জন্য জল নিয়ে আসে। মনু যখন সেই জল দিয়ে হাত-মুখ ধৌত করছিলেন, একটি মাছ তাঁর হাতে এল। মাছটি মনুকে বলল, 'আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনাকে রক্ষা করব'। মনু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমাকে কীভাবে রক্ষা করবে'? মাছটি তখন উত্তরে জানাল, 'একদিন বন্যা এসে সব জীবজন্তু

১. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২৬
২. তদেব পৃ : ১৮১-১৮৪

ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং সেই বন্যার গ্রাস থেকে আমি আপনাকে রক্ষা করব'। মনু আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কি উপায়ে তুমি আমাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করবে'? মাছ বলল, 'যতক্ষণ আমরা ছোট থাকি ততক্ষণ আমাদের বড় বিপদ, কারণ বড় মাছ ছোট মাছদের খেয়ে ফেলে। আপনি প্রথমে আমাকে একটি পাত্রে রাখুন। যখন ঐ পাত্রে আমাকে আর ধরবে না তখন আপনি আমাকে একটি গর্ত খনন করে তাতে রাখুন। তারপর যখন ঐ গর্তেও আর আমাকে ধরবে না, তখন আপনি আমাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিন। তখন আমি বিপন্মুক্ত হব। এইভাবে সেই ক্ষুদ্র মাছটি একদিন অতি বৃহৎ আকারে পরিণত হবে, কারণ সীমাহীন সমুদ্রে তার বৃদ্ধির সুযোগ আছে। এরপর একদিন বন্যা আসবে এবং বন্যার জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনি জাহাজ ভাসিয়ে দেবেন এবং আমি আপনাকে সেই বন্যা থেকে রক্ষা করব। মাছটিকে এইভাবে রক্ষা করে সেটি বড় হলে মনু একদিন তাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন। এরপর যে বছর মনু মাছটিকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন, সেই বছরই তিনি একটি জাহাজ নির্মাণ করলেন। তারপর যখন বন্যা এল মনু সেই জাহাজে উঠলেন। তিনি জাহাজের রজ্জু ঐ মাছটির শিং-এর সঙ্গে বেঁধে দিলেন। এইভাবে তিনি উত্তরের পাহাড় অতিক্রম করলেন। তখন মাছটি বলল আমি আপনাকে রক্ষা করেছি। এবার আপনি জাহাজের রজ্জু একটি বৃক্ষের সঙ্গে বাঁধুন। কিন্তু আপনি পর্বতের ওপর অবস্থান করার সময় পাছে স্রোতের বেগে আপনার জাহাজের রজ্জু কেটে না যায় সেজন্য আপনি জল নেমে গেলে তবেই ঐ পর্বত থেকে অবতরণ করবেন। মাছের পরামর্শ অনুযায়ী মনু বন্যার জল নেমে গেলে পর্বত থেকে অবতরণ করলেন। উত্তর পর্বত থেকে মনুর এইভাবে অবতরণ হল। জীবজন্তু সবই বন্যার জলে ভেসে গেছে এবং মনু তখন একা নিঃসঙ্গ। সন্তানের আশায় মনু তখন উপাসনা ও ধর্মাচারণের মধ্যে কঠোর জীবনযাপন শুরু করলেন। তিনি মাখন, দুগ্ধ, ঘোল, দধি প্রভৃতি দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে তা জলে উৎসর্গ করলেন। তা থেকে এক বছরের মধ্যে একটি নারী সৃষ্টি হল। তৈলাক্ত দেহে সেই নারী আবির্ভূতা হল। তার প্রতি পদক্ষেপে মাখন গড়িয়ে পড়তে লাগল। মিত্র এবং বরুণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে'? মনুর ঐ কন্যা উত্তর দিলেন, 'বলুন আপনি আমাদের কিনা'। তাঁরা একযোগে উত্তর দিলেন। কিন্তু কন্যা বললেন, আমি তার যে আমাকে সন্তান উপহার দেবে। মিত্র এবং বরুণ দুইজনেই একত্রে তাকে কামনা করলেন। ঐ কন্যা তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন আবার দিলেন না এবং সামনে এগিয়ে গেলেন। ঐ কন্যা মনুর কাছে এলেন। মনু তাকে জিজ্ঞাসা

করলেন, তুমি কে? কন্যা বললেন, আমি আপনার দুহিতা। মনু তখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন, তুমি আমার কন্যা! তুমি এত উজ্জ্বল সুন্দর? কন্যা বললেন, আপনিই আমাকে জন্ম দিয়েছেন। যে মাখন, দুগ্ধ ও দধির নৈবেদ্য আপনি জলে উৎসর্গ করেছেন, আমি তার থেকে জাত। আমি ধ্বংসকারী সর্বনাশ। আপনি আমাকে যজ্ঞে উৎসর্গ করুন। আপনি যদি আমাকে যজ্ঞে উৎসর্গ করেন তাহলে আপনার প্রচুর সন্তান এবং গাভী হবে। আপনি আমার কাছ থেকে যা চাইবেন তাই পাবেন। সেই অনুযায়ী মনু তাকে যজ্ঞের মধ্যস্থলে স্থাপন করলেন। যা প্রথম এবং শেষের মধ্যস্থলে থাকে। তাকে সামনে রেখে তিনি আবার কঠোর ধর্মাচারণ এবং উপাসনা শুরু করলেন। সন্তানের আশায় তিনি এসব করলেন। তার সাহায্যে মনু সন্তান লাভ করলেন এবং সেই সন্তান হল ইদা। মনু তাঁর কাছ থেকে যা চেয়েছিলেন তা তিনি স্বেচ্ছায় দান করলেন। যাঁরা একথা জানার পর ইড়ার সঙ্গে বসবাস করলেন তাঁরাই মনুর মতো সন্তান লাভ করলেন। তার কাছ থেকে তাঁরা যা চাইলেন, তা তিনি তাদের স্বেচ্ছায় দিলেন'।

(২) শতপথ ব্রাহ্মণ,[৩] ছয়, ১.২.১১—'বলা হয়েছে, প্রজাপতির ঐ জগৎ সৃষ্টি করার জন্য পৃথিবীর ওপর নির্ভর করতে হল। প্রজাপতির জন্য খাদ্য হিসাবে ভেষজ রান্না করা হল। তিনি তা খাওয়ার পর গর্ভবতী হলেন। তিনি তার ওপরের অংশ থেকে দেবতাদের সৃষ্টি করলেন এবং নিচের অংশ থেকে মরণশীল জীব সৃষ্টি করলেন। তিনি যেভাবেই পারলেন সৃষ্টি করলেন। কিন্তু প্রজাপতি যা কিছু সৃষ্টি করলেন, তার সব কিছুরই অস্তিত্ব ছিল'।

(৩) শতপথ ব্রাহ্মণ[৪] vii. ৫.২.৬—'প্রজাপতি প্রথমে দিলেন মাত্র এক। তিনি ইচ্ছা করলেন, খাদ্য তৈরি হোক এবং বংশ বিস্তার হক সেই সঙ্গে। প্রজাপতি তাঁর নিঃশ্বাস থেকে পশু উৎপাদন করলেন। মানুষ সৃষ্টি করলেন তাঁর আত্মা থেকে, চক্ষু থেকে অশ্ব, নিঃশ্বাস থেকে ষাঁড়, কান থেকে মেষ এবং কণ্ঠস্বর থেকে ছাগল সৃষ্টি করলেন। প্রজাপতি যেহেতু তাঁর নিঃশ্বাস থেকে পশু উৎপন্ন করেছেন, সেইজন্য মানুষ বলল, প্রজাপতির নিঃশ্বাসই হল পশু। আত্মাই হল প্রজাপতির প্রথম নিঃশ্বাস। যেহেতু তিনি তাঁর আত্মা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেইহেতু তারা বলল, মানুষই হল তার সৃষ্টির প্রথম প্রাণী এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। আত্মাই সব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস

---

৩. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩০
৪. তদেব, পৃ : ২৪

এবং সব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই আত্মার ওপর নির্ভরশীল। প্রজাপতি যেহেতু তাঁর আত্মা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তারা বলল, মানুষ সব পশু, কারণ তাদের আত্মা মানুষের'।

(৪) শতপথ ব্রাহ্মণ[৫], x. ১.৩.১—'প্রজাপতি জীব সৃষ্টি করলেন। তার ওপরের অংশ থেকে তিনি দেবতাদের সৃষ্টি করলেন, আর নিচু অংশের থেকে সৃষ্টি করলেন মরণশীল জীবদের। পরে তিনি সৃষ্টি করলেন মৃত্যু, এবং মৃত্যুর আহার হল মানুষ'।

(৫) শতপথ ব্রাহ্মণ[৬], xiv. ৪.২.১—'প্রথমে এই বিশ্ব ছিল শুধু আত্মা। সেই আত্মা পুরুষরূপে বিরাজ করত। পুরুষ প্রথমে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। কিন্তু নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি প্রথমে বললেন, এই হল আমি। এরপর তিনি আমিত্বের নামে এক হলেন। এখন একজন মানুষকে ঐ নামে ডাকলে প্রথমেই বলে, এই আমি, এবং তারপর সে ঘোষণা করে তার অন্য নাম। এর আগে সে যতটা পারে তার পূর্বের পাপ সবই ধুয়ে ফেলে এবং সেই ইচ্ছে পুরুষ। পুরুষই জানে তার পাপ মুছে ফেলার কথা এবং সেই তার পূর্বে থাকতে চায়। এতে সে ভীত হয়। এইভাবে মানুষ যখন একাকী তখন সে ভীত হয়। এই বিষয় বিবেচনার পর আমিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই থাকতে পারে না। আমিত্ব প্রশ্ন করে কেন আমি ভীত? এতে তার ভয় দূর হয়। কেন সে ভীত হয়েছিল? দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষ ভীত হয়। সে তার সুখ ভোগ করতে পারে না। মানুষের একাকিত্ব তাকে সুখী করতে পারে না। সে দ্বিতীয় একজন চায়। সে একজন মানুষ এবং মানবী এবং এই অবস্থায় তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ। সে তার আমিত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। এর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর সৃষ্টি। যাজ্ঞবল্ক বলেছেন, এই একজনের আত্মা যেন একটি ভাঙা মটর দানার অর্ধাংশ। সুতরাং শূন্যতা পূরণ হয় নারীর দ্বারা। সে তার সঙ্গে সহবাস করে এবং এর থেকে মানুষের জন্ম হয়। নারী এটাই প্রতিফলিত করে, কেমন করে পুরুষ ঐ নারীকে সৃষ্টি করার পর কীভাবে তার সঙ্গে সহবাস করে? এতে রুষ্ট হয়ে সে অন্তর্হিত হয়। সে একটি গাভী হয়ে যায় এবং অন্যটি হয় ষাঁড় এবং ঐ ষাঁড় গাভীটির সঙ্গে মিলিত হয়। তাদের থেকে সৃষ্টি হয় অনেক গাভী। তারপর সৃষ্টি হল ঘোটকী এবং প্রজননের ঘোটক এবং গাধী ও গাধা। পুরুষ ও তার সঙ্গে সহবাসের ফলে সৃষ্টি হল খুর বিভক্ত নয়

৫. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩১

৬. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২৫

এমন সব প্রাণী। ছাগী, ছাগ এবং ভেড়ী-ভেড়াদেরও জন্ম হল। তিনি তার সঙ্গে সহবাস করলেন। সৃষ্টি হল ছাগল ও ভেড়া। এইভাবে একেবারে পিপীলিকা পর্যন্ত সব শ্রেণীর এক এক করে জোড়া সৃষ্টি হল।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নিম্নলিখিত বিষয় পাওয়া যায় :

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ[৭], ii. ২.৯.১—'প্রথমে এই ব্রহ্মাণ্ড বলতে কিছুই ছিল না। আকাশ, পৃথিবী, বায়ু কিছুই ছিল না। কোনও কিছুরই অস্তিত্ব না থাকায়, আমিত্ব প্রকাশের সংকল্প হল। এবং এই প্রকাশের তীব্রতা বাড়তে লাগল। সেই ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি হল ধূম্র। এরপর প্রকাশের ইচ্ছা আরও জোরদার হল। তার থেকে সৃষ্টি হল অগ্নি। এরপরেও প্রকাশের ইচ্ছা জোরদার হল এবং সেই থেকে সৃষ্টি হল আলো। এখানেই প্রকাশের ইচ্ছা শেষ হল না এবং আলো থেকে সৃষ্টি হল শিখা। নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা এইভাবেই চলতে থাকল এবং শিখা থেকে সৃষ্টি হল রশ্মি এবং পর পর সেই রশ্মি থেকে সৃষ্টি হল দাবানল এবং তার থেকে ঘন মেঘের এবং সেই মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সৃষ্টি হল সমুদ্রের। এরজন্যই মানুষ সমুদ্রের জল পান করে না, কারণ সমুদ্রকে মানুষ তার সৃষ্টির স্থল বলে শ্রদ্ধা করে। এই জন্যই কোনও প্রাণীর জন্মের পূর্বে জল নির্গত হয়। এরপরই সৃষ্টি হয় দশহোত্রীর। প্রজাপতিই হলেন দশহোত্রী। মানুষের মধ্যেই প্রজাপতির কঠোর সংযম আবর্তিত হল। প্রজাপতি উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করলেন, এবং তা থেকে সৃষ্টি হল জল এবং তরল পদার্থের। প্রজাপতি ভাবলেন কেন আমার জন্ম হয়েছে, আর আমার যদি জন্ম হয়েই থাকে তাহলে তার আকার কি? এর কোনও উত্তর নেই। প্রজাপতির কান্না সমুদ্রে পড়ল এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হল। তার চোখের জলের কিছুটা অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং তা থেকে বাতাসের সৃষ্টি হল। এর কিছুটা ওপরে গিয়ে আকাশের সৃষ্টি হল। যে পরিস্থিতিতে প্রজাপতি রোদন করলেন সেই অনুযায়ী ঐ দুটির নামকরণ হল। সেখানে কোনও ক্রন্দন নেই এইভাবে ঐ দুই জগতের সৃষ্টি হল। যারা এই সৃষ্টির রহস্য জানে তাদের কাছে পার্থিব কোনও দুঃখ নেই। সে পৃথিবীকে একটি ভিত্তি বলে জানে। পৃথিবীকে এই ভিত্তি হিসাবে পাওয়ার পর তার ইচ্ছা হল আমি বংশ বিস্তার করব। এই উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর তপস্যা করলেন। এর ফলে তিনি গর্ভবতী হলেন। তিনি তাঁর শরীরের নিচের অংশ দ্বারা অসুর সৃষ্টি করলেন।

৭. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২৮-২৯
৬. তদেব, পৃ : ২৮-২৯

অসুরদের তিনি মাটির পাত্রে দুধ খেতে দিলেন এবং সারা শরীর ঢেকে দিলেন এবং তা কালো বর্ণ ধারণ করল। এরপর তাঁর আবার বংশ বিস্তারের ইচ্ছা হল। এই উদ্দেশ্যে তিনি আবার কঠোর তপস্যা করলেন এবং তাঁর গর্ভ সঞ্চার হল। তিনি তাঁর শরীরের অংশ থেকে প্রজা সৃষ্টি করলেন। এরাই হল সংখ্যায় বেশি, কারণ প্রজাপতি তার সৃষ্টিশীল অঙ্গ থেকে তাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের কাঠের পাত্রে দুধ খেতে দিলেন। এরপর তিনি তাঁর সারা শরীর ঢেকে দিলেন এবং তা থেকে চন্দ্র রশ্মি নির্গত হল। তিনি আবার বংশ বিস্তারের সংকল্প করে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর আবার গর্ভ সঞ্চার হল। তিনি তাঁর বগল থেকে ঋতু সৃষ্টি করলেন। তাদের তিনি রুপোর পাত্রে দুধ খেতে দিলেন। তিনি তখন তাদের সারা শরীর ঢেকে দিলেন। এতে দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তী সময় সৃষ্টি হল। প্রজাপতির আবার বংশ বিস্তারের ইচ্ছা হল। কঠোর তপস্যার ফলে তাঁর আবার গর্ভ সঞ্চার হল। তিনি তাঁর মুখ থেকে দেবতাদের সৃষ্টি করলেন। তিনি তাদের সোনার পাত্রে সোমরস পান করতে দিলেন। তিনি তার শরীর ঢেকে দিলেন। এতে দিনের সৃষ্টি হল। এই হল প্রজাপতির দুগ্ধদোহন। এই জন্যই শিশুদের দুধ খেতে দেওয়া হয়। দিনের সৃষ্টি হল। এই ধরনের প্রকাশ দেবতাদের দুর্লভ বলে সূচিত করে। এই দুর্লভ ব্যাপারটি দেবতাদের দেবত্ব দান করে। এইভাবে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি হয়। যারা দিন রাত্রির সৃষ্টির কথা জানে তারা দিন ও রাত্রির কোনও দুঃখবোধ করে না। অস্তিত্বহীন থেকে মানুষের মন বা আত্মার সৃষ্টি হয়। মন থেকে প্রজাপতির সৃষ্টি এবং প্রজাপতি থেকে বংশ বিস্তার হয়। এইসব বিষয়ের যতই অস্তিত্ব থাক, তা আছে সম্পূর্ণ মনের মধ্যে। ব্রহ্মা একে বলেছেন স্ববৎস। যে সব মানুষ এই বিষয় জানে তাদের কাছে ঊষার আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকে। তার বহু সন্তান সন্ততি হয় এবং বহু গো-সম্পদের মালিক হয়। সে তখন পরমৌষ্টি এর মর্যাদা পায়।

(৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ[৮], ii. ৩.৮.১. প্রজাপতি ইচ্ছা করলেন তিনি বংশ বিস্তার করবেন। তিনি কঠোর তপস্যা করলেন। তার গর্ভ সঞ্চার হল। তিনি পীত-বাদামী বর্ণ ধারণ করলেন। এইজন্য কোনও নারী গর্ভবতী হলে সে পীত থেকে বাদামী বর্ণ ধারণ করে। প্রজাপতির গর্ভ সঞ্চার হল ভ্রূণের দ্বারা এবং এতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তার দেহ কালচে-বাদামী রংয়ের হয়ে উঠল। এই জন্যই একজন পরিশ্রান্ত লোককে কালচে-বাদামী রংয়ের দেখায়। প্রজাপতির শ্বাস-প্রশ্বাস জীবন্ত

৮. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২৩

হয়ে উঠল। তা থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন অসুরদের। এদের মধ্যে অসুর প্রবৃত্তি রয়ে গেল। যারা অসুরদের এই অসুর প্রবৃত্তি সম্পর্কে অবহিত তারা মানুষ। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, শ্বাস-প্রশ্বাস তাকে পরিত্যাগ করেনি। অসুরদের সৃষ্টি করার পর প্রজাপতি নিজেকে পিতা বলে মনে করলেন। এরপর তিনি পিতাদের সৃষ্টি করলেন। এতে পিতাদের পিতৃত্ব তৈরি হল, যে ব্যক্তি পিতার পিতৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত সে নিজেই পিতা হয়ে যায়। পিতারা নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন। পিতাদের সৃষ্টি করার পর তিনি প্রতিফলিত হলেন। এরপর তিনি মনুর সৃষ্টি করলেন। এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের মনুষ্যত্ব। যে ব্যক্তি মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে জানে তিনি বুদ্ধিমান। মন তাকে পরিত্যাগ করে না। তার মতে যখন মানুষ সৃষ্টি করছিলেন, স্বর্গে তখন দিনের আবির্ভাব হল। এরপর তিনি দেবতাদের সৃষ্টি করলেন। এতেই আছে দেবতাদের দেবত্ব। তার মতে যে ব্যক্তি দেবতাদের দেবত্ব সম্পর্কে ধারণা আছে সেখানে স্বর্গে দিনের আবির্ভাব হয়। এর চারটে ধারা আছে। এগুলি হল দেবতা, মানুষ, পিতা ও অসুর। এর সর্বক্ষেত্রে জল বাতাসের মত।

(৪) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ[৯], iii.—২.৩.৯—

'অস্তিত্ব-হীনতা থেকে শূদ্রদের উৎপত্তি'।

সৃষ্টির উৎপত্তি সম্পর্কে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক[১০] i. ১২.৩.১—'এই হল দিগন্ত জলরাশি। সর্বত্র তরল জলরাশিতে পূর্ণ। এই জলের মধ্যে একটি পদ্মপাতার ওপর প্রজাপতি একা সৃষ্টি হলেন। তার মনে ইচ্ছা জাগ্রত হল, 'আমাকে সৃষ্টি করতে হবে'। এজন্যই মানুষ মনে মনে যা স্থির করে সে কথায় তা প্রকাশ করে এবং কাজের দ্বারা তা সম্পন্ন করে। এরজন্যই এই শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে, 'মনের ইচ্ছা জেগে ওঠে, এটাই মনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এবং মুনি ঋষিরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে যা অনুসন্ধান করেন অন্তরের মধ্যেই সেই উপলব্ধি পেয়ে যান এবং এটাই অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বহীনতার মধ্যে যোগসূত্র (ঋগ্বেদ x. ১২৯.৪) তার এই ইচ্ছার কথা যে ব্যক্তি জানে তা তার মধ্যে সংক্রামিত হল। তিনি কঠোর তপস্যা করলেন। তপস্যার শেষে তিনি তাঁর শরীরে ঝাঁকুনি দিলেন। তাঁর মাংস থেকে ঋষি অরুণ, কেতু এবং

৯. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২১
১০. তদেব, পৃ : ৩২

বাতারসনদের জন্ম হল। তাঁর নখ থেকে উৎপন্ন বৈখানস এবং চুল থেকে বালখিল্যদের সৃষ্টি হল। তার দেহের তরল অংশ একটি কচ্ছপের রূপ পেল এবং জলের মধ্যে সেটি বিচরণ করতে লাগল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি আমার চর্ম ও মাংস থেকে উৎপন্ন হয়েছ'। কচ্ছপটি নেতিবাচক উত্তর দিল। সে বলল, 'আমি পূর্বেই এখানে ছিলাম'। এতে মানুষের মানবত্ব প্রাপ্তি বুঝায়। পুরুষ সহস্র মাথা, সহস্র চক্ষু এবং সহস্র পা নিয়ে মানুষের আকারে উঠে দাঁড়ালেন। প্রজাপতি তাঁকে বললেন, 'আমার পূর্বেই তোমার সৃষ্টি এবং তুমি প্রথম সৃষ্টি কর। পুরুষ তখন তার দুই হস্তের মধ্যে জল ধারণ করে পূর্ব দিকে স্থাপন করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, 'হে সূর্যদেব—এটি হক'। এর থেকে সূর্যের উদয় হল। এই হচ্ছে পূর্ব অংশ। এরপর অরুণ কেতু দক্ষিণ দিকে জল স্থাপন করে বললেন, 'হে অগ্নি, তাই হক'। এর থেকে অগ্নি উত্থিত হলেন। এই হচ্ছে দক্ষিণ অংশ। তারপর অরুণ কেতু জল পশ্চিম দিকে স্থাপন করে বললেন, 'ওহ বায়ু, তাই হক'। এর থেকে বায়ু উত্থিত হলেন। এই হল পশ্চিম ভাগ। এরপর অরুণ কেতু উত্তর দিকে জল স্থাপন করে বললেন, 'হে ইন্দ্র! তাই হক'। এর থেকে উত্থিত হলেন ইন্দ্র। এই হচ্ছে উত্তর ভাগ। তারপর আবার অরুণ কেতু জল মধ্যভাগে স্থাপন করে বললেন, 'হে পুরুষ, তাই হক'। এর থেকে পুরুষ উত্থিত হলেন। এই হচ্ছে মধ্যভাগ। এরপর অরুণ কেতু জল উপরিভাগে স্থাপন করে বললেন, 'হে দেবতা তাই হক'। তার থেকে উঠে এলেন দেবতা, মানুষ, পিতা, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ এই হচ্ছে উপরিভাগ। তার ফোটা ফোটা জল পড়ে সৃষ্টি হল অসুর, রাক্ষস ও পিশাচগণ। জলের কিছু থেকে সৃষ্টি হওয়ার জন্য তারা ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং এই মন্ত্র উচ্চারিত হল; যখন বিরাট জলরাশির গর্ভ সঞ্চার হল তার মধ্যে ছিল প্রজ্ঞা এবং তা থেকে উদ্ভব হল স্বয়ম্ভুর এবং তা থেকে জীবগণের। এ সবই জল থেকে জাত। সুতরাং; এসবই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা। এজন্য এসবই ছিল অসংলগ্ন এবং ঢিলেঢালা। প্রজাপতি ছিলেন তদ্রূপই। নিজের থেকেই নিজেকে সৃষ্টি করে তিনি তাতেই প্রবিষ্ট হলেন। সেখানে এই শ্লোকটির আবৃত্তি করা হয়েছে, 'এই পৃথিবী সৃষ্টি করে, যার অস্তিত্ব ছিল তা গঠন করে এবং তার মধ্যবর্তী অংশকে সংযোগ করে প্রজাপতি প্রথমে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে নিজের মধ্যেই প্রবিষ্ট করলেন'।

চার

সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে মহাভারতের নিজস্ব মতবাদ আছে। মহাভারতে মনুর সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা আছে। মহাভারতের বনপর্বে[১১] বলা হয়েছে :

'মনু নামে এক মহান ঋষি ছিলেন। মনু ছিলেন বিবস্বতের পুত্র। খ্যাতির ঔজ্জ্বল্যে তিনি ছিলেন প্রজাপতির সমতুল। শক্তিতে, তেজে, কঠোর তপস্যায় মনু তাঁর পিতা বিবস্বান এবং পিতামহ্ কশ্যপকে অতিক্রম করে যান। মনু ছিলেন সূর্যের বরপুত্র। মনু রাজা হয়ে তপস্যার জন্য বদরিকা আশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে একপায়ে থেকে ভয়ঙ্কর ও অতি সাংঘাতিক তপস্যা শুরু করলেন। কখনও তিনি অধঃমস্তক হয়ে বা কখনও নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থেকে দশ সহস্র বৎসর পর্যন্ত ভয়ঙ্কর তপস্যা করেছিলেন। এই তপস্যার সময়ে তার পরিধেয় ছিন্ন হয়ে যায় এবং চুলে জট নামে এবং এমন সময়ে যখন তিনি চীরিনী নামে এক নদীর তীরে কঠোর তপস্যায় রত, তখন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য মনুর কাছে এসে বলে উঠল, ভগবান, আমি একটি ক্ষুদ্র মৎস্য, বড় মাছরা আমাকে খেয়ে ফেলবে, আপনি আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন। বড় মাছদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোনও উপায় নেই। আপনি আমাকে বিপদে রক্ষা করুন। আমি আপনাকে আপনার বিপদে রক্ষা করব। মনু ঐ ক্ষুদ্র মাছের একথা শুনে দয়াপরবেশ হয়ে তাকে গ্রহণ করলেন এবং চন্দ্র কিরণের মত ঐ উজ্জ্বল মাছটিকে একটি জালার জলের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। মাছটি সেই জালার ভিতরে অত্যন্ত আদরে বড় হতে লাগল এবং মনুও তাকে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলেন। দীর্ঘদিন পরে ঐ মাছটি ধীরে ধীরে অতি বৃহৎ হয়ে উঠল এবং তার দেহ আর জালার মধ্যে ধরল না। মাছটি তখন আবার মনুকে ডেকে বলল, 'আপনি আমাকে বাড়বার জন্য আরও বড় জায়গায় নিয়ে যান, কারণ আমার এই শরীরের পক্ষে এই জালাটি এখন বড়ই ক্ষুদ্র'। মনু একথা শোনার পর মাছটিকে একটি বড় দিঘিতে ছেড়ে দিলেন। সেখানে মাছটি বহু বছর ধরে বেড়ে উঠতে লাগল। সেই দিঘিটা ছিল দুই যোজন দীর্ঘ এবং এক যোজন বিস্তৃত। কিন্তু তবুও মাছটির বিশাল আকৃতি তাতে ধরল না। মাছটি পুনরায় মনুকে ডেকে বলল, মহাশয় আপনি আমাকে সমুদ্রের প্রিয় মহিষী গঙ্গায় ছেড়ে দিন, অথবা আপনার বিবেচনায় অন্য কোথাও আমাকে নিয়ে যান, কারণ যত বড়ই হই না কেন আমি আপনার কর্তৃত্বে

১১. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১৯৯-২০১

রয়েছি। এইকথা শুনে মনু মাছটিকে গঙ্গায় ছেড়ে দিলেন। মাছটি তখন গঙ্গাতেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। আস্তে আস্তে সে এত বড় হয়ে গেল যে গঙ্গাতেও তার আর থাকা সম্ভব ছিল না। তখন সে আবার মনুকে বলতে লাগল, 'আমি এত বড় হয়ে গেছি যে গঙ্গাতেও থাকতে পারছি না। সুতরাং দয়া করে আমাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিন'। মাছের কথা শুনে তিনি তাকে গঙ্গা থেকে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন। মাছটি যতই বড় হক না কেন মনুর তাকে বহন করতে কোনও কষ্ট হল না। মাছটির দেহে সুন্দর গন্ধ ছিল এবং মনু তাকে সহজেই আনন্দের সঙ্গে বহন করতে পারলেন। মনু মাছটিকে সমুদ্র ছেড়ে দেওয়ার পর মাছটি মনুকে বলল, 'ভগবান, আপনি সর্বদা আমাকে অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেছেন, এখন আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন আপনি কি করবেন। পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুই আর কিছুকালের মধ্যে জলমগ্ন হবে। এর মাধ্যমে জগতের পবিত্রতা রক্ষিত হবে এবং সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। আপনার এখন কি করণীয় তা আমি বলছি। কীসে আপনার মঙ্গল হবে তা আপনি শ্রবণ করুন। সেই ভয়ঙ্কর প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পেতে আপনি একটি শক্তপোক্ত জাহাজ তৈরি করুন। ঐ জাহাজে যেন একটি শক্ত কাছি থাকে। আপনি বন্যা এলে সপ্তর্ষিদের সঙ্গে নিয়ে ঐ জাহাজে আরোহণ করুন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনাকে সে সব বীজের কথা বলেছেন সেইসব বীজ আগেভাগে সুরক্ষিত করে জাহাজে তুলবেন। আপনি জাহাজে আরোহণ করে আমার খোঁজ করবেন। আপনার যাতে চিনতে অসুবিধা না হয় সেজন্য আমি শৃঙ্গ ধারণ করে আপনার সামনে আসব। আপনি অবশ্যই আমার কথামত কাজ করবেন, কারণ সেই বিশাল প্লাবন আমি ছাড়া আপনি অতিক্রম করতে পারবেন না। আপনি আমার কথার অবিশ্বাস করবেন না'। এই বলে মাছটি মনুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। মনু তাকে বললেন, 'আমি আপনার কথামতই কাজ করব'। এই বলে মনুও মাছটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মনু তখন একটি সুন্দর পাল তোলা জাহাজ নির্মাণ করলেন এবং বিভিন্ন ধরনের বীজ সংগ্রহ করে তাতে রাখলেন। তারপর তিনি সমুদ্রের তীরে গিয়ে মাছটিকে আহ্বান জানালেন। মাছটি তাঁর ইচ্ছার কথা জেনে প্রচণ্ড গতিতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মনু তাঁর শৃঙ্গ দেখে তাকে চিনতে পারলেন। মনু দেখলেন মাছটির শৃঙ্গ পর্বতের সমান উঁচু এবং তিনি তার জাহাজের কাছি মাছের ঐ শৃঙ্গের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। শিংয়ের সঙ্গে ঐ কাছি বাঁধা হলে মাছটি অতি দ্রুতগতিতে জাহাজটিকে টেনে নিয়ে চললেন এবং উত্তাল সমুদ্রের জলরাশি পার করে নিয়ে চললেন। প্রচণ্ড তার ঢেউ, মেঘগর্জন ও বজ্রের

মধ্যে মহাসমুদ্রের মাঝে জাহাজটি দুলতে লাগল। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সেই সমুদ্রে জাহাজটি একটি কম্পমান পাগলিনী নারীর মত দোল খেতে থাকল। পৃথিবীর কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। চারিদিকে দিগন্ত জলরাশি, উত্তাল বাতাস এবং অনন্ত আকাশ। এইভাবে শোচনীয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সপ্তঋষি, মনু এবং মাছ সেই বিস্তৃত প্লাবনের জলে অবস্থান করতে লাগলেন। এইভাবে দীর্ঘ বছর চলতে চলতে মাছ পরিশেষে জাহাজটি হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে নিয়ে এলেন। মাছটি তখন মৃদু হেসে ঋষিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আর সময় নষ্ট না করে কাছি দিয়ে জাহাজটিকে ঐ শৃঙ্গের সঙ্গে বেঁধে ফেলুন'। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তাই করলেন। হিমালয়ের সেই উচ্চতম চূড়া আজও নৌবন্ধন নামে পরিচিত। বন্ধু মাছটি এরপর ঋষিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমিই প্রজাপতি ব্রহ্ম এবং আমার থেকে বেশি আর কেউ নেই। মৎস্যরূপে আমি আপনাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলাম। এখন জাহাজে রাখা বীজ থেকে মনু দেবতা, মানুষ, অসুর, সমস্ত লোক এবং সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু সৃষ্টি করবেন। আমার অনুগ্রহে এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা তিনি পবিত্র অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে সৃষ্টিশীল হতে পারবেন। এবং কখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করবেন না'। এই সব কথা বলে মাছটি সেই বিপুল জলরাশির মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এরপর মনু প্লাবনের পর সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে আবার নতুন করে জীবজগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই কাজে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এবং কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যায় ফললাভ করে মনু আবার নতুন জগৎ সৃষ্টি করলেন'।

মহাভারতের আদিপর্বে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা অন্য ধরনের মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে[১২] :

'বৈশম্পায়ন বললেন, 'স্বয়ম্ভুকে অভিবাদন জানানোর পর আমি আপনার কাছে বর্ণনা করব দেবতা ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি ও ধ্বংস কীভাবে হয়। ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয়জন মহান ঋষি—মারীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু। মারীচির পুত্র কশ্যপ এবং কশ্যপ থেকে এইসব জীব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষ প্রজাপতির ১৩টি কন্যা ছিল—এঁরা হলেন—অদিতি, দিতি, দনু, কলা, দনয়ু, সিমুক, ক্রোধ, প্রধা, বিশ্ব, বিনতা, কপিলা, মুনি এবং কদ্রু। এই কন্যাদের অসংখ্য বীর পুত্র এবং দৌহিত্র ছিল।

ব্রহ্মার দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের জন্ম। দক্ষ ছিলেন একজন মহান ঋষি,

১২. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১২২-১২৬

তাঁর তেজ ছিল অসাধারণ এবং তপস্যার দ্বারা তিনি বিরাট শক্তি অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্মার বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্ম হয় এক কন্যার। তিনি হন দক্ষর স্ত্রী। তাঁদের ৫০টি কন্যার জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে দশজনের বিবাহ দেন তিনি ধর্মের সঙ্গে, ২৭ জন ইন্দুর (সোম) সঙ্গে এবং বাকি ১৩ কন্যাকে তিনি কাশ্যপের হাতে সমর্পণ করেন। এটাই ছিল স্বর্গীয় রীতি। পিতামহ ব্রহ্মার অধস্তন পুরুষ হলেন মনু। মনু হল কাশ্যপের পুত্র। তিনি জীব জগতের সৃষ্টিকর্তা। অষ্ঠাবনুরা তার পুত্র ছিলেন। অষ্ঠাবনুর কথা আমি বিশদভাবে বলব। ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ করে মনুষ্যরূপে ধর্মের আবির্ভাব হয়। তিনি সব মানুষের মধ্যে সুখ সঞ্চার করেন। তার তিন বিখ্যাত পুত্র ছিলেন। এঁরা হলেন, শাম, কাম এবং হর্ষ (শান্তি, প্রেম এবং আনন্দ)। এঁরা সব জীবের আনন্দের উৎস এবং পৃথিবীকে তাঁরা ধরে রাখেন। মনুর কন্যা অরুশি ছিলেন ভৃগুর পুত্র চ্যবন ঋষির পত্নী। ব্রহ্মার আরও দুই পুত্র ছিলেন। এঁরা হলেন ধাতৃ এবং বিধাতৃ। তাঁরা মনুর সঙ্গে বাস করতেন। তাঁদের ভগ্নী ছিলেন দেবী সুন্দরী লক্ষ্মী। তাঁর অবস্থান ছিল পদ্মফুলে। তাঁর মানসপুত্ররা ছিল বলবান অশ্ব। তারা আকাশে বিচরণ করত। জীবদের যখন খাদ্যের প্রয়োজন হল তখন তারা একে অন্যকে ভক্ষণ করতে লাগল। এতে অর্ধম দেখা দিল। অধর্ম সব কিছুই ধ্বংস করে। অর্ধমের পত্নীর নাম নিরূতি। এই রাক্ষসদের বলা হয় নিরুতির সন্তান বা নিরুত্মজ। তার তিনটি ভয়ঙ্কর পুত্র ছিল। তারা সর্বদাই খারাপ কাজে লিপ্ত থাকত। এরা হল ভয়, মহাভয় এবং মৃত্যু। মৃত্যুই সব কিছুর শেষ। আর কোনও স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, কারণ সেই তো সব কিছুর শেষ'।

'মহান ঋষিদের সমান তেজ ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রাচেতস দশ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং পবিত্র। তাঁদের মুখ থেকে নির্গত আগুনে উজ্জ্বল জিনিসগুলি পূর্বেই দগ্ধ হয়ে যায়। তাদের থেকে জন্ম হয় দক্ষ প্রচেতার। দক্ষ থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর জীবের। প্রসূতির সঙ্গে সহবাসের ফলে দক্ষ তার মতই সহস্র পুত্রের জনক হলেন। তারা ছিলেন অতীব ধর্মপরায়ণ। নারদ মুনি ঐ পুত্রদের মোক্ষ সম্পর্কে পাঠ দেন। এই পাঠ সাংখ্য দর্শন থেকেও শ্রেষ্ঠতর। আরও সন্তান সন্ততির আশায় দক্ষ আরও ৫০টি কন্যার জন্ম দিলেন। এদের মধ্যে তিনি দশ কন্যা ধর্মের হাতে, ১৩টি কাশ্যপকে এবং ২৭ জন ইন্দুর (সোম) সময় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার হাতে দান করেন। মারীচির পুত্র কশ্যপের ১৩ জন পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়নী ছিলেন সর্বোত্তমা। তার থেকে জন্ম হয় আদিত্যদের। এঁদের প্রধান ছিলেন ইন্দ্র। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী। এছাড়া অন্য পুত্র বিবস্বতও বিখ্যাত ছিলেন।

বিবস্বতের পুত্র ছিলেন যম বিবস্বত। মার্তণ্ড থেকে জন্ম হয় তেজবান মনুর। তাঁর আরও এক পুত্র ছিলেন জ্ঞানী এবং তার থেকে একটি জাতির উৎপত্তি হয়। মানুষের এই পরিবার মনুর নামে পরিচিত হয়। হে রাজন, তাদের থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি এবং ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাদের মধ্যে মনুর পুত্র ব্রাহ্মণগণ বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। মনুর সন্তান হলেন—বেন, ধৃষ্ণু, নরীশ্যন্তা, নভগ, ইক্ষবাকু, করুশ, সারয়তী, ইলা, প্রিষদ্রা এবং নবগরিষ্ঠ। এদের মধ্যে প্রিষদ্রা ক্ষত্রিয়দের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মনুর আরও অন্য পঞ্চাশ জন পুত্র ছিলেন। কিন্তু আমরা শুনেছি যে তাঁরা সকলেই পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে ইলার গর্ভে পুরুরভ-এর জন্ম হয়। আমরা শুনেছি পুরুরভর পিতা-মাতা উভয়ই ছিলেন ইলা'।

পাঁচ

রামায়ণেও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা আছে। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে[১৩] বলা হয়েছে, 'রামকে স্তব করে বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, জাবালি এই পৃথিবীর সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিষয় জানেন। কিন্তু তিনি বললেন, তোমাকে পুনরায় ফিরে আসতে উদ্দীপিত করার জন্য। হে প্রভু আমার কাছ থেকে শ্রবণ করুন কীভাবে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রথম ছিল জলময়। তার থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে। প্রথমে আবির্ভূত হলেন স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম। তার সঙ্গে সৃষ্টি হল দেবদেবীর। তিনি পরে নিজেকে বরাহের আকার ধরে পৃথিবীকে ধারণ করলেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করলেন মুনি ঋষিদের, তাদের পুত্রদের, ব্রহ্মার এবং শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় এবং অক্ষয় সব বস্তুর। অক্ষ থেকে এসব উৎপত্তি হল। তার থেকে উৎপত্তি হল মারীচির এবং কাশ্যপ হলেন মারীচির পুত্র। কশ্যপ থেকে জন্ম নিলেন বিবস্বত এবং বিবস্বত থেকে মনু। এই মনুই ছিলেন সব জীবের উৎপত্তির উৎস। মনুর পুত্র ইক্ষবাকু এবং মনু ইক্ষবাকুর হাতে এই সম্পদশালী পৃথিবীর ভার দিলেন। আর ইক্ষবাকু ছিলেন অযোধ্যার পূর্বতন নৃপতি'।

রামায়ণে আরও একটি সৃষ্টির ইতিহাস রয়েছে। রামায়ণের তৃতীয় কাণ্ডে[১৪] এই কাহিনীর বর্ণনা আছে। বিষয়টি এইরূপ :

---

১৩. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১১৫

১৪. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১১৬

'শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে জটায়ু পাখি তার কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। জটায়ু তার নিজের গোত্র পরিচয় এবং সব জীবের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করেন। জটায়ু তাকে বললেন, 'শোন, আমি তোমাকে সৃষ্টির ইতিহাস বলছি। পুরাকালে সৃষ্টির গোড়ায় প্রজাপতি কীভাবে সব জীব সৃষ্টি করলেন, তাই বলছি। প্রথমে এই পৃথিবী ছিল কর্দমযুক্ত। তারপর আস্তে আস্তে বিক্রিত, শেষ, সমশ্রয়, শক্তিমান, বহুপুত্র, স্থানু, মারীচি, অত্রি, তেজবান, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ এবং তারপর বিবস্বত, অরিষ্ঠনেমী এবং সবশেষে গৌরবোদীপ্ত কাশ্যপের জন্ম। দক্ষ প্রজাপতির ৬০টি সুন্দরী কন্যা ছিল। এদের মধ্যে আটজন সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন কাশ্যপ। এই কন্যারা হলেন— অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তম্রা, ক্রোধভাষা, মামু এবং অনলা। কাশ্যপ খুব খুশি। তিনি তাঁর পত্নীদের বললেন, 'তোমরা আমার মতো পুত্র সন্তানের জন্ম দাও যারা এই ত্রিভুবনকে রক্ষা করতে পারে'। অদিতি, দিতি, দনু এবং কালকা এতে সম্মত হলেন, কিন্তু বাকিরা রাজি হলেন না। অদিতির গর্ভে জন্ম হল তেত্রিশ জন দেবতার। তাঁরা হলেন আদিত্য, বসু, রুদ্র এবং দুই অশ্বিনী। কাশ্যপের অন্য পত্নী মানু জন্ম দিলেন মানুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদের। ব্রাহ্মণদের জন্ম হল তাঁর মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়রা তাঁর বুক থেকে, এবং তাঁবা ঊরু থেকে জন্ম হল বৈশ্যদের এবং পা থেকে জন্ম হল শূদ্রদের। বেদে একথাই বলা হয়েছে। অনলা জন্ম দিলেন পবিত্র ফলপূর্ণ বৃক্ষদের।

ছয়

এখন দেখা যাক পুরাণে এর কি ব্যাখ্যা রয়েছে। পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি হিসাবে আমি বিষ্ণু পুরাণের[১৫] নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ তুলে ধরছি।

'সেই পার্থিব ডিম অবস্থানের পূর্বে ঈশ্বর বৃক্ষ হিরণ্যগর্ভ, যিনি সব জগতের শাশ্বত সৃষ্টিকর্তা, যিনি ব্রহ্মার স্বরূপ এবং বিষ্ণুর আধার তিনিই চার বেদ ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব—এর সম পর্যায়ের। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্ম নিলেন প্রজাপতি দক্ষ। দক্ষের কন্যার নাম অদিতি। অদিতি থেকে জন্ম হয় বিবস্বতের এবং বিবস্বতের সন্তান হলেন মনু। মনুর পুত্ররা হলে ইক্ষবাকু, নৃগ, ধৃষ্ঠ, সর্যাতি, নরীশ্যন্তা, প্রমসু, নভগনেদিষ্ট, কৃষ্ট এবং পৃশাধ্র। পুত্রের আশায় মনু, মিত্র ও বরুণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করলেন। কিন্তু পুরোহিতের ভুল মন্ত্র উচ্চারণের জন্য পুত্রের পরিবর্তে

১৫. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২২০-২২১

ইলা নামে একটি কন্যার জন্ম হল। কিন্তু মিত্র এবং বরুণের করুণায় সে মনুর কাছে এল পুত্ররূপে। তার নাম হল সুদুম্ন। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের রোষে সে আবার নারীতে রূপান্তরিত হল এবং চন্দ্রের পুত্র বুধের আশ্রমের পাশে বিচরণ করতে লাগল। বুধ তার প্রেমে মুগ্ধ হলেন এবং তাদের মিলন হল। তাদের একটি পুত্র হল। তার নাম পুরুরবা। পুরুরবার জন্মের পর ঋষিরা সেই অসীম দীপ্তিমান দেবতার আরাধনা করলেন। যজ্ঞে চারবেদ—'ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব, সব সৃষ্টি, মন, স্থিতিহীনতা এবং যজ্ঞস্থলে নিবেদিত পুরুষের আকার সদৃশ্য দেবতাকে। ঋষিরা সেই দেবতার আরাধনা করে বললেন সুদুম্নকে পুরুষ হিসাবে ফিরিয়ে দিতে। সেই দেবতার ইচ্ছায় ইলা পুনরায় সুদুম্ন হয়ে গেলেন'।

বিষ্ণুপুরাণে মনুর পুত্রদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় :

(১) পৃশাধ্র তার ধর্মীয় গুরুর গাভী হত্যা করার দায়ে শূদ্র হয়ে গেলেন।

(২) কৃশ থেকে থেকে মহাশক্তিশালী ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি হল।

(৩) নেদিষ্টর পুত্র নভগ হয়ে গেলেন বৈশ্য। এই কাহিনী হল সূর্যবংশের। বিষ্ণুপুরাণে[১৬] ঐ একই সঙ্গে চন্দ্রবংশের ইতিহাস বর্ণনা করা আছে। মনু থেকে যেমন সূর্যবংশের উৎপত্তি তদ্রূপ অত্রি থেকে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি :

'ব্রহ্মার পুত্র এবং চন্দ্রের পিতা ছিলেন অত্রি। ব্রহ্মা তাকে বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ এবং নক্ষত্রের সর্বময় কর্তৃত্বে নিযুক্ত করলেন। এদিকে রাজসূয় যজ্ঞ করার পর চন্দ্রের খুব গর্ব হল এবং বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করলেন। বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের গুরু। ব্রহ্মা, দেবতা এবং ঋষিরা চন্দ্রকে তিরস্কার এবং অনুরোধ করে তারাকে বৃহস্পতির কাছে ফিরিয়ে দিতে বললেন কিন্তু চন্দ্র কিছুতেই রাজি হলেন না। চন্দ্রের কিছু অংশ উষনস্ এবং রুদ্র গ্রাস করে ফেললেন। তাঁরা ছিলেন অঙ্গিরার শিষ্য। তাঁরা বৃহস্পতিকে সাহায্য করলেন। দুপক্ষেই ভীষণ যুদ্ধ হল। একদিকে দেবতা এবং অন্যদিকে দৈত্য। পরে ব্রহ্মার হস্তক্ষেপে চন্দ্র তারাকে বৃহস্পতির কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। ততদিনে তারা গর্ভবতী হয়েছেন। তার একটি পুত্রের জন্ম হল। সেই হল বুধ গ্রহ। তারাকে চাপ দিতে তিনি স্বীকার করলেন চন্দ্রই তার পিতা। এই বুধের ঔরসে এবং মনুর কন্যা ইলার গর্ভে পুরূবরা[১৭]

১৬. তদেব, ২২৫-২২৬

১৭. পুরূবরা ও উর্বশীর প্রেম কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণ (ii. ৫.১.১১), বিষ্ণু পুরাণ (vi. ৬.১৯.১১), ভাগবত পুরাণ (৯-১৪), হরিবংশ পুরাণ (খণ্ড ২৬) এবং মহাভারতের ৭৫ খণ্ডে উল্লেখ আছে।

জন্মগ্রহণ করলেন। পুরূবরার[১৮] ছিল ছয় পুত্র। তার মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম আয়ুষ। আয়ুর পাঁচপুত্র। এঁরা হলেন নহুষ, ক্ষাত্রবৃদ্ধা, রম্ভা, রাজি এবং অনেন। ক্ষাত্রবৃদ্ধার ছিল সুনাহোত্র নামে একটি পুত্র। সুনাহোত্রর তিনপুত্র—কাশ, লেস এবং গৃতসামদ। গৃতসামদর পুত্র সৌনক। সৌনক চার বর্ণের সৃষ্টিকর্তা। কাশার একটি পুত্র। তার নাম কাশীরাজ। কাশীরাজের পুত্রের নাম দীর্ঘতামস এবং দীর্ঘতামসের পুত্রের নাম ধন্বন্তরী'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে এই তত্ত্বের তুলনা করলে আমরা কি দেখতে পাই। আমার মনে হয় এই আলোচনার ফলাফল নিম্নলিখিত প্রস্তাবনায় উপস্থাপিত করা যেতে পারে :

(১) প্রথমটি হচ্ছে চরিত্রগতভাবে যাজকীয় এবং অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষ,

(২) একটিতে সূচিত করে মানুষ, মনুই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা এবং অন্যটিতে সৃষ্টিকর্তা বলতে বুঝায় পরমেশ্বর ব্রহ্মা অথবা প্রজাপতিকে,

(৩) একটির মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্র রয়েছে এবং অন্যটি অতিপ্রাকৃত,

(৪) একটিতে মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে এবং অন্যটিতে এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই,

(৫) একটিতে চার বর্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং অন্যটিতে শুধুমাত্র সমাজের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ধরনের পার্থক্য অনেক আছে এবং সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চাতুর্বর্ণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। যাজকীয় আদর্শের ভিত্তিতে চাতুর্বর্ণকে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণে চাতুর্বর্ণকে সমর্থন করা হয়নি। এটি সত্য যে যুক্তি ব্যাখ্যার সাহায্যে দুটিকে এক করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন রামায়ণ ও পুরাণে এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মনুর বংশধরগণ চাতুর্বর্ণ তৈরি করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেও দুটি আদর্শ এক করার চেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টার পিছনে কারণ ছিল। কিন্তু দুটির মধ্যে আদর্শগত প্রভেদ এতই বেশি যে এক করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা দুটি আলাদা আলাদা আদর্শ নিয়ে এখনও টিকে আছে। এসব ঘটার কারণ এই যে, চাতুর্বর্ণ সম্পর্কে একটির পরিবর্তে আমাদের কাছে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

---

১৮. বিষ্ণুপুরাণ, vi. ৭.১

এর একটি হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট অতি প্রাকৃত চাতুর্বর্ণ এবং অন্যটি মনুর পুত্রদের দ্বারা সৃষ্ট স্বাভাবিক চাতুর্বর্ণ। এর ফল হচ্ছে এই যে এই দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে তা মূলগতভাবে আলাদা এবং দুয়ের মধ্যে মিলন সম্ভব নয়। এটি খুব-ই দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে যে এই ধরনের দুটি আদর্শের উল্লেখ রয়েছে তা এইসব বিষয় নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের নজরে আসেনি। কিন্তু ঘটনা হল, তাঁদের অস্তিত্বের কথা এবং গুরুত্বের বিষয় অস্বীকার করা যায় না। এই দুই ধরনের পরস্পরবিরোধী আলাদা মৌলিক আদর্শের কতখানি গুরুত্ব রয়েছে? আমার মতে এটি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা আর্য জাতির বৈশিষ্ট্য। এদের মধ্যে একটি বিশ্বাস করে চাতুর্বর্ণের এবং অন্যটি চাতুর্বর্ণে বিশ্বাস করে না। পরে দুটি জাতি এক হয়ে যায়। এই যুক্তির ভিত্তি যদি সুদৃঢ় হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এই যে আদর্শগত পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে এ সম্পর্কে একটি নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র সূচিত করে।

সাত

আমার মতামতের সমর্থনে আমার তৃতীয় তথা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে আমাদের দেশের মানুষের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে। স্যার হার্বার্ট রিসলে ১৯০১ সালে সর্বপ্রথম এই ধরনের সমীক্ষা প্রকাশ করেন। মস্তিষ্কের গঠন ভিত্তি অনুযায়ী তিনি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে ভারতের মানুষের মধ্যে চারটি আলাদা জাতি রয়েছে :

(১) আর্য, (২) দ্রাবিড়, (৩) মঙ্গোলীয় এবং (৪) সিথিয়ান। এদের বাসভূমি সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তার এই সমীক্ষা ছিল অত্যন্ত খসড়াভিত্তিক। রিসলের এই সমীক্ষা ড: গুহ ১৯৩৬ সালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন। এ বিষয়ে ড: গুহ যে প্রতিবেদন পেশ করেন তা ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ড: গুহ তাঁর তৈরি মানচিত্র মস্তিষ্কের গঠন অনুযায়ী ভারতের মানুষদের বসবাসের স্থানগুলি চিহ্নিত করেছেন। এই মানচিত্র ভারতের মানুষের জাতিভিত্তিক গঠন সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। ড: গুহর সিদ্ধান্ত হল ভারতের মানুষদের দ্বিবিধ জাতিভিত্তিক গঠন রয়েছে। একটি হল লম্বাটে মাথার মানুষ এবং অন্যটি খর্বাকৃতি মাথার মানুষ। ভারতের অভ্যন্তরভাগে বাস করত লম্বাটে মাথার মানুষ এবং ভারতের আশপাশ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত

খর্বাকৃতি মাথার মানুষ। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে সব মস্তিষ্কের খুলি পাওয়া গিয়েছে তাতে ড: গুহর বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে। ড: গুহ এইভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন :

'প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের বসবাসের এলাকা সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা একমাত্র সিন্ধুনদ উপত্যকা ছাড়া অন্যত্র যদিও অপ্রতুল তথাপি ঐ সময়ের ভারতের জাতিতত্ত্বের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ দিক চিহ্ন নির্ণয়ে সাহায্য করে। যীশু খ্রিস্টের জন্মের চার সহস্র বছর পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সম্ভবত দীর্ঘ মস্তিষ্ক এবং তীক্ষ্ণ-লম্বা নাসার অধিকারী মানুষদের বসবাস ছিল। ঐ এক-ই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই আরও একটি শক্তসমর্থ জাতিকে। তাদেরও মস্তিষ্কের গঠন ছিল দীর্ঘ কিন্তু করোটি ঈষৎ চাপা। তাদের মুখমণ্ডল ছিল লম্বাটে এবং নাসিকা সরু। অবশ্য প্রথমোক্তদের মতো তারা অতটা উচ্চস্তরের ছিল না'।

তৃতীয় আর এক ধরনের মানুষেরও ভারতে বসবাস ছিল। তাদের মাথা চওড়া এবং খানিকটা আর্মেনীয় ধাঁচের। এদের উৎপত্তি হয় সম্ভবত আরও কিছুটা পরে। হরপ্পার মত অন্যান্য স্থান বিচারে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। ওইসব এলাকা থেকেই এই ধরনের মস্তিষ্কের খুলি আবিষ্কার করা হয়। আল্পস্ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর বর্ণনা প্রসঙ্গে একথা কারও মনে হতে পারে যে গঠনগত দিক থেকে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল :

(১) ভূমধ্যসাগরীয় অথবা লম্বাটে মাথার মানুষ এবং

(২) আল্পস্ অথবা খর্বাকৃতি মাথার মানুষ।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এটি ঘটনা যে ঐ জাতির লোকেরা আর্য ভাষায় কথা বলত। এছাড়া আরও ঘটনা যে তাদের বাসভূমি ছিল ভূমধ্যসাগরের অববাহিকা অঞ্চল ইউরোপে, এবং সেখান থেকেই তারা ভারতে আসে। তাদের বসতি স্থাপনের অবস্থান থেকে বিষয়টি পরিষ্কার যে তারা আল্পস্ পর্বতমালার সন্নিহিত এলাকার জাতিগোষ্ঠী থেকে পূর্বে ভারতে আসে।

আল্পস্ পর্বতমালা এলাকার জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কেও ঐ একই ঘটনা প্রযোজ্য। প্রথমত আল্পস্ এলাকার আদিবাসীদের বাসভূমি এবং সেখানকার লোকদের ভাষা কি ছিল তা সুনিশ্চিত করা। অধ্যাপক রিপ্লের মতে এই জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল

হিমালয় পর্বতমালা এলাকার এশিয়া মহাদেশে। অধ্যাপক রিপ্লের[১৯] সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

'পূর্ব থেকে মানুষদের যে ভারতে এই অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আমাদের কতটা অধিকার আছে? এই আগমন কোনও বিজয় অভিযান ছিল না। সব কিছু প্রমাণ করে যে, তাদের এই আগমন ঘটেছিল স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণভাবে। কোনও কোনও সময় বেওয়ারিশ এলাকা দখল করে নেওয়াকে কি পূর্বদেশ থেকে মানুষের আগমন বুঝায়? এর প্রমাণ প্রধানত নির্ভর করে ঐ মহাদেশের বিশেষ করে পামির এলাকা এবং পশ্চিম হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ওপর। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এবং আদি যুগের অন্যান্য ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করতেন পামির মালভূমি অঞ্চলই ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। সেখানে তারা একটি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। সেখানে যে সব মানুষের বসবাস ছিল তাদের সঙ্গে আল্পস্ অথবা কেল্ট জাতীয় ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মানুষদের যথেষ্ট মিল ছিল।

ডি. উজফাল্‌ভি টোপিনার্ড এবং অন্যান্য গবেষকদের গবেষণা থেকে এই অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। গল্‌স, তাজিক এবং তাদের অনুগামীদের চোখের রং ছিল ধূসর, চুল কালো এবং তাদের শারীরিক গঠন ছিল মজবুত। তাদের মস্তিষ্কের গঠন থেকে এসব জানা যায়। এই এলাকা বরাবর এ একই শারীরিক গঠনের আরও অনেক মানুষের বসবাস ছিল। এই ভূখণ্ড পূর্ব থেকে পশ্চিমে এশিয়া মাইনর এবং ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে আল্পস্ জাতিগোষ্ঠীর অধিকারে ছিল তা ঐ বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের গঠনগত সাদৃশ্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। টেপিনার বলেছেন তারা এশিয়ার ঐ অঞ্চল থেকে ভারতে আসে। কিন্তু অন্যান্যদের মতে এর কোনও প্রমাণ নেই। এর ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের দৃষ্টি যায় আরও পূর্বদিকে। চওড়া মাথার মানুষদের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা সেখানে অনুসন্ধান চালাই। এই অঞ্চলের কোথাও এই জাতিগোষ্ঠীর প্রমাণের পক্ষে আমাদের জোরালো তথ্য নেই। এই অঞ্চল পশ্চিম দিকে হতে পারে না, কারণ আটলান্টিক মহাসাগর বরাবর এই জাতিগোষ্ঠী বলতে গেলে আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আল্পস্ পর্বতমালার অধিবাসীদের সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের সঙ্গে মিল রয়েছে।

---

১৯. অধ্যাপক রিপ্লে, রেসেস্ অব্ ইউরোপ, পৃ : ৪৭৩-৪৭৪

কিন্তু চুল, বর্ণ এবং দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে একটা সংশয় আমাদের মনে জাগে ঠিক যেমন ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার অধিবাসীদের লম্বাটে মাথা এবং অতিরিক্ত পিঙ্গলবর্ণ, আফ্রিকার নিগ্রোদের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পায়। এতে এই বিষয়গুলি স্থির হয়ে যায় যে আল্পস্ এলাকার জাতিসমূহ পূর্ব দিকে যায় অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বসবাসকারী জাতিসমূহ দক্ষিণ দিকে ধাবিত হয়।

ভাষার প্রশ্নে কিছুটা সংশয় থেকে যায়।[২০] কারা আর্য ভাষা প্রবর্তন করে ইউরোপে? নর্ডিক না আল্পসের অধিবাসীরা? কিন্তু এ-বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে আল্পস্ এলাকার জাতিদের ভাষাই আর্য ভাষা এবং ভাষাগত দিক থেকে বিচার করলে আল্পস্ এলাকায় অধিবাসীদের আর্য জাতি বলা উচিত।

আট

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে দেখা যাবে ঋগ্বেদের সমর্থনে নৃ-বিজ্ঞান ও ইতিহাসে এই দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় যে একটি নয় দুই প্রকারের আর্য জাতি ছিল। এই বিষয়ে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে পশ্চিমী তত্ত্ব এবং ঋগ্বেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘাত রয়েছে। পশ্চিমী তত্ত্বে একটি আর্য জাতির কথা বলা হয়েছে কিন্তু ঋগ্বেদে বলা হয়েছে দুটি আর্য জাতির কথা। সুতরাং পশ্চিমী তত্ত্ব এবং ঋগ্বেদের মধ্যে ব্যাপক প্রভেদ আছে। এ ব্যাপারে ঋগ্বেদ যেহেতু বড় প্রমাণ, এর সঙ্গে যার সঙ্ঘাত রয়েছে তা বাতিল করা উচিত। এছাড়া রাস্তা নেই।

ঋগ্বেদ ও পশ্চিমী মতবাদের মধ্যে আর্য জাতি নিয়ে বড় ধরনের সঙ্ঘাত বিদ্যমান থাকার জন্য আর্যদের আক্রমণ এবং বিজয় নিয়েও মতামতে বড় ধরনের বৈপরীত্য দেখা যায়। দুই আর্য জাতির কারা প্রথমে ভারতে এসেছিল তা আমরা জানি না। তারা যদি আল্পস্ জাতিভুক্ত হত তাহলে বহিঃআক্রমণ এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তাদের বসতি ছিল হিমালয়ের আশপাশের অঞ্চলে। তারা স্থানীয় আদিবাসীদের পরাভূত করে এটিকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েও বলতে হয় পশ্চিমী গবেষকরা একে যত সহজ ভেবেছেন, বিষয়টি অত সহজ নয়। আর্যদের থেকে দাস এবং দস্যুরা আলাদা জাতি ছিল, একথা ধরে নিয়েও বলতে হয় এই বিজয় তত্ত্ব শুধুমাত্র দাস ও দস্যুদের পরাভূত করা সূচিত করে না, বিষয়টিতে

২০. ম্যাডিসন গ্রান্ট, দি পাদ্রি, অব্ দি গ্রেট রেস, ১৯২২, পৃ : ২৩৮-২৩৯

আর্যদের দ্বারা আর্যদের পরাভূত করাও বুঝায়। এখন একথা ব্যাখ্যার অবশ্যই প্রয়োজন আছে যে দাস ও দস্যুরা আদৌ যদি পরাজিত হয়ে, থাকে তাহলে তারা কোন্ আর্য জাতির দ্বারা পরাজিত হয়েছিল?

এটি পরিষ্কার সে পশ্চিমী মতবাদে অপ্রতুল সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দ্রুতগতিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌছান হয়। সেটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে, কারণ প্রাচীন এই আর্য জাতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত এবং পূর্বকল্পিত ধারণার সঙ্গে ঐ মতবাদের মিল ছিল। এগুলি ইন্দো-জর্মন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই এই ধারণা গড়ে উঠেছে এবং মনে করা হয় যে, একমাত্র এগুলিই সত্য। ভাবতে খুবই অবাক লাগে যে মতবাদের ভিত্তি অত্যন্ত হালকা এবং অনিশ্চিত তার ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমী গবেষকগণ তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তা প্রচলিত রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। এই অধ্যায়ে অনেক নতুন নতুন ঘটনা যুক্ত হওয়ায় পশ্চিমী গবেষকদের ঐ মতবাদ আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা উচিত।

□ □

অধ্যায় ৬

শূদ্র ও দাস

পশ্চিমী মতবাদ যে কতটা অসার পূর্বের আলোচনায় তা দেখানো হয়েছে। এই মতবাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হল :

শূদ্র কারা? এ. সি. দাস[১] বলেছেন :

'দাস এবং দস্যুরা হয় অসভ্য অথবা বৈদিক আর্য থেকে ছিল। এদের মধ্যে যুদ্ধে যারা বন্দী হয় সম্ভবত তাদের দাসে পরিণত করা হয় এবং এর ফলে শূদ্র জাতির উৎপত্তি হয়'।

কানে একজন বেদ বিশেষজ্ঞ এবং পশ্চিমী মতবাদের পৃষ্ঠপোষক কাণের[২] মতে :

'দাস শব্দটি পরবর্তীকালে সাহিত্যে ভূমিদাস বা দাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর থেকে একথাই মনে হয়, ঋগ্বেদে আর্যদের বিরুদ্ধাচারণকারী যে দাস জাতি দেখা যায়, তারা আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে আর্যদের সেবার কাজে নিযুক্ত করা হয়। মনুস্মৃতিতে (VIII. ৪.১৩) বলা হয়েছে, ঈশ্বর ব্রাহ্মণদের সেবাকার্যের জন্য শূদ্রদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাই সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও দেখতে পাই স্মৃতি সংহিতার মতো সেখানেও তাদের এক-ই অবস্থান। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত যে আর্যরা দাস-দস্যুদের পরাভূত করে কালক্রমে তারাই শূদ্রতে রূপান্তরিত হয়েছে'।

এই মতানুসারে শূদ্ররা দাস ও দস্যুদের সমান এবং তারা ভারতবর্ষের আদি অনার্য জাতি এবং তাদের সভ্যতা ছিল আদিম ও বর্বর যুগের। এই প্রস্তাবনাকে সামনে রেখে আমরা এখন বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাব।

---

১. ঋগ্বেদিক কালচার, এ.সি. দাস পৃ : ১৩৩

২. ধর্মশাস্ত্র কানে, খণ্ড ২, পৃ : ৩৩

প্রথমে প্রস্তাবনা দিয়েই শুরু করা যাক। এটি একটি মাত্র প্রস্তাবনা নয়। একটির মধ্যে দুটি প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে দাস এবং দস্যু বলতে এক-ই মানুষ বুঝায়। অন্যটি হচ্ছে দাস-দস্যু এবং শূদ্র বলতেও এক-ই মানুষ বুঝায়।

দাস ও দস্যু বলতে যে এক-ই মানুষ বুঝায়—এই প্রস্তাবনার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ঋগ্বেদে যে এই ধরনের যে উল্লেখ রয়েছে তা যথার্থ বলে ধরে নেওয়া যায় না। কোনও কোনও স্থানে দাস ও দস্যু শব্দ এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যেন এই দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। শম্বর, শুষনা, বৃত্র, পিপ্রুদের দাস এবং দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দাস এবং দস্যু উভয়কেই ইন্দ্র এবং অন্য দেবতাদের বিশেষ করে অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়ের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দাস ও দস্যুদের নগর ও শহরগুলি ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দাস ও দস্যু উভয়ের পরাজয়কে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার ফল দাঁড়ায় এক-ই অর্থাৎ জল মুক্তি এবং আলোর প্রকাশের মতো। জল মুক্তি সম্পর্কে উভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে, এই মুক্তি হয় দাসদের দ্বারা এবং অন্য স্থানে দস্যুদের হাতে মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

এইসব প্রমাণের দ্বারা মনে হয় দাস ও দস্যুরা এক-ই ছিল। কিন্তু কিছু কিছু এমন প্রমাণ আছে, যাতে মনে হয় দাস ও দস্যুরা ছিল আলাদা। একথা মনে হওয়ার কারণ ঋগ্বেদে দাস কথাটি আলাদাভাবে ৫৪টি স্থানে এবং দস্যু কথাটি ৭৮টি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের যদি আলাদা আলাদা অস্তিত্ব নাই থাকবে, তাহলে এভাবে তাদের পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হবে কেন? এতে এই সম্ভাবনা মনে আসে যে তারা আলাদা গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।

আর দ্বিতীয় প্রস্তাবনায় যে কথা বলা হয়েছে যে শূদ্র এবং দাস-দস্যুরা এক-ই মানুষ ছিল। সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে যে, এই তথ্যের কোনও ভিত্তি নেই। শূদ্ররা দাস-দস্যুদের সমগোত্রীয় প্রমাণ করার জন্য শূদ্র শব্দটি প্রকৃতি প্রত্যয়গতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শূদ্র শব্দের উৎপত্তি হিসাবে দেখান হয়েছে, 'শূক' অর্থ দুঃখ এবং 'দ্র' অর্থ জয় করা অর্থাৎ 'শূদ্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে যে দুঃখ জয় করে। এক্ষেত্রে বেদান্ত সূত্রের (i. ৩.৩৪) একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে। রাজহংস[৩] নিজের সম্বন্ধে নিন্দাসূচক কথাবার্তা শুনে শোকগ্রস্ত। বিষ্ণু পুরাণেও[৪] ঐ একই ধরনের কথা বলা হয়েছে।

---

৩. ধর্মশাস্ত্র, কানে, খণ্ড ২, পৃ : ১৫৫

৪. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৯৭

সুতরাং এইসব যুক্তি কতটা সত্য? যদি বলা হয় শূদ্র আসল নাম নয়, এটি এসেছে প্রকৃতি প্রত্যয় থেকে, তাহলে কিন্তু চরম মূর্খামি হবে। ব্রাহ্মণ রচনাকারগণ মিথ্যা শব্দ চয়নে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উপনিষদ শব্দের বিভিন্ন প্রত্যয়গত অর্থ ব্রাহ্মণ ভাষ্যকাররা যে ব্যাখ্যা করেছেন সে সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার[৫] বলেছেন :

'এইসব ব্যাখ্যা ইচ্ছাকৃতভাবে এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে যে কোনও প্রকার ঐকমত্য ছিল, তা বুঝা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের অবশ্য ধরে নিতে হবে যে অল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে যে তারা যে কোনও শব্দের প্রচলিত অর্থ নীরবে স্বীকার করে নেয়। এই শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে "আরণ্যক" একটি। সম্ভবত এটি আসল শব্দ নয়—এসেছে প্রকৃতি প্রত্যয় থেকে এবং যে কোনওভাবেই হোক না কেন আমরা ঐ শব্দের অর্থ বুঝতে পারি'।

এই এক-ই কথা প্রযোজ্য বেদান্ত সূত্র এবং বায়ু পুরাণ সম্পর্কে। এখানে শূদ্র শব্দটি প্রকৃতি প্রত্যয় থেকে এসেছে এবং এর অর্থ বুঝানো হয়েছে 'দুঃখী মানুষ' হিসাবে। কিন্তু এটিকে অবাস্তব এবং মূর্খের প্রচেষ্টা বলে আমরা একে অবশ্যই বাতিল করব।

'শূদ্র' যে একটি গোষ্ঠী বা জাতির আসল নাম—এই প্রস্তাবনা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ হাতে আছে। শূদ্র শব্দ যে ব্যুৎপত্তিগত ভাবে আসেনি তারও প্রমাণ আছে।

এই প্রস্তাবনার সমর্থনে বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা যায়। ভারতবর্ষে আলেকজান্ডারের অভিযান সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বলেছেন, ঐ সময় ভারতবর্ষে অনেকগুলি স্বাধীন ও স্বশাসিত প্রজাতন্ত্র ছিল এবং আলেকজান্ডার সেগুলি জয় করেছিলেন। ঐ সব রাজ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী রাজত্ব করত এবং সেই গোষ্ঠীর নামে রাজ্যগুলির নামকরণ হত। এদের মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর নাম ছিল সোদ্রি (Sodari)। এই গোষ্ঠী খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, এরা ছিল তাদের অন্যতম। যুদ্ধে অবশ্য তারা পরাজিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক লাসেন (Lassen) তাদের প্রাচীন শূদ্র বলে চিহ্নিত করেছেন। পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্য'-এ (১.২.৩) শূদ্রদের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে আভীরদের যুক্ত করেছেন। মহাভারতের সভাপর্বের XXXII অধ্যায়ে শূদ্র-রাজ্যের

৫. ম্যাক্সমুলার, উপনিষদ্, ভূমিকা, পৃ : ৬৯-৭১

উল্লেখ আছে। বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং ব্রহ্ম পুরাণেও অন্যান্য জাতির মত শূদ্রদেরও আলাদা জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিন্ধ্য[৬] পর্বতের ওপারে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে তারা রাজত্ব করত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই

এখন দেখা যাক দ্বিতীয় প্রস্তাবনার ওপর এবং এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যাক। এই প্রস্তাবনার সঙ্গে দুটি বিষয় যুক্ত আছে।

এক : দাস ও দস্যু শব্দ দুটি কি কোনও জাতিগত অর্থে অনার্য জাতি বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে?

দুই : তারা যে ভারতের আদি অধিবাসী ছিল এমন কোনও প্রমাণ আছে? যতক্ষণ না পর্যন্ত এই দুটি প্রশ্নের হ্যাঁ বাচক জবাব পাওয়া যায় ততক্ষণ দাস-দস্যুদের শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

দস্যুদের সম্পর্কে বলতে গেলে এমন কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই যাতে বুঝা যায় এই শব্দটি জাতিগত অর্থে অনার্য বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ইতিবাচক প্রমাণ রয়েছে যে দস্যু কথাটি এমন মানুষদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যারা আর্য ধর্ম পালন করে না। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তি পর্বের ৬৫ অধ্যায়ের ২৩ নম্বর শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্লোকটি হল ঃ

দৃশ্যন্তে মানুষে লীকে সর্ববর্ণে দস্যবঃ।
লিংগান্তরে বর্তমানা আশ্রমেষুচতুর্ষ্বপি ॥

ঐ শ্লোকে বলা হয়েছে 'সকল বর্ণে এবং সকল আশ্রমে দস্যুদের অস্তিত্ব দেখা যায়'। দস্যু শব্দের উৎপত্তি কি তা বলা শক্ত। কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে এই শব্দটি তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত এবং ইন্দো-আর্যরা ইন্দো-ইরানিদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করত। এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা বা অসম্ভবতা নেই। আর্য এবং দস্যুদের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ হত, ইতিহাসে তারও প্রমাণ আছে। সুতরাং ইন্দো-আর্যরা তাদের শত্রুদের উদ্দেশ্যে যে এরকম একটি নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

---

৬. বি. সি. ল, ট্রাইবস্ ইন এইনশনট্ ইন্ডিয়া, পৃ : ৩৫০

দাসদের বিষয় বলতে গেলে প্রশ্ন জাগে যে, তাদের সঙ্গে জেন্দ আবেস্তায় অজহি দাহক-র কি কোনও সম্পর্ক আছে? অজহি দাহক একটি যৌগিক নাম এবং এর দুটি অংশ আছে। অজহি শব্দের অর্থ সাপ বা ড্রাগন এবং দাহক শব্দটি এসেছে দহ্ থেকে এবং এর অর্থ হল হুল ফোটান বা কামড়ান। সুতরাং অজহি দাহক শব্দের অর্থ যে ড্রাগন গ্রাস করছে। এই শব্দটি ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় জোহক বলে পরিচিত এবং এটি একটি মূল ব্যুৎপত্তিগত নাম। যশ্ট সাহিত্যে জোহক বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ব্যাবিলনে বাস করতেন এবং সেখানে তিনি একটি প্রাসাদ তৈরি করেন। তিনি ব্যাবিলনে একটি বৃহৎ মান মন্দিরও তৈরি করেন। এই শক্তিশালী অজহি দাহক-কে সৃষ্টি করেন দৈত্য অংগ্র-মৈন্যু। এই পৃথিবীর সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়। অজহি দাহক ইন্দো-ইরানি ও বিখ্যাত সম্রাট য়িমা-র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাকে পরাজিত এবং হত্যা করেন।

আবেস্তাতে য়িমা কে ক্ষেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর অর্থ যে খুব উজ্জ্বল এবং শাসন করে। এই শব্দের মূল হচ্ছে ক্ষি এবং এর দুটি অর্থ আছে। যেমন উজ্জ্বল হওয়া অথবা শাসন করা। য়িমা-র উদ্দেশ্যে আরও একটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয় এবং সেটি হচ্ছে হবাংথয়া যার অর্থ ভাল মানুষ। এই আবেস্তা য়িমা ক্ষেতা পরবর্তীকালের পারসি ভাষায় হয়ে যায় জামশিদ। ঐতিহ্য অনুসারে বিবাঘবন্ত-এর পুত্র জামশিদ ইরানের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। জামশিদ ছিলেন পারস্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পেশদীয় (Peshdiadyan) বংশের রাজা ছিলেন। যশনা ৫ ও ৯ (কোয়েস্বা যোশি) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বিভানশ (Vivanshas) প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাভাবিকভাবে এই পার্থিব জগতে হসমাকে অবরুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি একটি বর লাভ করেন। এই বরে তার একটি বিখ্যাত পুত্রের জন্ম হয়। তার নাম য়িমা। সে ছিল উজ্জ্বল এবং মহান। জীবজগতের মধ্যে তার খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। মানুষের মধ্যে সে যেন সূর্য কিরণের মত শোভা পেত। তিনি তাঁর রাজত্বকালে মহৎ লোক এবং পশুদের অবিস্মরণীয় করে তুললেন। তিনি জল এবং বৃক্ষলতাদের শুষ্ক হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন। তার ছিল অগাধ ঐশ্বরিক ক্ষমতা। য়িমা-র রাজত্বকালে কখনও অতিরিক্ত শীত বা অতিরিক্ত গরম হত না। তাঁর রাজত্বে কোনও বার্ধক্য, মৃত্যু এবং হিংসা ছিল না।

জেন্দ আবেস্তার দহক আর ঋগ্বেদের দাস কি এক-ই? নামের সাদৃশ্য যদি কোনও প্রমাণ হয় তাহলে স্পষ্টতই এটি একই নাম সূচিত করে এবং একই ব্যক্তি বুঝায়। আবেস্তার দহ সংস্কৃত ভাষায় সহজেই দাস হতে পারে। কারণ দাস-এর

'সা' দহর 'হ' তে রূপান্তর স্বাভাবিক ব্যাপার। এটাই যদি একমাত্র প্রমাণ হয় যে ঋগ্বেদের দাস এবং জেন্দ আবেস্তার দহক (Dahaka) একই তাহলে তাকে অনুমান ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। কিন্তু এছাড়া সগোত্রীয় ভাবার আরও প্রমাণ আছে যার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যে তাদের মধ্যে একাত্মতা আছে। যশনা ৯-এ অজহি দহক-কে তিন মুখ, তিন মাথা এবং ছয় চোখ বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সব থেকে অবাক হওয়ার বিষয় এই যে আবেস্তাতে দহকের যে শারীরিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে ঋগ্বেদের দাস-এর সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। ঋগ্বেদে বর্ণনা করা হয়েছে দাস-এর তিনটি মাথা এবং ছয়টি চোখ[৭] আছে। সুতরাং যদি ঋগ্বেদের দাস এবং আবেস্তার দহক একই ব্যক্তি হিসাবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে দাসরা আদি ভারতবর্ষের স্থানীয় অধিবাসী ছিল না, এটা মানতেই হবে।

তিন

তারা কি অসভ্য ছিল? দাস এবং দস্যুরা ভারতের আদিবাসী ছিল না। তারা আর্যদের মতোই সুসভ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা আর্যদের অপেক্ষাও শক্তিশালী ছিল। ঋগ্বেদে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রী আয়েঙ্গার ভালভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

'দস্যুরা শহরে বাস করত (ঋগ্বেদ, i. ৫৩.৮; i. ১০৩.৩) তারা যে সব রাজাদের সময়ে বসবাস করত তাদের অনেকের নাম একশত ফটকওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ছিল সম্পদের অধিকারী (ঋগ্বেদ, viii. ৪০.৬)। তারা গাভী, অশ্ব এবং রথের মালিক ছিল (ঋগ্বেদ, ii. ১৫.৪)। তারা সেগুলি একশত ফটকওয়ালা শহরে কাছে রাখত (ঋগ্বেদ, x. ৯৯.৩)। ইন্দ্র সেগুলিকে দখল করে তার ভক্ত আর্যদের দান করে দেন (ঋগ্বেদ, i. ১৭৬.৪)। দস্যুরা ছিল ধনবান (ঋগ্বেদ, i. ৩৩.৪)। সমভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চলে তাদের অনেক সম্পত্তি ছিল (ঋগ্বেদ, x. ৬৯.৬)। তাদের পরিধানে থাকত স্বর্ণ এবং রত্নের অলঙ্কার (সং.রা. ৬.২৩; অথর্ববেদ পৃ : ২৮৯, ঋগ্বেদ, ii. ২০.৮)। তাদের অনেক দুর্গ ছিল। দস্যু দৈত্য এবং আর্য দেবতারা স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহ নির্মিত দুর্গে বাস করত (ঋগ্বেদ, i. ৩৩.৮)। ইন্দ্র তাঁর উপাসক দিবদাস-এর জন্য তাদের পরাজিত করেন। শ্লোকে একথার বারবার উল্লেখ আছে যে ইন্দ্র দস্যুদের পাথরের দুর্গ ধ্বংস করে দেন (ঋগ্বেদ, iv. ৩০.২০)।

---

৭. দাস এবং দহক-এর মধ্যে তুলনার জন্য 'মহারাষ্ট্র জ্ঞান-কোষ' খণ্ড ৩, পৃ : ৫৩ দ্রষ্টব্য।

আর্যদের উপাসক অগ্নি তার তেজে দস্যুদের শহরগুলি পুড়িয়ে ছারখার করে দেন। (ঋগ্বেদ, vii. ৫.৩)। বৃহস্পতি দস্যুদের পাথরের কারাগার ভেঙে ফেলেন। ঐ কারাগারে দস্যুরা লুণ্ঠন করা গাভী রাখত। দস্যুরা (ঋগ্বেদ, iv. ৬৭.৩) আর্যদের মতো যুদ্ধে রথ ব্যবহার করত এবং অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আর্যদের মতো'।

দাস ও দস্যুরা শূদ্রদের মতো ছিল এটি একটি মিথ্যা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এই অনুমান অর্থহীন। এটি মেনে নেওয়া হয় তার একমাত্র কারণ যাঁরা এই মতবাদের ধারক তাঁরা অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। সাক্ষ্য প্রমাণের কথা বলতে গেলে এতে কণামাত্রও নেই যা এর সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে। যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তা হল দাস শব্দটি ঋগ্বেদে ৫৪ বার এবং দস্যু শব্দটি ৭৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। দাস এবং দস্যু অনেক সময় একসঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। আর শূদ্র শব্দটি একবার মাত্র বলা হয়েছে এবং তাও এমন স্থানে বলা হয়েছে যেখানে দাস ও দস্যুদের কথা বলা হয়নি। এই বিবেচনায় একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, যার কোনও প্রকার কাণ্ডজ্ঞান আছে, সে কখনও বলতে পারে না যে শূদ্র এবং দাস ও দস্যু একই। আরও একটি ঘটনা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্যে দাস ও দস্যু শব্দ দুটির কোনও প্রকার উল্লেখ নেই। এর অর্থ এই যে, আর্যরা সম্পূর্ণভাবে তাদের গ্রাস করে। কিন্তু শূদ্রদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাথমিক বৈদিক সাহিত্য তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত নীরব। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্যে তাদের প্রচুর উল্লেখ আছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শূদ্ররা দাস ও দস্যুদের থেকে আলাদা ছিল।

চার

শূদ্ররা কি অনার্য ছিল? কানে[৮] বলেছেন,

'ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এবং এমনকি ধর্মসূত্রের সময়েও আর্য এবং শূদ্রদের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্যের সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে একটি নকল যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। শূদ্র এবং আর্যরা গোপন স্থানে যুদ্ধ করে। এতে এমন ব্যাপার সাজান হয় যে আর্যরা যুদ্ধে জয়ী হল। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (i.i. ৩.৪০.৪১) বলা হয়েছে, একজন ব্রহ্মচারী যদি তার সব ভিক্ষালব্ধ খাবার খেয়ে শেষ করতে না পারে তাহলে সে ঐ খাদ্য কোনও আর্যর কাছে তার ব্যবহারের জন্য অথবা

৮. ধর্মশাস্ত্র কানে, খণ্ড ২, পৃ : ৩৫

কোনও শূদ্রকে দিয়ে দিতে পারে। ঐ শূদ্র হচ্ছে দাস। একইভাবে গৌতম ধর্মসূত্রে (x. ৬৯) শূদ্রদের অনার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শূদ্র এবং আর্যদের পৃথকীকরণের প্রশ্নে বিষয়টি খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

শূদ্ররা যে অনার্য ছিল এই যুক্তির পিছনে নিম্নলিখিত বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে :

অথর্ব বেদ, iv. ২০.৪—'সহস্র চক্ষু বিশিষ্ট দেবতা আমার ডান হাতে এই বৃক্ষ স্থাপন করবেন যার দ্বারা সব দেখতে পাই—শূদ্র এবং আর্য প্রত্যেককে'।

কথক সংহিতায়, xxxv. ৫ বলা হয়েছে :

'শূদ্র এবং আর্যরা গাত্রবর্ণ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হল। দেবতা এবং দৈত্যরা যুদ্ধ করলেন সূর্য নিয়ে এবং এতে দেবতাদের জয় হল। শূদ্রদের সঙ্গে বিবাদে আর্যরা জয়ী হল। আর্যরা অবস্থান করবে বেদীর মধ্যে এবং শূদ্ররা বেদীর বাইরে। আর্যদের বর্ণ হবে শুভ্র, সূর্যের মতো উজ্জ্বল'।

বাজসনেয়ি (Vajasaneyi) সংহিতায়, xxiii. ৩০.৩১—বলা হয়েছে,

'যখন একটি হরিণ ক্ষেতের যব গাছ খেতে থাকে, তখন ঐ ক্ষেতের মালিক হরিণের প্রতি খুশি হয় না; আর যখন কোনও শূদ্র রমণীর কোনও আর্য প্রেমিক থাকে তখন তার স্বামী ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে না'।

'যখন হরিণটি ক্ষেতের যব গাছ খায় তখন ক্ষেতের মালিক তা সহ্য করে না আর যখন কোনও আর্য রমণীর শূদ্র প্রেমিক থাকে, তখন তার স্বামী তা কখনই অনুমোদন করে না'।

উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে যে, শূদ্র এবং আর্য আলাদা এবং পরস্পরবিরোধী জাতি এবং শূদ্ররা যে অনার্য তার প্রমাণ। তবে এই ধরনের উপসংহার টানা খুব-ই তড়িঘড়ি ব্যাপার হয়ে যাবে। এই বক্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে দুটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রথমত মনে রাখা দরকার যে, এর আগে যা বলা হয়েছে এবং ঋগ্বেদের প্রমাণ সূত্র অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই দুই ধরনের আর্য জাতি আছে—বৈদিক এবং অবৈদিক। এই বিষয়টি ধরে নিয়ে একথা সহজেই বলা যেতে পারে, দুই ধরনের আর্য জাতি ছিল, যদিও তারা ছিল আলাদা এবং স্ববিরোধী।

উপর্যুক্ত বক্তব্য এইভাবে ব্যাখ্যা করার পর সেখানে শূদ্রদের আর্যদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতেও কিন্তু মনে করা যায় না যে, তারা আর্য ছিল না। তারা ছিল সম্পূর্ণ অন্য গোষ্ঠী অথবা শ্রেণীর আর্য।

এটা যে সম্ভব তা হিন্দুদের পবিত্র সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায় :

(১) অথর্ববেদ, XIX. ৩২.৮—'আমাকে তৃণে পরিণত করুন। যা ব্রাহ্মণ, রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, শূদ্র, আর্য, যাদের আমরা ভালবাসি এবং প্রত্যেকে যারা আমাকে দেখতে পায় তাদের জন্য'।

(২) অথর্ববেদ, XIX. ৬২.১—'আমাকে দেবতাদের কাছে, রাজপুত্রদের কাছে, যারা আমাকে দেখতে পায়, শূদ্র এবং আর্যদের কাছে প্রিয় করে তুলুন'।

(৩) বাজসনেয়ি সংহিতা, XVIII. ৪৮—'হে অগ্নি আমাদের ঔজ্জ্বল্য ব্রাহ্মণ, রাজা, বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে দান করুন, আমাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলুন'।

(৪) বাজসনেয়ি সংহিতা, XX. ১৭—'যে সমস্ত পাপ গ্রামে, জঙ্গলে এবং সমাবেশে ইচ্ছাকৃতভাবে শূদ্র অথবা আর্যদের বিরুদ্ধে আমরা করেছি, যে সমস্ত পাপ আমাদের একজন তার কর্তব্য অন্যের প্রতি করেছে, সেই পাপের তুমি ধ্বংসকারী'।

(৫) বাজসনেয়ি সংহিতা, XVIII. ৪৮—'যখন আমি এইসব পবিত্র কথা মানুষের কাছে ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যবর্গের কাছে, শূদ্র এবং আর্যদের কাছে এবং আমার নিজের শত্রুর কাছে বলি তখন আমি ঈশ্বরের কাছে এবং এই পৃথিবীর দাতার কাছে প্রিয় হই। আমার এই ইচ্ছা মঞ্জুর হোক এই প্রার্থনা করি। আমার শত্রু আমার বশীভূত হোক'।

এইসব বক্তব্যে কি দেখা যায়? প্রথম বক্তব্যে ব্রাহ্মণ এবং আর্যদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। এখন একথা কি বলা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মণরা অনার্য ছিল? অন্য বক্তব্যে শূদ্রদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করা হয়েছে। শূদ্র যদি আদিম অধিবাসী অনার্য জাতি হত, তাহলে এইরকম প্রার্থনা কি কল্পনা করা যেত? এই বক্তব্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেও প্রমাণ করে না যে শূদ্ররা অনার্য ছিল।

ধর্মসূত্রে শূদ্রদের অনার্য বলা হয়েছে এবং বাজসনেয়ি সংহিতায় শূদ্র রমণীদের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করা সত্ত্বেও কিছু বোধগম্য হয় না। দুটি কারণে ধর্মসূত্রের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত ধর্মসূত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ শূদ্রদের শত্রুরা রচনা

করেছেন। বিষয়টির পরে উল্লেখ করা হবে। এই কারণে এর কোনও প্রমাণ মূল্য নেই। এ ছাড়া এটাও সন্দেহজনক যে, এইসব শূদ্র বিরোধী বক্তব্য প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান্য রচনায় যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তার সঙ্গে পরস্পর বিরোধিতা আছে।

ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে শূদ্রদের উপনয়ন এবং পবিত্র উপবীত ধারণের অধিকার নেই। কিন্তু সংস্কার গণপতিতে এমন কথার উল্লেখ রয়েছে যাতে বলা হয়েছে শূদ্ররাও উপনয়নের অধিকারী।[৯]

ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার নেই। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে (IV. ১.২) বলা হয়েছে এক জনশ্রুতির গল্প। সেখানে গুরু রৈক্ক জনশ্রুতিকে বেদ শিক্ষা দিচ্ছেন। জনশ্রুতি ছিল একজন শূদ্র। আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কবশ ঐলুশ[১০] একজন শূদ্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঋষি এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তার রচিত বেশ কিছু স্তোত্র রয়েছে।

ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে শূদ্রদের বৈদিক ক্রিয়াকর্ম এবং যজ্ঞের অধিকার নেই। কিন্তু পূর্ব মীমাংসার[১১] রচয়িতা জৈমিনি বদরি নামে একজন প্রাচীন শিক্ষাগুরুর উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখাতে তিনি বিপরীতভাবে দেখিয়েছেন শূদ্রদেরও বৈদিক ক্রিয়ায় অধিকার আছে। তাঁর লেখা অবশ্য হারিয়ে গেছে। ভরদ্বাজ শ্রৌত সূত্রে স্বীকার করা হয়েছে (V. ২৮) আর এক ধরনের মতবাদ বিরাজ করত এবং তাতে বলা হয়েছে শূদ্ররা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের জন্য তিন প্রকারের আগুন জ্বালাতে পারত। কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র (i.৪.১৬) ভাষ্যকাররা স্বীকার করেছেন, এমন কিছু বৈদিক লেখা রয়েছে তাতে উল্লেখ রয়েছে শূদ্ররা বৈদিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার অধিকারী ছিল।

ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, শূদ্রদের পবিত্র সোমরস পান করার অধিকার ছিল না। কিন্তু অশ্বিনীকুমদের কাহিনীতে সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে যে, শূদ্রদের স্বর্গীয় সোমরস পানের অধিকার ছিল। অশ্বিনীকুমদের কাহিনীতে রয়েছে, সুকন্যার ঠিক স্নানের পর যখন তার বস্ত্র ছিল অসংবৃত, তখন তাকে একজন দেখে ফেলে। সুকন্যা একজন যুবতী এবং তিনি ছিলেন ঋষি চ্যবনের পত্নী। বিয়ের সময় ঋষি চ্যবন ছিলেন

৯. এইনশনট সংস্কৃত লিটারেচার ম্যাক্সমুলার, (১৮৬০), পৃ : ২০৭

১০. তদেব, পৃ : ৫৮

১১. পূর্ব মীমাংসা, অধ্যায়া ৬, পদ ১, সূত্র ২৭

এতই বৃদ্ধ যে যে কোনও সময় তাঁর মৃত্যু হতে পারে। অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, আমাদের যে কোনও একজনকে স্বামী রূপে গ্রহণ কর। তাহলে তোমার এইরূপ যৌবন বৃথা যাবে না। সুকন্যা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'আমি আমার স্বামীর প্রতি অনুরক্তা'। তা শুনে অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় সুকন্যাকে প্রলোভন দেখিয়ে দরকষাকষি শুরু করলেন, বললেন, 'আমরা দুইজনই স্বর্গের খ্যাতনামা চিকিৎসক। আমরা তোমার স্বামীকে যুবক ও সুন্দর করে দেব। এই শর্তে তুমি আমাদের দুইজনের মধ্যে একজনকে স্বামী রূপে গ্রহণ কর'। তখন সুকন্যা তাঁর স্বামীর কাছে গিয়ে তাদের এই দরকষাকষির সংবাদ তাঁকে অবহিত করলেন। একথা শুনে চ্যবন ঋষি সুকন্যাকে বললেন, 'তুমি তাই কর'। বিষয়টি অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়কে জানান হল এবং অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় বৃদ্ধ চ্যবন ঋষিকে যুবকে পরিণত করলেন। পরবর্তীকালে একটি প্রশ্ন জাগে যে, অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় কি দেবতাদের জন্য নিবেদিত সেই সোমরস পানের অধিকারী ছিলেন? ইন্দ্র আপত্তি করে জানান, অশ্বিনীরা শূদ্র, সুতরাং তাদের সোমরস পানের কোনও অধিকার নেই। চ্যবন ঋষি অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে তাঁর যৌবন ফিরে পাওয়ায় দেবতাদের এই যুক্তি বাতিল করে অশ্বিনীদের সোমরস দিতে ইন্দ্রকে বাধ্য করলেন।[১২]

শূদ্রদের অনার্য হিসাবে চিহ্নিত করে ধর্মসূত্রে যে প্রমাণ রয়েছে, তা আরও একটি কারণে মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমত এটি মনুর মতামতের পরিপন্থী। শূদ্ররা আর্য ছিল কি অনার্য ছিল, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে মনুর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে :

'যদি ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে এবং শূদ্রা রমণীর গর্ভে কোনও কন্যাসন্তানের জন্ম হয়, তাহলে সেই সন্তান পাক যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানগু যুক্ত হলে উচ্চবর্ণের হবে। নিম্ন জাতি সাত পুরুষের মধ্যে উচ্চ জাতিতে পরিণত হয়'।

'এইভাবে একজন শূদ্র ব্রাহ্মণে উন্নীত হয় এবং ঐ একইভাবে ব্রাহ্মণ শূদ্রে পতিত হয়। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সন্তান সন্ততিদের ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য'।

'তবে যদি সন্দেহ হয় কার দ্বারা এই গর্ভ সঞ্চার হল, অনার্য রমণীর গর্ভে আর্যের দ্বারা না ব্রাহ্মণ রমণীর গর্ভে অনার্যের দ্বারা, তাহলে সিদ্ধান্ত হবে এইরূপ : অনার্য নারীর গর্ভে আর্য পুরুষের ঔরসে কোনও সন্তানের জন্ম

১২. ভি. ফোসবাল, ইন্ডিয়ান মাইসেলন্দি, পৃ : ১২৮-১৩৪

হলে পিতার পরিচয়ে সে আর্যই হবে, আর কোনও আর্য রমণীর গর্ভে অনার্য পুরুষের ঔরসে কোনও সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে তার পরিচয় আর্য হবে না'।[১৩]

মনুর ৬৪ নং শ্লোকের কথা গৌতম ধর্মসূত্রেও (VV. 22) পাওয়া যায়। এই শ্লোকের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ আছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যার সার সংক্ষেপ করে বুহলার বলেছেন :

'মেধ, গব, কুল্ল এবং রাঘ অনুযায়ী এর অর্থ এই প্রকার, ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্র মাতা জাত কোনও কন্যা এবং তার অধস্তনগণ যদি ব্রাহ্মণ বিয়ে করে, তাহলে সেই আদি দম্পতির ষষ্ঠ অধস্তন সন্তানগণ ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হবে। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে হরদত্ত গৌতমের অনুরূপ অনুচ্ছেদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মিল আছে। কিন্তু নার এবং নান এই শ্লোককে আলাদাভাবে দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, ব্রাহ্মণ পিতা এবং শূদ্র মাতার সন্তান একজন পারশর (Parasava) যদি একজন উৎকৃষ্ট পারশব কন্যাকে বিয়ে করে, যার চারিত্রিক এবং অন্যান্য গুণাবলী রয়েছে এবং পরবর্তীকালে তার অধস্তন পুরুষরাও ঐ একই কাজ করে তাহলে তার ষষ্ঠ অধস্তন সন্তান ব্রাহ্মণ রূপে পরিচিত হবে। এই মতের সমর্থনে নন্দন (Nandana) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন বৌধায়ন (i. ১৬, ১৩-১৪) একজন নিশাদির গর্ভে এক নিশাদের জন্ম দিয়েছিলেন এবং পাঁচ পুরুষ পর তার শূদ্রত্ব দূর হয়েছিল। ঐ পঞ্চম পুরুষ ব্রাহ্মণ রূপে স্বীকৃতি পায় এবং ষষ্ঠ পুরুষ থেকে সে যজ্ঞের অধিকার পায়। বৌধায়নের এই অনুচ্ছেদের মাদ্রাজ থেকে প্রাপ্ত এক গবেষণা থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বৌধায়ন ব্রাহ্মণ পিতা এবং শূদ্র মাতা জাত সন্তানকে ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হবার অনুমতি দিয়েছিলেন। মনুর শ্লোকের অর্থ যে একই রকমের, তা অসম্ভব নয় এবং বিষয়টি অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, ব্রাহ্মণ পিতা এবং শূদ্র মাতা জাত সন্তান যদি উৎকৃষ্ট হয় (ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং পারশব উপজাতি কন্যাজাত সন্তানও হতে পারে) তাহলে নিম্ন বর্ণের উপজাতি সপ্তম অধস্তন পুরুষে এসে উচ্চতম বর্ণে স্বীকৃতি পায়।

যেভাবেই ব্যাখ্যা দেওয়া হোক না কেন সপ্তম[১৪] অধস্তন পুরুষে একজন শূদ্র বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ হতে পারে। শূদ্ররা যদি আর্য না হত তাহলে এই ধরনের ব্যাপার অসম্ভব ছিল।

---

১৩. মনুসংহিতা, অধ্যায় ১০, শ্লোক ৬৪-৬৭

১৪. এ-রকম মনে হয় যে, ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ গণনা করে কুল নির্ধারণের প্রথা প্রাচীনকালে সার্বভৌম রূপ লাভ করেছিল।—ডব্লু.ই.হর্ণ-এর 'এরিয়ান হাউসহোল্ড' দ্রষ্টব্য।

শূদ্ররা অনার্য ছিল অর্থশাস্ত্রে সেকথা স্বীকার করা হয়নি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ ব্যাপারে কৌটিল্য যা বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাস প্রথার আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে কৌটিল্য[১৫] বলছেন :

‘জ্ঞাতিরা যদি জন্ম সূত্রে দাস না হয় তবে এমন কোনও নাবালক শূদ্রকে যার আর্য ঔরসে জন্ম তাকে বিক্রয় করে অথবা বন্ধক রাখে, তাহলে তার শাস্তি হবে বার পণ।

একজন ক্রীতদাসকে আর্থিকভাবে যদি ঠকান হয়, অথবা আর্য হিসাবে তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে তার শাস্তি হবে এর অর্ধেক।

প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়ার পরেও যদি একজন ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া না হয় তাহলেও তার শাস্তি হবে বার পণ। আর কোনও কারণ ছাড়া যদি একজন ক্রীতদাসকে বন্দী করা হয় তাহলে তারও অনুরূপ শাস্তি হবে।

কোনও লোক যদি নিজেকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে, তাহলে তার সন্তান আর্য হবে। কোনও ক্রীতদাস তার অর্জিত আর্যই শুধু পাবে না উত্তরাধিকার সূত্রে তার পিতার অর্থও সে পাবে।

কৌটিল্য অত্যন্ত জোর দিয়েই বলেছেন যে শূদ্ররা আর্য ছিল।

পাঁচ

শূদ্রদের দাসে পরিণত করা হয়েছিল—এই ধরনের কথা বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা না হলেও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। শূদ্রদের দাসে পরিণত করার কথা দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। প্রথমত, দাসদের ঋগ্বেদে ক্রীতদাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত দাস ও শূদ্র এক-ই বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

একথা সত্য যে ঋগ্বেদে দাস শব্দটি ক্রীতদাস অথবা ভৃত্য বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থে শব্দটি মাত্র পাঁচ জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে, তার বেশি নয়। কিন্তু পাঁচবারের চেয়ে আরও বেশি জায়গায় যদি এটি ব্যবহৃত হয়, তাতেও কি প্রমাণ হবে যে শূদ্রদের ক্রীতদাস করা হয়েছিল? তারা যে এক-ই লোক ছিল একথা যতক্ষণ না প্রমাণ করা যাচ্ছে ততক্ষণ এই বক্তব্য অর্থহীন। বিষয়টি ঘটনার পরিপন্থী।

---

১৫. গ্রন্থ ৩, অধ্যায় ১৩

রাজার অভিষেকের সময় শূদ্ররা অংশ গ্রহণ করত। বৈদিক পরবর্তী যুগে অথবা ব্রাহ্মণদের সময় রাজার অভিষেক মূলত ছিল জনসাধারণের সার্বভৌম অধিকার, রাজার হাতে তুলে দেওয়ার উৎসব। জনপ্রতিনিধিরাই এই কাজ করতেন। এই প্রতিনিধিদের বলা হত রত্নী রাজার অভিষেকে তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঐ প্রতিনিধিদের রত্নী বলা হত এই কারণে যে সার্বভৌমত্বের প্রতীক রত্ব তারা ধারণ করত। এই রত্নীদের হাত থেকে রত্ব গ্রহণ করার পর রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতেন। এরপর রাজা ঐ প্রতীক গ্রহণ করার পর রাজা প্রত্যেক রত্নী এর গৃহে যেতেন এবং তাদের উপহার প্রদান করতেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষ্য করার বিষয় যে একজন রত্নী সবসময়ই শূদ্র থাকতেন।

'নীতি ময়ুখে'র প্রণেতা নীলকণ্ঠ পরবর্তীকালে এই অভিষেক উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণের মন্ত্রী নতুন রাজাকে অভিষেক করতেন। অতঃপর প্রতি বর্ণ ও জাতির নেতারা, এমনকি নিম্নস্তর পর্যন্ত নতুন রাজাকে পবিত্র জলে অভিষিক্ত করতেন। এরপর দ্বিজরা[১৬] তাকে সংধর্বনা জ্ঞাপন করতেন।

শূদ্ররা যে রাজার অভিষেক উৎসবে আমন্ত্রিত হতেন এবং তারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই আমন্ত্রিত হতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময়। মহাভারতে[১৭] এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে শূদ্ররা দুটি রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য ছিল। এই দুটি পরিষদ হল জনপদ এবং পৌর। এই দুটি পরিষদের সদস্য হিসাবে শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেও সম্মান পেত[১৮]।

মনুস্মৃতি vi. ৬১ এবং বিষ্ণুস্মৃতিতেও (xxi. ৬৪) এই ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায়। নতুবা মনু এমন কথা বলতে পারতেন না যে, রাজ্যের রাজা যেখানে শূদ্র সেখানে ব্রাহ্মণদের বাস করা উচিত নয়। এর অর্থ শূদ্ররাও রাজা ছিল।

মহাভারতের শান্তিপর্বে[১৯] ভীষ্ম যুধিষ্ঠির রাজনৈতিক উপদেশ দেওয়ার সময় বলেছেন :

১৬. হিন্দু পলিটি জয়সওয়াল, (১৯৪৩), পৃ : ২২৩
১৭. মহাভারত, সভা পর্ব, অধ্যায় xxxiii., শ্লোক ৪১-৪২
১৮. হিন্দু পলিটি জয়সওয়াল, (১৯৪৩), পৃ : ২৪৮
১৯. রায়ের অনুবাদ, খণ্ড ২, পৃ : ১৯৭

'আমি তোমাকে বলছি, তুমি রাজ্য শাসনের জন্য কি ধরনের মন্ত্রী নিয়োগ করবে। চারজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী যাঁরা বেদজ্ঞ, সম্মানিত, বিদ্বান এবং পবিত্র, ৮ জন ক্ষত্রিয় মন্ত্রী যাঁরা হবেন খুব বলশালী এবং অস্ত্র চালনা করতে পারবেন, কুড়ি জন বৈশ্য মন্ত্রী যাঁরা ধন সম্পদের মালিক এবং তিন জন শূদ্র মন্ত্রী যাঁরা হবেন বিনীত এবং যাঁদের চরিত্র হবে নির্মল এবং দৈনন্দিন কাজের প্রতি অনুরক্ত, একজন মন্ত্রী হবেন সুত সম্প্রদায় থেকে, যার পুরাণে জ্ঞান থাকবে এবং আট জন শুদ্ধাচারী ব্যক্তিকেও তোমার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করবে'।

এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় শূদ্ররাও মন্ত্রী ছিল এবং তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের সমান। শূদ্ররা গরিব এবং নিম্নজাত ছিল না, তারা ধনী ছিল। মৈত্রায়নি সংহিতায় (N. ২.৭.১০)[২০] এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (vi. ১.১১) এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রশ্নের দুটি দিক আছে। শূদ্রদের ক্রীতদাসে পরিণত করার কি গুরুত্ব আছে? বিষয়টিকে সত্য হিসাবে ধরে নিয়েও বলা যায় আর্যরা যদি দাস প্রথা না জানত এবং আর্যদের ক্রীতদাস হিসাবে পরিণত না করতে প্রস্তুত থাকত, তাহলে এর কিছু গুরুত্ব থাকত। কিন্তু ঘটনা হল, আর্যরা দাস প্রথা জানত এবং আর্যদেরও দাসে পরিণত হওয়ার বিষয়টিকে অনুমোদন দিত। ঋগ্বেদে এর প্রমাণ আছে (VII. ৮৬.৭, VIII, ১৯.৩৬, এবং VIII. ৫৬.৩) যদি তাই হয়, তাহলে তারা বিশেষ করে শূদ্রদের দাসে পরিণত করতে চায় কেন? আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তারা শূদ্র ক্রীতদাসদের জন্য আলাদা আইন তৈরি করে কেন?

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পশ্চিমী মতবাদ আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে না। আমাদের প্রশ্ন, কারা শূদ্র ছিল এবং কীভাবেই বা তারা চতুর্থ বর্ণের মানুষ হিসাবে গণ্য হল?

□ □

---

২০. বেদিক ইন্ডেক্স, খণ্ড ২, পৃ : ৩৯০

অধ্যায় ৭

কারা শূদ্র ছিল?

শূদ্ররা যদি আদিম অনার্য বংশোদ্ভূত না হয় তাহলে এই শূদ্র জাতি কারা? আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। এ ব্যাপারে আমি যে তত্ত্বের অবতারণা করছি তা তিনটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবনায় বিভক্ত করা যেতে পারে :

(১) শূদ্ররা আর্য ছিল,

(২) শূদ্ররা ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত ছিল,

(৩) ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শূদ্র জাতি খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল এবং প্রাচীন আর্য সমাজে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ও ক্ষমতাশালী শূদ্র রাজা ছিলেন। শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে আমার এই গবেষণা বিপ্লবাত্মক না হলেও বিস্ময় জন্মায়। এটি এতটাই বিস্ময় জাগানো যে, এর সমর্থনে আমি সাক্ষ্য প্রমাণ যতই উপস্থাপনা করি না কেন, খুব বেশি মানুষ আমার এই মতবাদকে গ্রহণ করতে চাইবে না। সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে আমার দায়বদ্ধতা আছে কিন্তু তা বিচারের ভার আমি জনগণের ওপরই ন্যস্ত করলাম।

প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ যার ওপর আমার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে মহাভারতের শান্তি পর্বের ৬০ অধ্যায়ের ৩৮-৪০ শ্লোক। সেখানে বলা হয়েছে :

'একথা আমরা শুনেছি যে পুরাকালে পৈজবন (Paijavana) নামে একজন শূদ্র তার নামে উৎসবেরই জন্য যে দক্ষিণা প্রদান করেছিলেন তার পরিমাণ ছিল হাজার পূর্ণপাত্র। ধর্মানুষ্ঠান এন্দ্রাগ্নি (Aindragni) বিধি অনুযায়ী তিনি এই দক্ষিণা দান করেন।

এই অনুচ্ছেদে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়,

(১) পৈজবন একজন শূদ্র ছিলেন।

(২) ঐ শূদ্র পৈজবন যজ্ঞ করেন এবং

(৩) ব্রাহ্মণরা ঐ যজ্ঞের কাজ সম্পন্ন করেন এবং পৈজবনের কাছ থেকে দক্ষিণা গ্রহণ করেন।

মহাভারতের রায় সংস্করণ থেকে এই উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। এখন প্রথম কাজ হল আমাদের বক্তব্য সঠিক কি না এবং এটি গঠনে কোনওরূপ বিকৃতি করা হয়েছে কিনা। এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে রায়[১] বলেছেন :

'আমার এই সংস্করণ সম্পর্কে বলতে পারি 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল', প্রকাশিত সংস্করণের উপর ভিত্তি করেই এটি সঙ্কলিত হয়েছে। বাংলায় কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪৫ বছর পূর্বে এটি প্রকাশিত হয়। এই সঙ্কলনে সাহায্য করেন অনেক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ। ভারতের সব প্রান্ত থেকে এর জন্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছিল, দক্ষিণাও বাদ পড়েনি; এবং পরে অতি সতর্কতার সঙ্গে সেগুলিকে সঙ্কলিত করা হয়। যদিও ঐ সংস্করণ অতি সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল। আমি কিন্তু তা অন্ধভাবে অনুসরণ করিনি। আমি এটি বর্ধমানের মহারাজার সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি। ঐ সংস্করণটি আরও বেশি সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল। সারা ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে ১৮খানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং বর্ধমানের পণ্ডিতগণ বিশেষে সতর্কতার সঙ্গে তা সঙ্কলিত করেন। ঐ পণ্ডিতগণ ঐ শ্লোককে যথার্থ বলে মতামত দিয়েছিলেন।'

অধ্যাপক সুকথানকার (Suktnankar) ছিলেন মহাভারতের[২] একটি বহু আলোচিত সংস্করণের একজন বিদগ্ধ সম্পাদক। মহাভারতের বহু সংস্করণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে :

'দি এডিশিও প্রিন্সেপ' (কলকাতা—১৮৮৬) সংস্করণটিই গত প্রায় একশো বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্করণ বলে চিহ্নিত। মহাভারতের রায় সংস্করণ সম্পর্কে যদিও যথার্থতা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই তবুও সমালোচকরা যদি জানতে চান এই সংস্করণের পিছনে কোন কোন পাণ্ডুলিপির ভিত্তি আছে, তাহলে তাকে অযৌক্তিক বলা যাবে না। তাঁরা জানতে চাইতে পারেন কীসের ভিত্তিতে শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে এই নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হলে দুটি বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবে। একটি হচ্ছে মহাভারতের[৩] অষ্টাদশ

১. সুকথানকার মেমোরিয়াল সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪ থেকে উদ্ধৃত।

২. তদেব, পৃ : ১৩১

৩. তদেব, পৃ : ১৪

পর্বের ওপর সম্পূর্ণ কোনও মহাভারত পাণ্ডুলিপি নেই। প্রতি পর্বকেই আলাদা আলাদা হিসাবে দেখা হয়েছে এবং এর ফলে বিভিন্ন পর্বের অনুলিপির মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ যে সব পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে এই সংস্করণ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কোন্‌টি সঠিক তা নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়[৪] যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হল, মহাভারতের বিষয়গুলি দুটি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে—উত্তর ও দক্ষিণ সংস্করণ। উত্তরে আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণে দক্ষিণাপথ।

এটি অবশ্য স্পষ্ট যে, পাণ্ডুলিপির সমর্থনের বিষয়টি নির্ভর করে যথেষ্ট সংখ্যক পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ওপর এবং উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বণ্টন করে দেওয়ার ওপর। এইসব কথা মনে রেখে মহাভারতের শান্তিপর্বের ৬০ অধ্যায়ের ৩৮ নম্বর শ্লোকের[৫] বক্তব্যের সঙ্কলনটি নিচে দেওয়া হল। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে এটি সঙ্কলিত হয়েছে :

(১) শূদ্র পৈজবন নাম	(K)S
(২) শূদ্র পৈলবন নাম	(M/1:M/2)S
(৩) শূদ্র ঐলননো নাম	(M/3: M/4)S
(৪) শূদ্র ঐজনান নাম	(F)
(৫) শূদ্রোপি য়জনে নাম	(L)
(৬) শূদ্র পৈজলক নাম	(TC) S
(৭) শুদ্ধ : বৈভবনো নাম	(G) N
(৮) পূরা বৈজবনো নাম	(A,D/2)
(৯) পূরা বৈজননো নাম	(M) N

এটি নটি পাণ্ডুলিপির সঙ্কলন। একটি বিষয় উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রে নটি পাণ্ডুলিপি কি যথেষ্ট যার পঠনের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে? এটি সত্য যে মহাভারতের বিভিন্ন

৪. সুকথানকার মেমোরিয়াল সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃ : ৯-৪২

৫. ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, আমাকে সব পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। উপরের তালিকায় বন্ধনীভুক্ত ইন্ডক্স নম্বর ইনস্টিটিউট দিয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে N এবং S নির্দেশ করছে পাণ্ডুলিপিটি উত্তর (N) না দক্ষিণে (S) প্রাপ্ত।

পর্বের সঙ্কলনের জন্য যেসব পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হয়েছে তার সংখ্যা নয়ের বেশি। সমগ্র মহাভারতের বিষয়বস্তু তৈরির জন্য সর্বনিম্ন দশ[৬] সংখ্যক পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হয়েছে তা সংখ্যায় নিশ্চয়ই কম নয়। এই নটি পাণ্ডুলিপিই দুটি ভৌগোলিক ভাগে বিভক্ত করা যায়—উত্তর ও দক্ষিণ। M/1, N/2, M/3, M/4 এবং TC দক্ষিণের ভাগে পড়ে এবং A, M, G, এবং D/2 উত্তরের ভাগে পড়ে। পাণ্ডুলিপির এই নির্বাচন দুই অঞ্চলের মানুষকে খুশি করে। বিশেষজ্ঞরা এইভাবে তাঁদের মতামত দিয়েছেন।

এই পাণ্ডুলিপিগুলির পঠনের বিভিন্নতা বিচার করলে দেখা যায়:

(১) পৈজবনের বর্ণনায় বিভিন্নতা আছে;

(২) পৈজবন নামের মধ্যে বিভিন্নতা আছে;

(৩) নয়টির মধ্যে ছয়টিতে তাকে শূদ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন তাকে শূদ্র বলে বর্ণনা করেছেন এবং বাকি দুজন তার শ্রেণীর পরিবর্তে কোন্ সময়ে তিনি বাস করতেন তার উল্লেখ করেছেন।

(৪) নামের বিষয়ে বলতে গেলে এই নয়টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে কোনও দুইটিতে মিল নেই। প্রত্যেকটির পাঠ আলাদা।

এই ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এর মধ্যে আসল কোন্‌টি? প্রথমটি সম্পর্কে এর নামের বিষয়ে বলা যায় এটি সুস্পষ্ট যে এর সঙ্গে নামের অর্থ জড়িত নয়। ব্যাখ্যা নাম সংশোধন অথবা এর পঠন ও উচ্চারণ সম্পর্কে এতে কোনও প্রশ্ন জাগে না। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কোন্‌টি সঠিক নাম এবং নামের ব্যাপারে লেখার সময় কোন্ ধরনের মারাত্মক ভুল করণিকরা করেছেন। পৈজবনই যে আসল নাম সে সম্পর্কে সম্ভবত কোনও সন্দেহ নেই। দক্ষিণ ও উত্তর দু পক্ষই এর সমর্থন করেছেন। যেমন আট নম্বরের বৈজবন আর পৈজবন এক-ই ব্যক্তি। বাকিগুলি সম্ভবত লেখকদের ত্রুটি, বিভিন্নতা হওয়ার কারণে লেখকরা মূল পাণ্ডুলিপি সঠিকভাবে পড়তে সক্ষম হননি এবং তাঁরা তাঁদের নিজেদের মত করেই পাঠ করেছেন।

এর পরে আসে পৈজবনের বর্ণনা প্রসঙ্গ। শূদ্র থেকে পুর—এটি কোনও ঘটনাচক্রে হয়নি। ইচ্ছাকৃতভাবেই বিকৃতি করা হয়েছে। কেন এই পরিবর্তন ঘটেছে

৬. সুকথানকার মেমোরিয়াল সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃ : ১৪

তা নির্দিষ্ট করে বলা খুবই শক্ত। এখানে দুটি বিষয় খুব পরিষ্কার। প্রথমত, এই পরিবর্তন মনে হয় খুব স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, এই পরিবর্তন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে এমন কোনও ব্যাঘাত ঘটায় না যে পৈজবন ছিলেন শূদ্র। ৩৮-৪০ নম্বর স্তোত্র যদি স্মরণ রাখা যায় তাহলে এই উপসংহারের বাস্তবতা প্রমাণ হয়ে যাবে। এর আগের স্তোত্রগুলির বিষয়বস্তু থেকেও এটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এগুলি নিম্নে দেওয়া হল :

'প্রভুর শত বিপদের মধ্যেও শূদ্র তাদের পরিত্যাগ করে যাবে না। প্রভুর ধনসম্পদ যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলেও শূদ্র ভৃত্য প্রভুর সঙ্গে থাকবে। শূদ্র নিজে কোনও সম্পদের অধিকারী হতে পারবে না। তার যা কিছু সম্পত্তি তা সবই তার প্রভুর। অন্য তিন বর্ণের জন্য যা নিবেদিত, শূদ্রদের জন্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে, "ও! ভারত! 'শূদ্ররা স্বাহা কিম্বা স্বধা এই জাতীয় কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না। এই কারণে শূদ্ররা বেদের বিধিসম্মত পূজা অর্চনার বাইরে ক্ষুদ্র যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের পূজা করবে এবং ঐ পূজাকে বলা হয় পাকজন্য পূর্ণপাত্রে দানকে ঐ নৈবেদ্যর দক্ষিণা বলে ধরে নিতে হবে।'

পূর্ববর্তী ৩৮-৪০ শ্লোকের সম্পর্কে বলা যায় শূদ্রদের নিয়েই এতে বলা হয়েছে। পৈজবনের কাহিনী একটি ব্যাখ্যা মাত্র। এই পশ্চাদপটে পৈজবনের পূর্বে শূদ্র শব্দের পুনরাবৃত্তি একান্ত নিষ্প্রয়োজন।

দুটি পাণ্ডুলিপিতে পৈজবনের নামের পূর্বে কেন শূদ্র শব্দটি বসেনি এতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। শূদ্র এই কথার পরিবর্তে কেন পূব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পৈজবনের নামের আগে সে বিষয়ে বলতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পৈজবনের সময়টা ছিল বহু প্রাচীন যুগে। অতএব লিপিকারদের একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা উচিত। লিপিকার মনে করলেন পৈজাবনকে শূদ্র বলে বর্ণনা করার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। সুতরাং এর ওপর আর জোর দেওয়ার প্রয়োজন কি? অন্যভাবে দেখতে হলে বলতে হবে যে পৈজবন বসবাস করতেন বহু প্রাচীন কালে এবং এই বিষয়টি যেহেতু পরিষ্কারভাবে বলা নেই, সেইহেতু লিপিকার ভাবতে পারেন শূদ্র শব্দের পরিবর্তে পূর শব্দটি ব্যবহার করাই বেশি যুক্তিযুক্ত, এবং এইজন্যই অপ্রয়োজনীয় মনে করে শূদ্র শব্দটি বাদ দেন।

এই ব্যাখ্যা যদি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই ধরে

নিতে পারি যে মহাভারতের সমাপ্ত পর্বের ঐ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঐ ব্যক্তিই পৈজবন এবং ঐ পৈজবন ছিলেন একজন শূদ্র।

দুই

পরবর্তী যে প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে তা হল পৈজবনের পরিচয় খুঁজে বের করা। কে এই পৈজবন? এবং আশা করি যাস্কর নিরুক্ত[৭] কিছু সমাধান সূত্র দিতে পারে। যাস্ক-তে বলা হয়েছে;

'সুদাস (Sudas) এর পুরোহিত ছিলেন বিশ্বামিত্র। সুদাস ছিলেন পৈজবনের পুত্র। বিশ্বামিত্র ছিলেন সকলের বন্ধুভাবাপন্ন। তারা একসঙ্গে ভ্রমণ করতেন। সুদাস ছিলেন একজন বড় দাতা। পিজবনের পুত্র পৈজাবন। পৈজাবনের গতি ছিল ঈর্ষা করার মতো এবং তার চলনভঙ্গি ছিল অননুকরণীয়।' যাস্ক-র নিরুক্ত থেকে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই :

(১) পৈজাবনের অর্থ পিজাবনের পুত্র, (২) পৈজাবনের পুত্র সুদাস একজন শূদ্র। যাস্ক-র সাহায্য নিয়ে আমরা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি যে মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত অনুচ্ছেদে এই পৈজাবন কে? এর উত্তর হল পৈজাবনের অপর নাম হল সুদাস।

এর পরের প্রশ্ন হল, এই সুদাস কে এবং তার সম্পর্কে আমরা কি জানি? ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করলে সুদাস নামে তিন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে[৮] একজন সুদাসের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে সুদাসের বংশপরিচয় পাওয়া যায় :

(১) ঋগ্বেদ vii. ১৮,২১—পরাশর যিনি একশো রাক্ষসকে হত্যা করেছেন এবং বশিষ্ঠ যিনিও তোমার প্রতি অনুরক্ত এবং প্রতিটি বাসগৃহে যারা তোমাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যারা তোমার বন্ধুত্বকে অবহেলা করেননি, হে দাতা অতএব ধার্মিকদের সৌভাগ্যের দিন আগত।'

(২) ঋগ্বেদ vii. ১৮,২২—'সুদাসের উদারতার প্রশংসা করে দেবব্রতের পৌত্র এবং পৈজাবনের পুত্র যিনি দুশো গাড়ি, দুটি রথ ও ৫টি স্ত্রী দান করেছেন বলেছেন

---

৭. নির্ঘন্টু অ্যান্ড নিরুক্ত লক্ষ্মণ স্বরূপ, পৃ : ৩৫-৩৬

৮. ঋগ্বেদ, উইলসন, খণ্ড ৪ (পুণে পুণমুদ্রণ), পৃ : ১৪৬

আমি তোমাকে দান অর্পণ করছি যেমন অগ্নি যজ্ঞস্থলে তার পুরোহিতকে দান করেন।'

(৩) ঋগ্বেদ vii.১৮,২৩—'চারটি সোনালী লাগামে জোড়া অশ্ব খুব দুর্গম রাস্তায় স্বচ্ছন্দভাবে চলার সময় পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য এবং উৎকৃষ্ট একটি দান আমাকে দিল। সে হচ্ছে পৈজাবনের পুত্র সুদাস। পুত্র রূপে আমি তার ভার নিলাম তাকে আহার্য এবং প্রজনন ক্ষমতা দিলাম।'

(৪) ঋগ্বেদ vii. ১৮,২৪—'সপ্তজগৎ সুদাসকে এই বলে স্তুতি করে যেন তিনি ইন্দ্র। স্বর্গ এবং পৃথিবী থেকে তার যশ নেমে আসে। তিনি দাতা। সর্ব বিখ্যাত লোকদের তিনি প্রচুর ধন দান করেন, এবং যার জন্য প্রবাহিত নদী যুদ্ধে যুদ্ধমর্ধি-কে ধ্বংস করেন।'

(৫) ঋগ্বেদ vii. ১৮,২৫—'মঙ্গল ক্রিয়াকর্মের হোতা, তারা এই রাজপুত্রের যজ্ঞে অংশ নেন যেমন তুমি সুদাসের পিতা দিবদাসের যজ্ঞে যোগ দিয়েছিল এবং পৈজবনের বিখ্যাত পুত্রের প্রার্থনায় অনুগ্রহ করেছিল। তাঁর শক্তি অক্ষত এবং অবিনশ্বর হোক।'

অন্য দুটির উল্লেখ আছে বিষ্ণুপুরাণে। একজন সুদাসের বর্ণনা আছে চতুর্থ অধ্যায়ে। তাকে সগরের অধস্তন পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বংশানুক্রমিকভাবে সুদাসের সঙ্গে সগরের সম্পর্ক এইভাবে দেখানো হয়েছে:[৯]

'কশ্যপের কন্যা সুমতি এবং রাজা বিদর্ভের কন্যা কেশিনী—এই দুই স্ত্রী ছিলেন সগরের। কোনও সন্তান না হওয়ায় রাজা সগর আয়ুর্ব (Aurva) মুনির স্তুতি করে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। মুনি রাজাকে দুটি বর দান করলেন। এক বরে এক স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হবে এবং সে হবে তাঁর বংশের ধারক। অন্য বরে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম হবে। রাজা তার দুই পত্নীর মধ্যে এর একটি বেছে নিতে বললেন। কেশিনী এক পুত্র প্রার্থনা করলেন এবং সুমতি ষাট হাজার পুত্রের জননী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অল্পদিনের মধ্যে কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জ নামে একটি পুত্রের জন্ম হল এবং যার মাধ্যমে তাঁর বংশপরম্পরা রক্ষিত হল। কাশ্যপও বিনতার কন্যা সুমতির ষাট হাজার পুত্রের জন্ম দিলেন। অসমঞ্জের পুত্রের নাম অংশুমত।

---

৯. ঋগ্বেদ, উইলসন, পৃ : ৩৭৭-৩৮০

অংশুমতের পুত্রের নাম দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথই পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করেন এবং এর জন্যই গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী। ভগীরথের পুত্র হলেন শ্রুত। শ্রুতের পুত্র নভগ। নভগের পুত্র অম্বরীশ, অম্বরীশের পুত্র সিন্ধুদীপ, তার পুত্র আয়ুতশ্ব এবং আযুতশ্বের পুত্র ঋতুপর্ণ। তিনি ছিলেন নলের বন্ধু। নল ছিলেন পাশা খেলায় অত্যন্ত দক্ষ। ঋতুপর্ণের পুত্রের নাম সর্বকাম এবং তার পুত্র সুদাস এবং সুদাসের পুত্র সৌদাস। সৌদাসের অন্য নাম মিত্রসহা।

XIX. তম অধ্যায়ে আর একজন সুদাসের উল্লেখ রয়েছে। তাঁকে পুরুর অধস্তন পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বংশানুক্রমিক তালিকায় পুরুর সঙ্গে সুদাসের সম্পর্ক নিচে দেওয়া হল :

'পুরুর পুত্র জন্মেজয়, জন্মেজয়ের পুত্র প্রাচীনবৎ এবং তাঁর পুত্র প্রবীর। প্রবীরের পুত্রের নাম ছিল মনস্যু, মনস্যুর পুত্র ভায়দা এবং তাঁর পুত্র সুদুন্ন। সুদুন্নের পুত্র বহুগভ এবং বহুগভের পুত্রের নাম সাম্যতি, সাম্যতির পুত্র হলেন ভাম্যতি, তাঁর পুত্র রৌদ্রশভ। রৌদ্রশভর ছিল দশ পুত্র। এরা হলেন রিতেয়ু, কাক্ষেয়ু, স্থানদিলেয়ু, ঘৃতেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, ধনেয়ু, বনেয়ু এবং ব্রাতেয়ু প্রমুখ। বিতেয়ুর পুত্র রন্তিনর। রন্তিনরের তিন পুত্র—তামসু, অপ্রতিরথ এবং ধ্রুব। অপ্রতিরথের পুত্র হলেন কন্ব। কন্বের পুত্র মেধাতিথি। কন্বের থেকে কান্ব ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি। তামসুর পুত্র অনিল এবং অনিলের চার পুত্র। এই চার পুত্রের মধ্যে দুষ্যন্ত জেষ্ঠ্য। এই দুষ্যন্তের পুত্র ছিলেন সম্রাট ভরত।

ভরতের অনেকগুলি পত্নী ছিলেন। তাদের গর্ভে নয় পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু সম্রাট ভরত বললেন ঐ পুত্রদের সঙ্গে তাঁর চেহারার কোনও মিল নেই। সুতরাং ঐ মাতারা সম্রাট কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে পারেন এই আশঙ্কায় পুত্রদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই হত্যা করলেন। এই পুত্রদের জন্ম বৃথা হওয়ায় ভরত মরুতের যজ্ঞ করলেন। মরুতগণ খুশি হয়ে সম্রাট ভরতকে উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজকে দান করলেন।

উতথ্যকে বিতথ্যও বলা হয়েছে। সম্রাট ভরতের পুত্রের জন্মের প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে তাঁকে বিতথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিতথের পুত্রের নাম ভবনমন্যু। ভবনমন্যুর অনেকগুলি পুত্র ছিল। এদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন, বৃহতক্ষত্র, মহাবীর্য, নর এবং গর্গ। নরের পুত্রের নাম সংকৃতি এবং তাঁর পুত্ররা হলেন রুচিবৃধি এবং রন্তিদেব। অন্যদিকে গর্গের পুত্রের নাম হল সিনি। তাঁর অখণ্ডত পুরুষদের বলা

গার্গেয় এবং সৈন্য। ক্ষত্রিয়জাত হয়েও তারা ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হন। মহাবীর‍্যর পুত্রের নাম উরাক্ষয় এবং তাঁর ছিল তিন পুত্র। এদের নাম হল, ত্রায়ারুণ, পুষ্করিণ এবং কলি। এদের মধ্যে কলি ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হন। বৃহতক্ষত্রের পুত্রের নাম সুগোত্র এবং তাঁর পুত্র হস্তিন। তিনি হস্তিনাপুর নগরের পত্তন করেন। হস্তিনেয় পুত্রদের নাম ছিল অজমিধ, দিভিমিধ, এবং পুরুমিধ। অজমিধের এক পুত্রের নাম কন্ব এবং কন্বের পুত্র মেধাতিথি। কন্বের অপর পুত্রের নাম বৃহদিংসু। বৃহদিংসুর পুত্র বৃহদবসু, তাঁর পুত্র বৃহৎকর্মা এবং বৃহৎকর্মার পুত্র জয়দ্রথ। তাঁর পুত্র বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের পুত্র সেনাজিৎ এবং তঁর পুত্রেরা হল রুচিরস্ব, কস্যে, দৃধধনুষ এবং বমুহ্নু। রুচিরস্বের পুত্রের নাম পুথুসেনা, তাঁর পুত্র পরা এবং তাঁর পুত্র নিপ। নিপের একশো পুত্র ছিল। এদের মধ্যে প্রধান পুত্র সমর। সমর ছিলেন কাম্পিল্যের শাসনকর্তা। সমরের তিন পুত্র—পরা, সম্পরা এবং সদাস্ব। পরার পুত্র পৃথু। তাঁর পুত্র সুকৃতি এবং তাঁর পুত্র বিব্রত্র। বিব্রত্রর পুত্র অনুহ। অনুহ মুখর কন্যা কীর্তিকে বিয়ে করেন। মুখ ছিলেন ব্যাসের পুত্র। তিনি ব্রহ্মদত্তের কাছ থেকে তাকে পান। তাঁর পুত্র বিশ্বকসেনা, তাঁর পুত্র উদকসেনা এবং তার পুত্র ভল্লত।

দিভিমিধর পুত্র যাভিনর। তার পুত্র ধৃতিমত। ধৃতিমতের পুত্র সত্যধৃতি, তার পুত্র ধৃধনেমি, তার পুত্র সুপারস্ব, তার পুত্র সুমতি। সুমতির পুত্র সন্নতিমত, তার পুত্র কৃত। কৃতকে হিরণ্যভ যোগ দর্শন শিক্ষা দেন এবং তিনি পূর্বদেশীয় ব্রাহ্মণদের জন্য ২৪টি সংহিতা রচনা করেন। ঐ ব্রাহ্মণরা সামবেদ পাঠ করেন। কৃতর পুত্র উগ্রযুধ, তার পুত্র ক্ষেমৎ, তাঁর পুত্র সুবীর, তার পুত্র নৃপঞ্জয়, এবং তার পুত্র বহুরথ। এদেরকে পৌরভ বলা হত।

অজমিধর পত্নীর নাম ছিল নীলিনী। তাদের পুত্রের নাম নীল, নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি। তার পুত্র পুরঙ্গম, তার পুত্র চক্ষু এবং তার পুত্র হরশ্ব। হরশ্বের পাঁচ পুত্র—মুদগল, সৃঞ্জয়, বৃহদিশু, প্রবীর এবং কম্পিল। তাঁদের পিতা বললেন, 'আমার এই পাঁচ পুত্র দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম, সুতরাং তাদের নাম হোক পাঞ্চাল। মুদগল থেকে মৌদগল্য ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি। মুদগলের এক পুত্র। তার নাম বভস্ব। তার এক যমজ পুত্র কন্যা ছিল। তারা হলেন দিবদাস এবং অহল্যা। দিবদাসের পুত্র মিত্রায়ু, তার পুত্র চবন, তার পুত্র সুদাস, তার পুত্র সৌদাস। তাকে সহদেবও বলা হয়। তার পুত্র সোমক, সোমকের একশত পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল জন্তু এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম পৃশত। পৃশতের পুত্র দ্রুপদ, দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদুম্ন এবং তার পুত্র দৃষ্টকেতু।

অজমিধরের আর একটি পুত্র ছিল। তার নাম রিক্ষ, তার পুত্র সম্বরণ। তার পুত্র কুরু। কুরুর নামেই কুরুক্ষেত্র জেলার নামকরণ হয়েছে। কুরুর অনেকগুলি পুত্র ছিল। এদের মধ্যে দুজন হল সুধনুষ এবং পরীক্ষিৎ। সুধনুষের পুত্র সুহোত্র, তার পুত্র চবন, তার পুত্র কৃতক, তার পুত্র উপরিচরবসু। তার সাত পুত্র কন্যা ছিল। এরা হলেন বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশ্যম্ব, মাভেলা, মৎস্য প্রমুখ। বৃহদ্রথের পুত্রের নাম কুসগ্র, তার পুত্র ঋষভ, তার পুত্র পুষ্পবত, তার পুত্র সত্যদৃত, তার পুত্র সুধন্ব, তার পুত্র জন্তু। বৃহদ্রথের আর একটি পুত্র ছিল। দুটি অংশে তার জন্ম হয়। জরা নামে এক মহিলা ঐ দুটি অংশ একত্র করে, এবং তার নাম হয় জরাসন্ধ। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তার পুত্র সোমাপি, এবং তার পুত্র শ্রুতশ্রবা। এরা সব মগধের রাজা ছিলেন।

তিনজন সুদাসের বংশ তালিকা নীচে দেওয়া হল এতে প্রমাণ হবে সুদাস একজন ছিলেন না তিন ব্যক্তি ছিলেন :

ঋগ্বেদে সুদাস			বিষ্ণু পুরাণে সুদাস	
VII. ১৮.২২	VII. ১৮.২৩	VII. ১৮.২৫	সগর বংশে	পুরু বংশে
দেবব্রত	পৈজবন	দিওদাস	ঋতুপর্ণ	বাহভাশ্ব
↓	↓	↓	↓	↓
পৈজবন	সুদাস	পিজবন	সর্বকাম	দিবদাস
↓		↓	↓	↓
সুদাস		সুদাস	সুদাস	মিত্রায়ু
				↓
			সৌদাস	চ্যবন
			↓	↓
			মিত্রসহা	সুদাস
				↓
				সৌদাস
				↓
				সোমক

এই তালিকা থেকে দুটি বিষয় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। প্রথমত বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত সুদাস এবং ঋগ্বেদে উল্লিখিত সুদাস—এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত মহাভারতে উল্লিখিত পৈজবনের সঙ্গে পুরাকালে বসবাসকারী কোনও লোককে যদি চিহ্নিত করা যায়, তাহলে তা সম্ভব একমাত্র ঋগ্বেদে উল্লিখিত

সুদাসের সঙ্গে। সুদাসকেই পৈজবন বলা হত কারণ তিনি ছিলেন পিজাবনের পুত্র এবং পৈজবনের আর এক নাম দিবদাস।[১০]

সৌভাগ্যক্রমে আমার সিদ্ধান্ত এবং অধ্যাপক ওয়েবার-এর সিদ্ধান্ত একই। মহাভারতের শান্তিপর্বের যে অনুচ্ছেদের ওপর আমার গবেষণা সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ওয়েবার বলেছেন :

'এখানে খুব স্মরণীয় ঐতিহ্যের কথা লেখা আছে যে পৈজাবন অর্থাৎ সুদাস এতই বিখ্যাত ছিলেন তাঁর দানকর্মের জন্য এবং ঋগ্বেদে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি ছিলেন বিশ্বামিত্রের রক্ষক এবং বশিষ্ঠের শত্রু এবং তিনি ছিলেন একজন শূদ্র।'

অধ্যাপক ওয়েবার দুর্ভাগ্যক্রমে এই অনুচ্ছেদটির গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। এটি অবশ্য আর একটি বিষয়। আমার জন্য এটিই যথেষ্ট যে মহাভারতের পৈজাবন এবং ঋগ্বেদের সুদাস যে একই ব্যক্তি, তা তিনি চিহ্নিত করেছেন।

তিন

আমরা এই সুদাস বা পৈজাবন সম্পর্কে কি জানি? তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাওয়া গেছে :

(১) সুদাস দাসও ছিলেন না আর্যও ছিলেন না। দাস এবং আর্যরা ছিল পরস্পরের শত্রু[১১]। এর অর্থ, এরা ছিলেন বৈদিক আর্য।

(২) সুদাসের পিতা ছিলেন দিওদাস। সম্ভবত তিনি ভধ্রথাস্বর[১২] দত্তক পুত্র ছিলেন। দিবদাস ছিলেন একজন রাজা। তুর্বস[১৩] এবং যদুদের[১৪] বিরুদ্ধে তিনি বহু

১০. ঋগ্বেদে সুদাসের বংশ পরিচয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে, যাতে দিওদাস এবং দিবদাস নিয়ে রয়েছে সংশয়। অধ্যায় ২২, ২৩ এবং ২৫-এর পাঠান্তর রয়েছে এবং কেউ তা নিয়ে গুরুত্ব দিতে চায়নি। চিত্রব শাস্ত্রী তাঁর ঋগ্বেদে 'পিজবন' লিখে গেছেন। সতবালেকর সর্বত্র উল্লেখ করেছেন 'পৈজবন'। উইলসন ২২ এবং ২৩ অধ্যায়ে লিখেছেন 'পৈজবন' এবং ২৫ অধ্যায়ে লিখেছেন 'পিজবন'। যাস্ক-এর নিরুক্তে আছে 'পৈজবন'। উইলসনের ২৫ অধ্যায় অনুসরণ করলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। 'পিজবন'-এর অন্য নাম 'দিওদাস' এবং পৈজবন-এর অন্য নাম 'সুদাস' হতে পারে।

১১. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড I. পৃ : ৩৬৬

১২. তদেব, খণ্ড VII. ৮৩.১

১৩. তদেব IX. ৬১.২

১৪. তদেব, খণ্ড VI. ৬১.১; খণ্ড VII. ১৯.৮

যুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া শম্বর[১৫], পরব, করঞ্জ[১৬] এবং গুংগুদের[১৭] বিরুদ্ধেও তিনি অনেক যুদ্ধ করেন। তুর্যবন[১৮] এবং দিওদাস ও তার মিত্রদের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। এই মিত্ররা হল আয়ু এবং কুৎসা। এই যুদ্ধে তুর্যবন জয়ী হন।

মনে করা হয় কোনও এক সময় ইন্দ্র তার বিরুদ্ধে ছিলেন বিশেষ করে তুর্যবনের সঙ্গে যুদ্ধে। তাঁর পুরোহিত ছিলেন ভরদ্বাজ। তাঁকে দিওদাস অনেক দানধ্যান করেন। সম্ভবত ভরদ্বাজ বিশ্বাসঘাতকতা করে দিবদাসের বিরুদ্ধে গিয়ে তুর্যবনের পক্ষে যোগ দেন।

সুদাসের মায়ের কোন উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু সুদাসের পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর পত্নীর নাম সুদেবী[১৯]। কথিত আছে অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় সুদেবীকে সুদাসের জন্য সংগ্রহ্ করেন।

(৩) সুদাস রাজা হলেন। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সুদাসের রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন করেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এমন রাজাদের উল্লেখ রয়েছে যাদের মহাভিষেক উৎসব হয় এবং যে পুরোহিতগণ ঐ মহাভিষেক উৎসব সম্পন্ন করেন তাদের নামও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রয়েছে।[২০]

'মনুর পুত্র শার্যতের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ভৃগুর পুত্র চ্যবন। তারপর শার্যাতি বিশ্বজয়ে বের হন এবং যজ্ঞের অশ্ব উৎসর্গ করেন। দেবতাদের দ্বারা যজ্ঞের উৎসর্গের সময় চ্যবন উপস্থিত ছিলেন।'

'বাজরত্নের পুত্র সামসুষম সত্রাজিতের পুত্র শাতনিকের অভিষেক উদ্বোধন করেন। তারপর শাতনিক পৃথিবী জয়ে বের হয়ে তার শেষ পর্যন্ত যান। পরে যজ্ঞের অশ্ব উৎসর্গ করেন।'

'অম্বাষ্টয় অভিষেক উদ্বোধন করেন পার্বত এবং নারদ। এরপর অম্বাষ্টয় পৃথিবী জয় করতে বের হন এবং যজ্ঞের অশ্ব উৎসর্গ করেন।'

১৫. তদেব, খণ্ড ১, ১৩০.৭
১৬. তদেব, খণ্ড ১, ৫৩.১০
১৭. তদেব, ১০.৪৮
১৮. তদেব, ১, ৫৩.৮; ৬, ১৮.১৩
১৯. তদেব, ১, ১১৬.১৮
২০. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মার্টিল হোগ, খণ্ড ২, পৃ : ৫২৩-৫২৪

'পার্বত এবং নারদ মুনি যুদ্ধমশ্রৌষ্ঠির অভিষেক সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন উগ্রসেনের পুত্র। পরে তিনি বিশ্বজয়ে বের হন এবং যজ্ঞের অশ্ব উৎসর্গ করেন।'

'ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মার অভিষেক সম্পন্ন করেন কশ্যপ। পরে তিনি পৃথিবী জয়ে বের হন এবং যজ্ঞের অশ্ব উৎসর্গ করেন।'

'বলা হয়ে থাকে পৃথিবী বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে বন্দনা করে বলেন, কোনও পার্থিব বস্তু আমার দান নয়। হে বিশ্বকর্মা[২১] তুমি আমাকে দিয়েছ সুতরাং আমি সমুদ্রের মধ্যে ডুব দেব। কশ্যপের কাছে তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ।'

'পিজবনের পুত্র সুদাসের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন করেন বশিষ্ঠ। তারপর সুদাস পৃথিবী জয়ে বের হন এবং যজ্ঞের অশ্ব উৎসর্গ করেন।'

'অভিক্ষিতের পুত্র মরুতের অভিষেক সম্পন্ন করেন অঙ্গিরার পুত্র সম্বর্ত। তার পর মরুত পৃথিবী জয়ে বের হন এবং যজ্ঞের অশ্ব উৎসর্গ করেন।'

'এই তালিকায় সুদাসের বিশেষ উল্লেখ আছে এবং তার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করে বশিষ্ঠ।'

সুদাস দশ রাজার মধ্যে বিখ্যাত বীর ছিলেন। ঋগ্বেদে এই দশ রাজার যুদ্ধের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের বিভিন্ন সূক্তয় এই বিখ্যাত যুদ্ধের উল্লেখ আছে।

সূক্ত ৮৩-তে বলা হয়েছে :

(৪) 'ইন্দ্র এবং বরুণ আপনারা সুদাসকে রক্ষা করেছেন। আপনাদের মারাত্মক সব অস্ত্র দ্বারা তাঁকে অনাক্রম্য করে তুলেছেন। যুদ্ধের সময় এই তিনজনের প্রার্থনার কথা শুনুন যাতে আমার যাজকত্ব ফলপ্রসূ হতে পারে।'

(৫) 'সুদাস এবং ত্রিস্তু (Tritsus) উভয়ই আপনাদের স্মরণ করেন। তাঁরা আপনাদের স্মরণ করেন যুদ্ধে ধনসম্পদ লাভ করার জন্য। দশজন রাজার আক্রমণ থেকে আপনারা সুদাসকে এবং ত্রিস্তুকে রক্ষা করেন।'

(৬) 'ঐ দশ অধার্মিক রাজা সংঘবদ্ধ হয়েও জয়ী হতে পারেননি। ইন্দ্র ও বরুণ এবং সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা হেরে যান। উৎসর্গের জন্য যে খাদ্যবস্তু দেওয়া হয়েছিল তা ফলপ্রসূ। দেবতারা ঐ উৎসর্গের সময় উপস্থিত ছিলেন।'

---

২১. রাজা তাঁর পুরোহিতকে সম্পূর্ণ পৃথিবী দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

(৭) 'আপনাদের মধ্যে একজন যুদ্ধে শত্রুদের ধ্বংস করেন। অন্যরা ধর্মকে রক্ষা করেন। আপনাদের আমরা স্মরণ করি। হে ইন্দ্র ও বরুণ আপনাদের দানের ভাণ্ডার আমাদের ওপর বর্ষিত হোক।'

সূক্ত ৩৩-এ বলা হয়েছে :

(২) 'পশদ্যুম্নকে পরাজিত করে তারা ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞস্থল থেকে সোমরস নিয়ে আসে। ভয়তর পুত্র পশদ্যুম্নর কাছ থেকে ইন্দ্র সুদাস এবং বশিষ্টের জন্যও সোমরস নিয়ে আসেন।'

(৩) একইভাবে আপনাদের কৃপায় সুদাস সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন এবং একইভাবে আপনাদের দয়ায় সুদাস তাঁর শত্রুদের বধ করেন। ঐ একইভাবে বশিষ্টর প্রার্থনার দ্বারা ইন্দ্র দশ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে সুদাসকে রক্ষা করেন। দশ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করে বশিষ্ঠ ইন্দ্রকে সূর্যের মতো উজ্জ্বল করে তুললেন। ইন্দ্র বশিষ্টের এই স্তুতি শ্রবণ করে তাকে এক বিরাট অঞ্চল দান করলেন।'

সূক্ত ১৯-এ বলা হয়েছে :

(৩) 'অকুতোভয় ইন্দ্র সুদাসকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। সুদাসের উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্যে সন্তুষ্ট হয়ে তুমি তাঁকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথিবী জয়ে রক্ষা করেছ। পুরু এবং পুরুকুস্তর পুত্র ত্রাসদস্যু (Trasadasyu)।

(৪) 'হে ইন্দ্র, তুমি দাতা, তুমি পূজার নৈবেদ্য গ্রহণকারী সুদাসের প্রতি তোমার অসীম অনুগ্রহ। তুমি দাতা, তোমার দয়ার দান বৃদ্ধি কর, তোমার জন্য তোমার অসীম শক্তির কাছে আমাদের প্রার্থনা যেন তা তোমার কাছে পৌঁছায়। তোমার নামে কত না ক্রিয়াকর্ম উৎসর্গ করা হয়।

সপ্তম মণ্ডলের ১৮ সূক্ততে বলা হয়েছে :

(৫) 'ইন্দ্র পরুশনির গভীর জল সুদাসের হেঁটে পার হওয়ার জন্য অগভীর করে দিলেন এবং তারপর ঐ জলরাশিকে অভিশপ্ত করে নদী সঙ্গমে পরিণত করলেন।'

(৬) 'তুর্বস যজ্ঞ করে সুদাসের কাছে ধনসম্পদের জন্য গেলেন কিন্তু মৎস্যের মত দ্রুতবেগে ভৃগু এবং দ্রুহ্যসকে আক্রমণ করলেন। তারা সর্বত্র গমনকারী ইন্দ্রের

বন্ধু সুদাসকে রক্ষা করলেন।'

(৭) 'যাঁরা নৈবেদ্য রচনা করেন, যাঁরা প্রায়শ্চিত্ত থেকে বিরত থাকেন, যাঁরা শিঙ্গা বহন করেন এবং যাঁরা যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করেন তাঁরা ইন্দ্রের স্তুতি করেন, যে ইন্দ্র লুণ্ঠণকারীদের হাত থেকে আর্যদের গরু উদ্ধার করেছিলেন এবং যিনি যুদ্ধে শত্রুদের বধ করেছিলেন।'

(৮) 'সুদাসের দুর্মতি এবং মূর্খ শত্রুরা পারুশনি নদী পার হতে গিয়ে তার পাড় ভেঙে ফেলল। কিন্তু ইন্দ্র তার শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করলেন। তিনি চমনের পুত্র কবিকেও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন।'

(৯) 'জলরাশি তার নির্দিষ্ট পথ ধরে পারুশনি নদীতে গিয়ে পড়ল। তার বাইরে গেল না। নদীর দ্রুতগতি সুগম স্থানে গিয়ে পৌঁছাল। ইন্দ্র আলাপচারিতায় রত শত্রু এবং তার সঙ্গীদের সুদাসের বশীভূত করলেন।'

(১০) 'পৃশ্নী পাঠিয়ে দিলেন রঙিন পশু। মরুতগণ তাদের পিঠে চড়ে তাদের বন্ধু ইন্দ্রকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ছুটে এলেন। চারণভূমি থেকে যেমন কোনও রাখাল ছাড়া পশু ছুটে আসে তেমনি অন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে দ্রুতবেগে ছুটে এল।'

(১১) 'বীর ইন্দ্র রাজার সাহায্যের জন্য মরুতদের সৃষ্টি করলেন। মরুতগণ যশের আশায় পারুশনি নদীর তীরে শত্রুদের এমনভাবে হত্যা করলেন যেন একজন পুরোহিত যজ্ঞকুণ্ডে পবিত্র ঘাস ছুঁড়ে দিচ্ছেন।'

(১২) 'বজ্রবহনকারী হে ইন্দ্র তুমি শ্রুত, কবশ, বৃদ্ধ এবং তারপর দ্রুহ্যকে জলে নিমজ্জিত করলে। তোমার প্রতি যারা অনুরক্ত, তোমার যারা স্তুতি করে এবং যারা তোমার বন্ধুত্ব চায় তাদের জন্য তুমি একাজ করেছ।'

(১৩) 'ইন্দ্র তার শক্তির দ্বারা তাদের সব শক্ত ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করলেন এবং তাদের সাতটি শহর গুঁড়িয়ে দিলেন। ইন্দ্র অনুর পুত্রের বাসগৃহ তৃতসুকে দিলেন। আমরা ঐ রাজাদের বিরুদ্ধে জয়ী ইন্দ্রের কথা বলি।'

(১৪) 'অনু এবং দ্রুহ্যর যোদ্ধারা গরুগুলি নিয়ে আসার চেষ্টা করলে ৬৬ হাজার ৬৬০টি ধ্বংস হয়ে যায়। ইন্দ্র এ সবই তোমার কাজ।'

(১৫) 'বিদ্রোহী তৃতসুগণ ইন্দ্রের সঙ্গে অজ্ঞানতাবশতঃ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পালিয়ে

গেল এবং অনেকে ধ্বংস হয়ে গেল। তারা সব সম্পদ সুদাসের জন্য রেখে গেল।'

(১৬) 'ইন্দ্র সুদাসের শত্রুদের খোঁজে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লেন। ইন্দ্র ভয়ঙ্কর শত্রুদের দমন করলেন এবং সুদাসের দিকে তাদের অগ্রগতি রূদ্ধ করে দিলেন।'

(১৭) 'ইন্দ্র একজন দরিদ্র মানুষের জন্য মূল্যবান দান প্রদান করলেন। লোকটি একটি ছাগলের সাহায্যে একটি বৃদ্ধ সিংহকে বধ করেছিল। সে একটি সুঁচের সাহায্যে তাকে কোণাকুণিভাবে কেটে যজ্ঞে উৎসর্গ করে। সে তার সব অর্জিত দ্রব্য সুদাসের জন্য দিয়েছিল।'

(১৮) 'হে ইন্দ্র তোমার অসংখ্য শত্রু পরাভূত হয়েছে। এই শত্রুদের মধ্যে রয়েছে পরাক্রমশালী ভেদ। তোমার যারা স্তুতি করে সে তাদের বন্দী করে। তোমার তীক্ষ্ম বজ্রের আঘাতে সে ধ্বংস হয়েছে।'

(১৯) 'যমুনা এবং তৃতসু নদীর তীরে বসবাসকারী মানুষরা ভেদকে হত্যা করার পর তোমার স্তব করে। অজ শিগ্রু এবং যক্ষরা তাকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে। যুদ্ধে নিহত অশ্বের মাথাগুলি তারা উৎসর্গ করে।'

(২০) 'হে ইন্দ্র তোমার অনুগ্রহে এবং তোমার দান গুনে শেষ করা যায় না। তুমি মান্যমনের পুত্র দেবককে হত্যা করেছ এবং বিরাট পর্বত থেকে তুমি শাম্বরকে নিক্ষেপ করেছ।'

সুদাসের বিরুদ্ধে যে সব রাজা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা হলেন[২২], (১) শিন্যু, (২) তুর্বস, (৩) দ্রুহু, (৪) কবশ, (৫) পুরু, (৬) অনু, (৭) ভেদ, (৮) শম্বর, (৯) বৈকর্ণ, (১০) অন্য বৈকর্ণ, (১১) যদু, (১২) মৎস্য, (১৩) পক্‌থ (১৪) ভালনা, (১৫) অলীন, (১৬) বিশনীন, (১৭) অজ, (১৮) শিব, (১৯) শিগ্রু, (২০) যক্ষু, (২১) যুদ্ধমদি, (২২) যাদ্ব, (২৩) দেবক মান্যমন, (২৪) চামন কবি, (২৫) সুতুক, (২৬) উছথ, (২৭) শ্রুত, (২৮) বৃদ্ধ, (২৯) মন্যু এবং (৩০) পৃথু।

এটা পরিষ্কার যুদ্ধ বলতে যা বুঝায়, এই যুদ্ধ ছিল তার থেকে অনেক বড় আকারের এবং ব্যাপক। ইন্দো-আর্য ইতিহাসে এই যুদ্ধ ছিল এক বড় ঘটনা। যুদ্ধে

২২. চিত্রব শাস্ত্রীর 'প্রাচী চরিত্র কোষ' থেকে এই তালিকা নেওয়া হয়েছে। পৃ : ৬২৪। এই তালিকার সকলেই রাজা ছিলেন কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সায়নাচার্যের মতে ১৩-১৬ পুরোহিতের নাম। এ সংশয় রয়েছে ২৭-২৯ সম্পর্কেও।

জয়ী হয়ে সুদাস যে বিরাট বীরের মর্যাদা পেয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কি কারণে যে এই যুদ্ধ হয়েছিল তা সঠিক আমরা জানি না। ঋগ্বেদে অবশ্য এব্যাপারে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের vii. ৮৩.৭-এ বলা হয়েছে, যেসব রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন অধার্মিক। এতে মনে হয় এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি ধর্মযুদ্ধ।

(৮) সায়নাচার্য ঐতিহ্য অনুযায়ী ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত স্তোত্রের উল্লেখ করেছেন। নিম্নলিখিত রাজারা ঋষিদের জন্য ঐ সব স্তোত্র তৈরি করেন :

'বিতহব্য অথবা ভরদ্বাজ x. ৯, অম্বরীশের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ অথবা ত্রিশিরার পুত্র তৃশতৃ, x. ৭৫ প্রিয়মেধার পুত্র সিন্ধুক্ষিত, x. ১৩৩ পিজবনের পুত্র সুদাস, x. ১৩৪ যুবনাশ্বের পুত্র মন্ধ্যাত্রি, x. ১৭৯ উশিনরের পুত্র শিবি, কাশীর রাজা দিবদাসের পুত্র প্রতার্ধন এবং রোহিদাস্বের পুত্র বসুমন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে সুদাসকে বেদের স্তোত্রের রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। ঋগ্বেদের তিন এর ৫৩তে এর উল্লেখ আছে।

(৯) 'মহান ঋষি বিশ্বামিত্র যিনি ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের নেতাস্বরূপ, যিনি দেবতাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি দেবদেবীদের আকর্ষণে সুদাস এবং ইন্দ্রের সঙ্গে কুশিকের জন্য জলের গতিবেগ রুদ্ধ করলেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করলেন।'

(১১) 'সুদাসের অশ্ব কুশিকের সমীপবর্তী হও, তাকে প্ররোচিত কর, এবং তার লাগাম আলগা করে দাও, যাতে সে দেবতাদের রাজা সুদাসের জন্য ধনসম্পদ নিয়ে আসতে পারে। ঐ অশ্ব পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তরে বৃত্রকে হত্যা করেছে। সুতরাং সুদাস ঐ অশ্বের জন্য পূজা দিন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঞ্চলে তার পূজা করুন।'

vi. ব্রাহ্মণদের প্রতি দানধ্যানের জন্য সুদাস বিখ্যাত ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁকে মহান দাতা হিসেবে অতিথিজ্ঞ বলে সম্বোধন করতেন। ব্রাহ্মণরা কীভাবে তার বন্দনা করতেন ঋগ্বেদে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

i. ৪৭.৬, 'হে প্রেরণাদায়ক অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়, তোমাদের ভাণ্ডারে যত ঐশ্বর্য, আছে তা দান করে সুদাসের শক্তি বৃদ্ধি কর। লোভনীয় সব ধনসম্পদ সমুদ্র অথবা আকাশ থেকে প্রেরণ কর।'

i. ৬৩.৭ 'হে বজ্রের মত শক্তিশালী ইন্দ্র তুমি যুদ্ধ করে পুরুকুৎশর সাতটি নগর বন্ধ করে দাও। হে দেবরাজ ইন্দ্র তুমি সুদাসের ওপর থেকে বিপদ আপদ তৃণের মতো উড়িয়ে দাও এবং পুরুকে ধনদান কর।'

i. ১১২.১৯ 'হে অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়, তোমরা বল প্রদানকারী শক্তি দিয়ে সুদাসের জন্য ক্ষমতা দান কর।'

vii. ১৯.৩ 'হে ভয়ঙ্কর ইন্দ্র, তুমি সুদাসকে রক্ষা করেছ, সুদাস ভক্তিভরে সব রকম নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছেন। তুমি পুরুকুৎশ এবং পুরুর পুত্র ত্রাসদসুর জন্য দেশজয় নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছ এবং তার শত্রুদের বধ করার জন্য চিহ্নিত করেছ।'

vii. ২০.২ 'ইন্দ্র মহাপরাক্রমশালী হয়ে বৃত্রকে সংহার করলেন। তিনি বীর, যে তাঁর স্তব করে তিনি তাকে রক্ষা করেন। তিনি সুদাসের জন্য দান-ধ্যানের পথ প্রশস্ত করেন। যারা তাঁর পূজা করে, তিনি তাদের অনুগ্রহ করেন।'

vii. ২৫.৩ 'সুদাসের শত বিপদ তুমি উদ্ধার করেছ, তাকে প্রভূত ধন সম্পদ দান কর, হত্যাকারীদের অস্ত্র তুমি ধ্বংস কর, তুমি আমাদের যশ ও অর্থ দান কর।'

vii. ৩২.১০ ' সুদাসের রথের গতি কেউ থামাতে বা বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। তাকে ইন্দ্র এবং মরুতগণ রক্ষা করেন, চারণভূমিতে পশুদের ভিতর তিনি ধাবমান হন।'

vii. ৫৩.৩ 'এবং হে স্বর্গ মর্ত্য, সুদাসের জন্য তোমাদের প্রচুর ধন সম্পদ আছে।'

vii. ৬০.৮ 'অদিতি, মিত্র এবং বরুণ সুদাসের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তাকে সন্তান দান করেন। হে শক্তিশালী দেবদেবী আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যেন কোনও অপরাধ না করি। আর্যরা যেন শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পায়। হে দেবতা তুমি সুদাসের জন্য একটি বিরাট ভূখণ্ড দান কর।'

ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত পৈজবনের এই হল জীবনী। অত্যন্ত নির্ভর যোগ্য সূত্র ঋগ্বেদ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ঋগ্বেদ থেকে আমরা জানতে পারি তার আসল নাম ছিল সুদাস, এবং তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়েরও অধিক। তিনি এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন।

এখানে মহাভারত তাঁর সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য জোগায়। তিনি ছিলেন একজন শূদ্র। একজন শূদ্র আর্য হবে, একজন শূদ্র ক্ষত্রিয় হবে, এর থেকে কি আর বিস্ময়ের হতে পারে? এর থেকে কি আর বিপ্লবাত্মক হতে পারে?

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনার পর জীবনীসংক্রান্ত এই গবেষণার উপসংহার টানা যেতে পারে। সুদাস কি আর্য ছিলেন? সুদাস যদি আর্য হন তাহলে তিনি কোন জাতিভুক্ত ছিলেন? আর সুদাস যদি শূদ্র হন তাহলে শূদ্র বলতে কি বুঝায়?

আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন ধরেই আলোচনা করি। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা ঋগ্বেদের কিছু প্রসঙ্গের সাহায্য নিতে পারি। ঋগ্বেদের অনেকগুলি জাতি গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে প্রধান হল তৃৎসু, ভরত, তুর্বষ, দ্রহয়ু, যদু, পুরু এবং অনু। কিন্তু ঋগ্বেদে যে উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায় মাত্র এদের তিনটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সুদাস যুক্ত। এগুলি হল পুরু, তৃৎসু এবং ভরত। এই তিনের মধ্যেই আমাদের সীমিত থাকা ভাল এবং যদি সম্ভব হয় তিনি এই তিনটি জাতির কোনটির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ঋগ্বেদে সুদাস ও তৃৎসুর মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনার জন্য যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ রয়েছে তা হল : i. ৬৩.৭; i. ১৩০.৭; vii. ১৮.১৫; vii. ৩৩.৫৩; vii. ৩৩.৬ এবং vii. ৮৩.৪,৬।

ঋগ্বেদের i. ৬৩.৭ এ দিবদাসকে পুরুর রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং i. ১৩০.৭ দিবদাসকে পৌরব বলা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি ছিলেন পুরু দেশীয়।

ঋগ্বেদের vii. ১৮.১৫ এবং vii. ৮৩.৫ এ বলা হয়েছে সুদাস তৃৎসু ছিলেন না। প্রথম অংশে বলা হয়েছে সুদাস তৃৎসুদের শিবির লুণ্ঠন করে তাদের সব ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, দশ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুদাস এবং তৃৎসুরা একপক্ষে ছিলেন, কিন্তু তাদের আলাদা করে দেখান হয়েছে। ঋগ্বেদের vii. ৩৫.৫ এবং vii. ৮৩.৪ এ সুদাসকে পুরোপুরি তৃৎসুদের সঙ্গে এক করে দেখান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম সুদাস তৃৎসুদের রাজা ছিলেন।

তৃৎসু এবং ভরতের এবং তাদের সঙ্গে সুদাসের সম্পর্কের প্রশ্নে ঋগ্বেদের vii. ৩৩.৬ এবং v. ১৬.৪,৬,১৯ এ কিছু উল্লেখ রয়েছে। প্রথম অংশের মতে তৃৎসু এবং ভরতরা এক-ই। দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা হল, সুদাসের পিতা দিবদাস ভরতের পরিবারভুক্ত ছিলেন।

এসব থেকে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার যে হয় পুরু, তৃৎসু এবং ভরত এক-ই

জাতির বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অথবা তারা আলাদা জাতিভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তারা এক জাতিভুক্ত হয়ে যান। এটি অসম্ভব নাও হতে পারে। এখন একমাত্র প্রশ্ন হল, তাদের যদি আলাদা ধরে নেওয়া হয়, তাহলে সুদাস কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন? পুরু, তৃৎসু অথবা ভরত কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন তিনি? দিবদাসের সঙ্গে পুরু এবং ভরতের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে মনে হয় এটা স্বাভাবিক যে সুদাস হয় পুরু নয় ভরতের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। তবে কোন্‌টি সঠিক তা বলা শক্ত। সুদাস পুরু গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কি না তা জানা না গেলেও এটি পরিষ্কার, সুদাস ভরত গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। সুদাসের পিতা দিবদাস সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, তিনি ছিলেন ভরত গোষ্ঠীভুক্ত। এখন প্রশ্ন হল এই ভরতরা কারা? তারা কি সেই লোক যাদের নামে ভারতভূমির নামকরণ হয়েছে অথবা ভারতবর্ষ হয়েছে। এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ অধিকাংশ লোক-ই প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত নন। হিন্দুরা যখন ভরত সম্পর্কে বলে, তখন তাদের মনে থাকে দুষ্যন্তি ভরতের কথা যে ভরত দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাজাত এবং যিনি যুদ্ধ করেছিলেন। একথা মহাভারতে বর্ণিত আছে। তারা শুধু যে অন্য কোন ভরতের কথা জানে না তাই শুধু নয়, তারা একান্তভাবেই বিশ্বাস করে যে দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের নামেই ভারতবর্ষের নামকরণ হয়েছে।

'ভরত ছিলেন দুজন এবং তারা ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। এক ভরতের গোষ্ঠী হল ঋগ্বেদে বর্ণিত ভরতের গোষ্ঠী। এই ভরত মনুর অধস্তন পুরুষ এবং সুদাস এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অন্য ভরত হলেন দুষ্যন্ত ভরত। এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারতবর্ষের নাম যদি ভরতের নামেই হয়ে থাকে, তাহলে তা হয়েছে ঋগ্বেদে বর্ণিত ভরতের নামানুসারে, দুষ্যন্ত ভরতের নামে নয়। ভার্গব পুরাণের[২৩] নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে:

प्रियंवदो नाम सुतो मनोः स्वायंभुवस्य ह।
तस्याग्नीध्रस्ततो नाभिर्ऋषभश्च सुतस्ततः॥
अवतीर्ण पुत्रशतं तस्यासीद्ब्रह्मपारगम्।
तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः।
विख्यातं वर्षमेतद्यन्नाम्ना भारतमुत्तमम्॥

২৩. 'বৈদ্য মহাভারত'-এর উপসংহারে উদ্ধৃত।

অর্থাৎ স্বয়ম্ভুর পুত্র মনুর প্রিয়ম্বদ নামে একটি পুত্র ছিল। তাঁর পুত্রের নাম অগ্নিধ্র, তাঁর পুত্র নাভি এবং নাভির পুত্র ঋষভ। ঋষভের একশত পুত্র ছিল। তাঁরা সবাই বেদ অধ্যয়ন করেন। ভরত ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি নারায়ণের ভক্ত ছিলেন। এই ভরতের নামানুযায়েই এই সুন্দর দেশের নাম হয়েছে ভারত।'

এতেই প্রমাণ করে শূদ্র সুদাস কোন বিখ্যাত ধারার রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এর পরের কাজ হল সুদাস আর্য ছিলেন কি না তা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো। ভরত অবশ্যই আর্যবংশীয় ছিলেন, সুতরাং সুদাসও আর্য ছিলেন। ঋগ্বেদের vii. ১৮.৭ এ উল্লেখ রয়েছে এবং তৃৎসুসের সঙ্গে যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে তাতে অবশ্য সুদাস আর্য ছিলেন কি না তাতে সংশয় জাগে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ইন্দ্র তৃৎসুদের হাত থেকে আর্যদের গরু উদ্ধার করেছিলেন এবং তৃৎসুকে বধ করেছিলেন। এতে মনে হয় তৃৎসুরা আর্যদের শত্রু ছিলেন। তৃৎসুদের যে অনার্য হিসাবে দেখান হয়েছে তাতে গ্রিসফিট (Grisfits) খুব সংশয় বোধ করেছেন। এই অনুচ্ছেদের আক্ষরিক অনুবাদের জন্যই এটি হয়েছে এবং বিষয়টি এড়ানোর জন্য তিনি গরু বলতে সাথী[২৪] বুঝাতে চেয়েছেন, এর অবশ্য কোনও প্রয়োজন ছিল না। যদি কারও স্মরণ হত যে ঋগ্বেদে দুই ধরনের আর্যের কাহিনীর উল্লেখ আছে। তবে তাদের গোষ্ঠী ও ধর্ম এক ছিল কি না তা অবশ্য বলা শক্ত। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, এই অনুচ্ছেদের অর্থ এই যে যখন এটি রচিত হয়েছিল তখন তৃৎসুরা আর্য হয়নি। অতএব একথা অবিতর্কিতভাবে বলা যেতে পারে যে, ভরত বা তৃৎসু এদের মধ্যে সুদাস যে গোষ্ঠীভুক্তই হন না কেন, তিনি ছিলেন আর্য।

শেষ প্রশ্নটি হচ্ছে শূদ্র সংক্রান্ত। বিষয়টির গুরুত্ব কোনও অংশেই কম নয়। শূদ্র শব্দটি কি অর্থ বহন করে? সুদাস শূদ্র ছিলেন—এই বিষয়টি আবিষ্কার হওয়ার পর শূদ্র শব্দের অর্থই পুরোপুরি বদলে গেছে। যারা প্রাচীনপন্থী এবং যাদের কাছে শূদ্র শব্দটিতে শুধুমাত্র ভৃত্য এবং আদিম অধিবাসীদের বুঝায় এই নতুন আবিষ্কার তাদের কাছে এক বিরাট বিস্ময় এবং এ সম্পর্কে তাদের পুরনো ধ্যানধারণা এবং গবেষণা বলতে গেলে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্যও কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। কারণ, বৈদিক আর্যদের সামাজিক গঠন সম্পর্কে এখনও অনেক গবেষণা বাকি। আমরা আদিম সমাজ সম্পর্কে গবেষণার মাধ্যমে যা জানি তা হল, আর্যরা

---

২৪. তাঁর অনুবাদটি ছিল এই রকম : তবু তৃৎসুর কাছে এলেন আর্য সাথী ....

দলে বিভক্ত ছিল এবং তারা কাজকর্মও করত দলগতভাবে। এই দলগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের। তারা ছিল গোষ্ঠী, দল, উপজাতি প্রভৃতিতে বিভক্ত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উপজাতিই হল প্রাথমিক একক, কোনও ক্ষেত্রে গোষ্ঠী আবার কোনও ক্ষেত্রে সৌভ্রাতৃত্বমূলক কোনও কোনও ক্ষেত্রে উপজাতি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও গোষ্ঠীই নেই। সেখানে কোনও গোষ্ঠী ছাড়াই উপজাতির অস্তিত্ব।

একই পূর্বপুরুষের অধস্তন লোকজন একটি গোষ্ঠীতে সমবেত হয়। তাদের মধ্যে একই পরিবারের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। গোষ্ঠীগুলি একই ধরনের সামাজিক এবং আনুষাঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বড় বড় একক হিসাবে যুক্ত হয় এবং এগুলিকে সৌভ্রাতৃত্বমূলক গোষ্ঠী বলা হয়, এর মধ্যেকার বন্ধন আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যায় এবং তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা গৌণ হয়ে একটা ভ্রাতৃত্বসুলভ বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। সৌভ্রাতৃত্বমূলক তখন পরিণত হয় ক্ষুদ্র সমুদায় এবং সেখানে প্রতি গোষ্ঠীই যে কোনও দুটি বড় ইউনিটের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ক্ষুদ্র সমুদায় কোনও প্রকার বিভাজন না থাকতে পারে। অর্থাৎ পুরো গোষ্ঠীই দুটি অংশে বিভক্ত হতে পারে। এইসব সংগঠন তা যে গোষ্ঠী হোক আর উপজাতি যাই হোক না কেন, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক জ্ঞাতি সূত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে। সন্দেহ নেই বৈদিক আর্যদের এই ধরনের সামাজিক সংগঠন ছিল। তাতে তাদের পরিভাষা থেকেই সুস্পষ্ট বোঝা যায়। অধ্যাপক সনাত[২৫] এ সম্পর্কে বলেছেন:

'বৈদিক স্তোত্রগুলিতে সামাজিক ও বাহ্যিক জীবনযাপন সম্পর্কে ধারণা খুবই অস্পষ্ট। আমরা সেখানে দেখতে পাই আর্য জনসংখ্যায় কয়েকটি ক্ষুদ্র উপজাতিতে বিভক্ত ছিল, এবং ঐ উপজাতিগুলি আবার বিভক্ত ছিল গোষ্ঠীতে। ঐ গোষ্ঠীগুলি আবার জ্ঞাতিসূত্রে যুক্ত ছিল। এক এক গোষ্ঠীতে ছিল কয়েকটি করে পরিবার। ঋগ্বেদের পরিভাষায় এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু এ সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। স্বজাতি অর্থাৎ জ্ঞাতি অথবা জাতির মধ্যে সহযোগীরা সম্ভবত অথর্ববেদে গোষ্ঠীর মধ্যে সমগোত্রীয় লোক বুঝায়। এর বিশেষ গুরুত্বও রয়েছে। এতে আমাদের মনে করিয়ে দেয়, উপজাতির সমতুল জন্তু, জাতি অথবা বর্ণের কথা। বিভিন্ন ধরনের নাম যেমন ব্র, বৃজন, ব্রজ, ব্রত, প্রভৃতি প্রতিশব্দ বা উপজাতি অথবা গোষ্ঠীর বিভাজন মনে হতে পারে। আর্য জনজাতিরা যে যুগে বাস করত

---

২৫. কাস্টস্ ইন ইন্ডিয়া, এমিল সেনতি, পৃ : ১৯২

সেই সময়কার স্তোত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। আর্য জনজাতিদের মধ্যে সেই সময় প্রথা অনুসারে উপজাতি বা তার ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন ধরনের নাম থাকায় এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই গঠন প্রণালী অনিশ্চিত ছিল।'

আমাদের কাছে এমন কোনও তথ্য নেই যার দ্বারা আমরা প্রমাণ করতে পারি এদের মধ্যে কোন্‌টি গোষ্ঠী কোন্‌টি সৌভ্রাতৃত্বমূলক আর কোন্‌টি উপজাতি[২৬]। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা খুবই শক্ত শূদ্র কোন্ গোষ্ঠী, বা উপজাতির নাম কি না। এ ব্যাপারে অধ্যাপক ওয়েবার-এর মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নৈবেদ্য উৎসর্গের জন্য উৎসর্গকারীকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্বোধন করতে হবে। যদি সে ব্রাহ্মণ হয় তাকে সম্বোধন করতে হবে আসুন বলে, সে যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হয় তাকে সম্বোধন করতে হবে 'এখানে দ্রুত আসুন' এই বলে, আর যদি সে শূদ্র হয় তাহলে সম্বোধন হবে 'এখানে দৌড়ে আয়।'

অধ্যাপক ওয়েবার বলেছেন[২৭]:

'সমগ্র অনুচ্ছেদটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে দেখা যায় ঐ সময় শূদ্রদের আর্যদের পবিত্র ধর্মস্থলে যাবার অধিকার ছিল। শূদ্ররা আর্যদের বক্তৃতা বুঝতে পারত, যদিও তাদের বলার অধিকার ছিল না। দ্বিতীয় এই বিষয়টি একটি অবশ্যম্ভাবী ফল বলে ধরে নেওয়া যায় না, কিন্তু এটি খুব-ই সম্ভব এবং এর ফলস্বরূপ আমি তাদের সঙ্গে একমত যারা এই মত পোষণ করেন যে শূদ্ররা আর্য জাতি হিসাবে অন্যান্য জাতির পূর্বে ভারতে এসেছিল।'

তাঁর এই উপসংহার যে শূদ্ররা আর্য ছিল এটা বিরুদ্ধাবাদীদের ওপর এক বড় আঘাত। এখন একমাত্র সংশয় হল শূদ্ররা উপজাতি ছিল কি না তা নিরুপণ করা। তারা যে আর্য এবং ক্ষত্রিয় ছিল সে সম্পর্কে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই।

□ □

২৬. সৌভ্রাতৃত্বমূলক গোষ্ঠী বলতে আর্যদের বুঝাত বলে মনে হয়।

২৭. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩৬৬

অধ্যায় ৮

বর্ণ—তিনটি না চারটি?

এক

ইন্দো-আর্য সমাজে যে চারটি বর্ণ ছিল একেবারে শুরু থেকেই এই ধারণা হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীই বিশ্বাস করে আসছে এবং এমনকি ইউরোপীয় গবেষকগণও ঐ মত পোষণ করেন। এর আগের পরিচ্ছেদে যে তত্ত্ব দাঁড় করান হয়েছে, তাতে দেখান হয়েছে শূদ্ররা ক্ষত্রিয় ছিল এবং তা যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে তার ফল দাঁড়াবে এই যে, চার বর্ণের মতবাদ ভুল এবং এমন সময় ছিল যখন ইন্দো-আর্য সমাজে মাত্র তিনটি বর্ণ ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। এইভাবে এই মতবাদ একদিকে যেমন এক সমস্যার সমাধান করে অন্যদিকে তেমনি অন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। অন্য কেউ এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করুক আর নাই করুক, আমি কিন্তু করি। প্রকৃতপক্ষে আমি একথা ভালভাবেই জানি যে আমি যদি এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে না পারি যে ইন্দো-আর্য সমাজে মাত্র তিনটি বর্ণ ছিল তাহলে আমার তত্ত্ব অনুযায়ী শূদ্ররা যে ক্ষত্রিয় ছিল একথা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

বিষয়টি একদিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, আমি আমার মতবাদে যেমন একটি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছি আবার এতে অপর একটি সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আমি এই ভেবে নিজে খুশি হই যে আমার হাতে অকাট্য প্রমাণ আছে একথা বলার যে ইন্দো-আর্য সমাজের আদিতে মাত্র তিনটি বর্ণ ছিল।

প্রথম প্রমাণ হিসাবে আমি ঋগ্বেদের ওপরেই নির্ভর করব। কিছু কিছু গবেষক এইমত পোষণ করেন যে, ঋগ্বেদের সময় কোনও বর্ণপ্রথা ছিল না। ঋগ্বেদ রচনার বহু পরে পুরুষ সূক্ত সন্নিবেশিত হয়েছে—এই মতবাদের ওপর এই বক্তব্য

নির্ভরশীল। পুরুষ সূক্ত অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে যে ঋগ্বেদের সময় বর্ণভেদ ছিল না এমন কথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ঋগ্বেদের রচনার মধ্যেই দেখা যায় বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধের ঘটনা। পুরুষ সূক্ত ছাড়াও ঋগ্বেদের একাধিক স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণকে আলাদা বর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ১৫ জায়গায় এবং ক্ষত্রিয়কে আলাদা বর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৯ জায়গায়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঋগ্বেদে শূদ্রকে আলাদা বর্ণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। শূদ্র যদি আলাদা বর্ণই হবে তাহলে ঋগ্বেদে তার কোনও উল্লেখ না থাকার কোনও কারণ থাকতেই পারে না। ঋগ্বেদ থেকে প্রকৃত উপসংহারে পৌঁছান যাবে এই বলে যে বর্ণ প্রথা ছিল না একথা সত্য নয় বরং ঐ সময় তিনটি বর্ণ ছিল এবং শূদ্রদের চতুর্থ এবং আলাদা শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হত না।

দ্বিতীয় যে প্রমাণ আমি হাজির করছি তা হল শতপথ এবং তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ। উভয় ব্রাহ্মণেই তিনটি বর্ণের উল্লেখ রয়েছে। শতপথ এবং তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে শূদ্রকে আলাদা শ্রেণী হিসাবে দেখান হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে[১] :

ii. ১,৪,১১—'ভূ' উচ্চারণ করে প্রজাপতি পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। 'ভূব:' উচ্চারণ করে তিনি বায়ু 'স্ব:' উচ্চারণ করে তিনি আকাশ সৃষ্টি করলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হয়েছে এই জগতের সমন্বয়ে। এর সঙ্গে সংস্থাপিত হয়েছে অগ্নি। এরপরে প্রজাপতি 'ভূ' উচ্চারণ করে ব্রাহ্মণ, 'ভূত' উচ্চারণ করে ক্ষত্রিয় এবং 'স্ব:' উচ্চারণ বৈশ্যদের সৃষ্টি করলেন। এদের সঙ্গে তিনি সংস্থাপন করলেন অগ্নিকে। 'ভূ' উচ্চারণ করে প্রজাপতি নিজেকে সৃষ্টি করলেন, 'ভূব:' উচ্চারণ করে তিনি সৃষ্টি করলেন প্রাণিকূল। প্রজাপতি নিজে, তার সন্তান সন্ততিগণ এবং প্রাণীদের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি হল। অগ্নিকে তাদের মধ্যে সংস্থাপিত করা হল।'

তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে[২] :

iii. ১২,৯,২—'ব্রহ্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। একথা বলা হয়ে থাকে যে ঋক স্তোত্র থেকে বৈশ্যদের উৎপত্তি হয়েছে, যজুর্বেদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষত্রিয়দের এবং সামবেদ থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীনরা প্রাচীনদের-ই একথা বলে গিয়েছেন।'

---

১. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১৭

২. তদেব, পৃ : ১৪

এখানেই আমার প্রমাণ। এই প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে ঋগ্বেদ এবং শতপথ এবং তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ থেকে। এই প্রমাণ বেদের প্রমাণের সমতুল, কারণ উভয় শ্রুতি এবং উভয় ব্রাহ্মণেই নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মাত্র তিনটি বর্ণের অস্তিত্ব আছে। উভয় ব্রাহ্মণই একমত পোষণ করে যে শূদ্র বলে আলাদা বা চতুর্থ কোনও বর্ণ ছিল না। অতএব আমার সমর্থনে এর থেকে ভাল প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না যে আদিতে মাত্র তিনটি বর্ণ ছিল এবং শূদ্র ছিল দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের একটি অংশ মাত্র।

দুই

এই আমার সাক্ষ্য প্রমাণ। অন্যদিকে অবশ্যই ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্ততে অন্য প্রমাণ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রথম থেকেই চারটি বর্ণ ছিল। এখন প্রশ্ন হল এই দুই মতামতের মধ্যে কোন্‌টিকে সঠিক বলে ধরা হবে? কীভাবে এই প্রশ্নের সমাধান হবে? মীমাংসার সূত্র প্রয়োগ করে এই প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। আর যদি আমরা তার প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের মেনে নিতে হবে দুটি বক্তব্যই ঠিক। একটি বক্তব্য হল পুরুষ সূক্ততে বলা হয়েছে প্রথম থেকেই চারটি বর্ণের অস্তিত্ব ছিল, আর অন্য বক্তব্য হল দুই ব্রাহ্মণে (সতপথ ও তৈত্তিরিয়) বলা হয়েছে বর্ণ ছিল চারটি নয় তিনটি। এটা এক অস্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের বিষয়টি ঐতিহাসিক সত্যের অনুশাসনে যেমন সময়ের পরিপ্রেক্ষিত এবং সহজাত সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল মূল ঋগ্বেদের সঙ্গে পুরুষ সূক্ত পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে কি না। ঋগ্বেদে ব্যবহৃত ভাষা এবং পুরুষ সূক্তর ভাষার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। পুরুষ সূক্ত যে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে তা সব গবেষকই স্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে কোলব্রুক বলেছেন[৩] :

'সেই বিখ্যাত স্তোত্র (পুরুষ সূক্ত) ভাষায়, রীতিতে এবং দৈর্ঘ্যে অন্যান্য প্রার্থনাস্তোত্রের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এতে আছে একটা আধুনিকতার সুর এবং সংস্কৃত ভাষাকে পরিমার্জিত করার পর-ই এটি রচিত হয়েছে। এর ব্যাকরণ এবং ছন্দ নিখুঁত। আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায়, বেদের বর্তমান সংকলনটি রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষার অনেক অগ্রগতির পর। ঐ সময় সংস্কৃত ভাষা তার গ্রাম্যতা

৩. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১

এবং আঞ্চলিকতা থেকে অনেকটা মুক্ত হয়েছে। ঐ ভাষায় বেদের অসংখ্য স্তোত্র এবং প্রার্থনা সঙ্গীত রচিত হয়েছে। এরপর ঐ ভাষা পরিমার্জিত হয়ে অনেক আধুনিক উচ্চনিনাদি হয় এবং এই ভাষায় অনেক স্তোত্র, পবিত্র পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি রচিত হয়।'

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেছেন[৪] :

'এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ দশম মণ্ডলের ৯০তম শ্লোকটি চরিত্রে এবং স্বর প্রক্ষেপণে অনেক বেশি আধুনিক। যজ্ঞাদি প্রভৃতি উৎসর্গের ব্যাপারে এতে অনেক পরোক্ষ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

এতে ব্যবহার করা হয়েছে দর্শন শাস্ত্রের অনেক বিষয়। এবং তিনটি ঋতু —বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরতের উল্লেখ রয়েছে। এতে আছে ঋগ্বেদের একমাত্র অনুচ্ছেদ যেখানে চার বর্ণের উল্লেখ রয়েছে। আধুনিককালের জন্য ভাষাগত এই প্রমাণ খুব-ই জোরালো। উদাহরণস্বরূপ গ্রীষ্ম হচ্ছে গরম কাল এবং ঋগ্বেদের অন্য কোনও শ্লোকে এর উল্লেখ নেই। একইভাবে বসন্ত ঋতুর কথাও বৈদিক পণ্ডিতদের পুরানো শব্দকোষে দেখা যায় না। এটি ঋগ্বেদের মাত্র একটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেখানে এর উল্লেখ সেখানে তিনটি ঋতুকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে—শরৎ, হেমন্ত এবং বসন্ত রূপে।

অধ্যাপক ওয়েবার বলেছেন[৫]:

'পুরুষ সূক্ত ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলির মধ্যে আধুনিকতম সংকলন এবং সেটি এর বিষয়বস্তু থেকেই পরিষ্কার। এটি সত্য যে, সামসংহিতায় এর থেকে একটিও স্তোত্র গ্রহণ করা হয়নি। এর কোনও গুরুত্ব নেই এমন কথা বলা যায় না (আমার শিক্ষামূলক বক্তৃতায় যা বলেছি, তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে) নইগেয়া (Naigeya) চিন্তাধারা (যদিও এটি পুরোপুরি নিশ্চিত নয়) অনুযায়ী প্রথম আর্চিকায় সপ্তম প্রপাথক থাকায় প্রথম পাঁচটি স্তোত্র গ্রথিত হয়েছে।

তিন

এটি হল একদিকের যুক্তি। অন্যদিকের যুক্তিও আছে। এই যুক্তির সাহায্যে

---

৪. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১৩

৫. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১৪, উদ্ধৃতি

আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারি পুরুষ সূক্ত পূর্বেকার না পরের রচনা ছিল। এর জন্য প্রয়োজন হল বেদের কতগুলি সংহিতায় পুরুষ সূক্তকে গ্রহণ করা হয়েছে তার অনুসন্ধান করা। বিভিন্ন বেদ এবং সংহিতা পরীক্ষার পর পরিস্থিতি দাঁড়ায়;

সামবেদে পুরুষ সূক্ত থেকে মাত্র পাঁচটি শ্লোক গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্লযজুর বাজসনেয়ি সংহিতায় একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বিরাট। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ততে মাত্র ১৬টি স্তোত্র আছে। কিন্তু বাজসনেয়ি সংহিতায় পুরুষ সূক্তয় আছে ২২টি স্তোত্র। কৃষ্ণযজুতে মাত্র তিনটি সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই তিন সংহিতা-তৈত্তিরিয়, কথা এবং মৈত্রায়ণীতে পুরুষ সূক্তর কোনও উল্লেখ নেই। অথর্ববেদই একমাত্র বেদ যেখানে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত কম বেশি স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন বেদে পুরুষ সূক্তর বিষয়বস্তুও এক নয়। বাজসনেয়ি একান্ত নিজস্ব। ঋক, সাম এবং অথর্ববেদের অন্য কোথাও এর উল্লেখ নেই। ষোড়শ শ্লোকে আরও একটি পার্থক্য রয়েছে। ঋগ্বেদের ষোড়শ শ্লোকটি অথর্ব, সাম বা যজুর্বেদের কোথাও উল্লেখ নেই। ১৫টি স্তোত্র তিনটি বেদেই রয়েছে কিন্তু তাদের বিষয়বস্তুও এক নয়। তাছাড়া এই স্তোত্রগুলি ঐ তিনটি বেদে একইভাবে সন্নিবেশিত হয়নি। নিচে তার নমুনা দেওয়া হল:

যজুর্বেদ	ঋগ্বেদ	সামবেদ	অথর্ববেদ
১	১	৩	১
২	২	৫	৪
৩	৩	৬	৩
৪	৪	৪	২
৫	৫	৭	৯
৬	৮	*	১০
৭	৯	*	১১
৮	১০	*	১৪
৯	৭	*	১৩
১০	১১	*	১২

১১	১২	*	৫
১২	১৩	*	৬
১৩	১৪	*	৭
১৪	৬	*	৮
১৫	১৫	*	১৫
১৬	১৬	*	১৬?
১৭	*	*	*
১৮	*	*	*
১৯	*	*	*
২০	*	*	*
২১	*	*	*
২২	*	*	*

এখন কথা হচ্ছে পুরুষ সূক্ত যদি খুব প্রাচীন এবং ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বিষয় হত তাহলে অন্যান্য বেদ কি এই পুরুষ সূক্তকে যেভাবে বাদ দিয়েছে তা কি করতে পারত? বিভিন্ন বেদের স্তোত্রে পুরুষ সূক্তর স্থানও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঋগ্বেদে পুরুষ সূক্তর স্থান 'বিবিধ' এই অংশে। অথর্ববেদে পুরুষ সূক্ত স্থান পেয়েছে এবং অতিরিক্ত অংশে। পুরুষ সূক্ত যদি ঋগ্বেদের প্রাথমিক পর্বে রচিত হত তাহলে কি তার স্থান এত নগণ্য স্থানে হতে পারত? এই সমস্ত বিষয় কী সূচিত করে? এখন তা দেখা যাক :

(১) পুরুষ সূক্ত যদি কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরিয়, কথক, এবং মৈত্রায়ণী সংহিতায় সংকলিত না হয়ে থাকে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে পুরুষ সূক্ত ঋগ্বেদে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরিও, কথক ও মৈত্রায়ণী সংহিতার পর।

(২) পুরুষ সূক্তকে যে বেদের অতিরিক্ত অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এর কারণ এটি পরে রচিত হয়েছে।

---

*. শ্লোক পাওয়া যায়নি।

?. অভিন্নরূপে পাওয়া যায় নি।

(৩) বিভিন্ন সংহিতার রচয়িতরা স্তোত্রগুলি যুক্ত করা, বাদ দেওয়া বা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে যে স্বাধীনতা নিয়েছেন তাতে, প্রমাণ হয় যে তারা একে খুব বেশি প্রাচীন শ্লোক বলে মনে করেননি। কারণ প্রাচীন স্তোত্রগুলি তারা অবিকৃতভাবে গ্রথিত করার জন্য দায়বদ্ধ।

সুতরাং অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এবং অন্যান্য গবেষকগণ পুরুষ সূক্ত পরবর্তীকালের রচনা বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, উপর্যুক্ত তথ্যগুলি তার পক্ষেই সাক্ষ্য বহন করে।

চার

পুরুষ সূক্তর শ্লোকের পংক্তির মধ্যে যে গঠনগত পার্থক্য রয়েছে তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পুরুষ সূক্ত পাঠ করলে যে কেউ দেখতে পাবে ১১ এবং ১২ নম্বর শ্লোক ছাড়া বাকি সবগুলিই বর্ণনাত্মক। এই দুটি শ্লোক যাতে চার বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে তা প্রশ্নোত্তরমূলক। এখন কথা হচ্ছে পুরুষ সূক্তর বর্ণনাত্মক গঠন প্রণালী থেকে বাইরে এসে এই শ্লোক দুটি কেন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে রচিত হল? এর একমাত্র ব্যাখ্যা হল, এর রচয়িতা একটি নতুন পদ্ধতিতে একে সন্নিবেশ করতে চেয়েছিলেন। এর অর্থ এই যে পুরুষ সূক্ত ঋগ্বেদের শুধু যে পরবর্তী সংকলন তাই নয়, এই বিশেষ শ্লোকগুলি পুরুষ সূক্তর অনেক পরের রচনা।

কোনও কোনও সমালোচক এমন কথাও বলেছেন পুরুষ সূক্ত ব্রাহ্মণদের একটি জালিয়াতি এবং তারা নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতেই এই কাজ করেছেন। পুরোহিতরা তাদের বহু ধরনের জালিয়াতিতে সিদ্ধহস্ত। পোপের শাসনকালের ইতিহাসে The donations of Constantine এবং Pseudo-Isidore Decretels এর জালিয়াতি জগদ্বিখ্যাত। ভারতের ব্রাহ্মণরাও এই ধরনের কুকার্য থেকে বিরত ছিলেন না। ব্রাহ্মণরা কীভাবে আদি শব্দে 'অগ্রে'-কে 'অগ্নে'-তে পরিণত করে বিধবাদের পুড়িয়ে মারাকে ঋগ্বেদের সমর্থিত করেছিলেন, তা অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের মতো বিখ্যাত গবেষক পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়েছেন। এটি খুবই সুপরিচিত যে কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় সমগ্র একটি জাতিকে জাল করা হয়েছিল জনৈক আসামীর সমর্থনে।

অতএব এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যদি ব্রাহ্মণরা পুরুষ সূক্তকে জাল করে

থাকেন। যদি পুরোটা না করে থাকেন তাহলে অন্তত ১১ এবং ১২ নম্বর শ্লোক তো করেছেন বলেই মনে হয়। তারা এই কাজ করে থাকতে পারেন পরবর্তী সময় যখন চতুর্থ বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই কাজ করে চাতুর্বর্ণকে তারা বেদের অনুমোদন সিদ্ধ করিয়ে নিয়েছেন।

পাঁচ

পুরুষ সূক্ত কি ব্রাহ্মণের চেয়েও পুরনো? প্রথম থেকেই এটি একটি বিশেষ এবং আলাদা প্রশ্ন। এমন হতে পারে যে, পুরুষ সূক্ত ঋগ্বেদের পরবর্তী অংশে রয়েছে। তা সত্ত্বেও ঋগ্বেদ যদি সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণের আগের রচনা হয়, তাহলেও পুরুষ সূক্ত ব্রাহ্মণের আগের রচনা হবে। অতএব এই প্রশ্নটি আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের মতে বৈদিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ছিল প্রথমে বেদ, তারপর ব্রাহ্মণ এবং তারপর সূক্ত। এই প্রস্তাবনা যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে পুরুষ সূক্ত অবশ্যই ব্রাহ্মণের আগের রচনা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের এই মতামতকে কি একমাত্র বলে গ্রহণ করা যায়? যদি যায় তাহলে এর থেকে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় :

(১) ঋগ্বেদের সময় চার বর্ণের অস্তিত্ব ছিল এবং তিনটি বর্ণের অস্তিত্ব ছিল শতপথ ব্রাহ্মণের সময় অথবা (২) এমন হতে পারে শতপথ ব্রাহ্মণে বিষয়টি সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হয়নি।

এটা সুস্পষ্ট যে এই উভয় উপসংহার একেবারেই অবাস্তব এবং একে অবশ্যই বাতিল করতে হবে। প্রথমত—

বিষয়টি অবাস্তব তার বক্তব্যে। দ্বিতীয় বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ দুই ব্রাহ্মণে বর্ণপ্রথা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে তা পুরোপুরি পুরুষ সূক্তর মতামত থেকে আলাদা, এবং বিষয়টি স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদি কেউ ম্যাক্সমুলারের যুক্তিকেই একমাত্র বলে ধরে নেন তাহলে এই অবাস্তবতা অবশ্যম্ভাবী। এই প্রস্তাবনাকে একমাত্র বলে ধরে নেওয়া যায় না। তাহলে মনে হবে সব সংহিতা রচনা না হওয়া পর্যন্ত কোনও ব্রাহ্মণ রচিত হয়নি। অন্যদিকে অধ্যাপক বেলভারকর এবং অধ্যাপক রানাডে-র মত অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণ সম্ভব যে বেশির ভাগ রচনাগুলি

মিশ্র এবং একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে বেদের একটি অংশ অন্য একটি অংশের পূর্ববর্তী হতে পারে এবং ব্রাহ্মণের একটি অংশ বেদের অন্য একটি অংশের পূর্ববর্তী হতে পারে। এই মতামত যদি সত্য হয়, তাহলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। এই মতের ভিত্তিতে একথা মনে করা যেতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণের কিছু কিছু অংশ ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত থেকে পূর্বেকার রচনা। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে এক সময় মাত্র তিনটি বর্ণ ছিল।

পুরুষ সূক্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? এর একটি মাত্রই উপসংহার রয়েছে যে একটি পুরুষ সূক্ত ঋগ্বেদের একটি অতিরিক্ত অংশ এবং এটি রচিত হয় পরবর্তীকালে। সুতরাং আর্যসমাজের প্রথম থেকেই যে চারটি বর্ণ ছিল এই যুক্তি খাটে না।

এইসব কারণ দর্শানোর পর এখন দেখতে হবে আমার গবেষণায় শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদের প্রথম থেকে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে কোনও সমস্যা তৈরি করে কিনা। যদি এতে কোনও সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে এর কারণ, একমাত্র পুরুষ সূক্তকে খাঁটি বলে ধরে নেওয়া। এই ধরনের ধারণা অত্যন্ত ভিত্তিহীন বলে দেখান হয়েছে। অতএব আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কোনও সমস্যা দেখি না যে আর্য সমাজে এক সময় তিনটি বর্ণ ছিল এবং শূদ্ররা দ্বিতীয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

□ □

অধ্যায় ৯

ব্রাহ্মণ বনাম শূদ্র

শূদ্ররা ক্ষত্রিয় ছিল এই বিষয়টি এবং তারা চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্র ছিল কারণ তাদের অবনমন ঘটানো হয়েছিল—এই বিষয়টি কোনও সমস্যার সমাধান করে না বরং এতে অন্য এক সমস্যা তৈরি করে। এখন প্রশ্ন হল, শূদ্রদের কেন অবনমন ঘটানো হল?

এটি একটি নতুন সমস্যা। আগে কখনও এই সমস্যা তোলা হয়নি। এ বিষয়ে বর্তমানে যে সাহিত্য আছে, তাতে এই প্রশ্নের কোনও সমাধান পাওয়া যাবে না। এই প্রশ্নটি আমিই সর্বপ্রথম তুলেছি। যেহেতু শূদ্র সম্পর্কে আমার অভিমত এই প্রশ্নের ওপর নির্ভরশীল। তাই এর একটি সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমারই কর্তব্য। আমার উত্তর হল শূদ্রদের অবমনন ঘটানোর প্রধান কারণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের পরিণতি। আশার কথা এ বিষয়ে আমার হাতে বিস্তর প্রমাণ আছে।

এক

শূদ্র রাজা সুদাস এবং ব্রাহ্মণ ঋষি বশিষ্ঠের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। তবে এই সংঘর্ষের কী কারণ তা অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য এর বর্ণনা আমি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিকভাবে দেব। বর্ণনা নিচে দেওয়া হল :

এই সংঘর্ষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন হল বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রর মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল তা বুঝতে চেষ্টা করা।

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলেন। তাঁরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একে অন্যের চিরশত্রু ছিলেন। এমন কোনও ঘটনা ছিল না যাতে তাঁরা একে অপরের শত্রুতা করেননি। তাদের শত্রুতার সাক্ষ্য হিসাবে আমি কয়েকটি

কাহিনীর উল্লেখ করব। প্রথমটি হচ্ছে সত্যব্রতের কাহিনী। অথবা একে ত্রিশঙ্কুর কাহিনীও বলা যায়। 'হরিবংশ'তে[১] কাহিনীটি এইভাবে বলা হয়েছে;

ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ রাজা (সত্যব্রতের পিতা) এবং তাঁর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে শিষ্য ও গুরু রূপে অযোধ্যা শহর, দেশ এবং রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ শাসন করত লাগলেন। কিন্তু সত্যব্রত হয় অজ্ঞানতাবশত অথবা নিয়তি তাড়িত হয়ে বশিষ্ঠ সম্পর্কে সর্বদা একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন। সত্যব্রত সঙ্গত কারণে তার পিতা কর্তৃক তাকে রাজকীয় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করার জন্য তিনি কোনও প্রকার বাধা দেননি। সত্যব্রত বললেন, যখন সপ্তম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তখন বিবাহের আনুষ্ঠানিক সূত্র বাধ্যতামূলক এবং যখন আমি কনেকে ধরে আছি তখন এটি করা হয়নি। কিন্তু তখনও বশিষ্ঠ যিনি আইনের বিধান জানেন আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। এইভাবে সত্যব্রত বশিষ্ঠের প্রতি মনে মনে ক্রুদ্ধ ছিলেন। তিনি অবশ্য তাঁর জ্ঞানমত যা করা উচিত তাই করলেন। সত্যব্রতের পিতা তাঁর ওপর যে নীরব শাস্তি আরোপ করেছেন তা তিনি বুঝতে পারেননি। যখন তিনি সেই দুঃসাধ্য আচার অনুষ্ঠান সমর্থন করলেন তখন মনে করা যায় তিনি তাঁর পারিবারিক মর্যাদা উদ্ধার করলেন। সেই ভয়ঙ্কর ঋষি বশিষ্ঠ সত্যব্রতের পিতাকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হলেন এবং রাজা সংকল্প করলেন যে তিনি পুত্রকে সিংহাসনে বসাবেন। যখন সেই শক্তিশালী রাজপুত্র সত্যব্রত ১২ বছর ধরে শাস্তি ভোগ করলেন এবং দেখলেন খাবার জন্য কোনও মাংস নেই তখন তিনি ক্ষুধার জ্বালায় রাগে, ক্ষোভে এবং হতাশায় বশিষ্ঠের গাভী কামধেনুকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে হত্যা করলেন এবং তার মাংস নিজে খেলেন এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রকে দিলেন। বশিষ্ঠ একথা শুনে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ত্রিশঙ্কু নাম দিলেন। কারণ তিনি তিনটি অপরাধ করেছেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর বিশ্বামিত্র তাঁর পত্নীকে[২] ত্রিশঙ্কু যেভাবে সমর্থন করেছেন তাতে খুশি হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। এই

---

১. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩৭৭-৩৭৮, উদ্ধৃতি।

২. 'হরিবংশ' তে বলা হয়েছে : এই কারণে ইন্দ্র ১২ বছর বৃষ্টিপাত ঘটান নি। এই সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁর পত্নী ও পুত্রদের রেখে সমুদ্র পাড়ে তপস্যায় বসেন। দারিদ্র্যের প্রচণ্ড সংকটে পড়ে তাঁর পত্নী দ্বিতীয় পুত্রকে বিক্রি করতে উদ্যত হন একশত গাভীর বিনিময়ে অন্য সন্তানদের বাঁচাবার জন্য। কিন্তু সত্যব্রত তা করতে দেননি। বন্য পশুর মাংস সংগ্রহ করে পরিবারকে রক্ষা করেন। পিতার আদেশে তাঁকে ১২ বছর মৌনব্রত পালন করতে হয়। 'হরিবংশের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ত্রিশঙ্কু এক নাগরিকের তরুণী ভার্যাকে কামাবেগে হরণ করেন। বশিষ্ঠ তাঁর পক্ষ নেয়নি। এখানে এই প্রসঙ্গ রয়েছে।

প্রস্তাবে ত্রিশঙ্কু এমন বর চাইলেন যার দ্বারা তিনি যেন সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন। দ্বাদশ বছর ধরে রাজ্যে খরার আশঙ্কা দূর হল এবং ঋষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে তার পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করলেন। শক্তিশালী কৌশিক এরপর দেবতাদের এবং বশিষ্ঠের বাধা দান সত্ত্বেও রাজাকে জীবিত স্বর্গে নিয়ে গেলেন।'

এরপরের কাহিনী হচ্ছে বিপরীত দিকে ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে নিয়ে। এই কাহিনী বিষ্ণুপুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ রয়েছে। কাহিনীটি এইরূপ[৩] :

'কোনও এক সময় শিকারে গিয়ে রাজা একটি মহিলার আর্তকণ্ঠের শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর মনে হল ঐ শব্দ আসছিল বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রম থেকে। যেখানে ঋষি বিশ্বামিত্র কয়েকজন মহিলার ওপর কঠোর পরীক্ষা করছিলেন। এমন নিপীড়নের পরীক্ষা কেউ কখনও দেখেনি। তারা ভয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে ক্রমাগত চিৎকার করছিল। ক্ষত্রিয় রাজার কর্তব্য পালন এবং দুর্বলকে রক্ষার জন্য এবং দেবতা গণেশের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র সেখানে প্রবেশ করে চিৎকার করে বললেন, এ কোন পাপাত্মা যে আগুনকে তার আঁচলে বাঁধছে? আমি তার প্রভু এবং আমার তেজ ও শক্তি নিয়ে এখানে আবির্ভূত। আমি বলছি যে তার সারা দেহে তীর বিদ্ধ হয়ে দীর্ঘ নিদ্রায় মগ্ন হবে। আমার ধনুক থেকে সেই সব তীর ছাড়া হবে এবং সমস্ত দিক আগুনের রশ্মিতে প্রজ্বলিত হবে।' বিশ্বামিত্র তাঁর কথায় উত্তেজিত বোধ করলেন। তাঁর ক্রোধাগ্নিতে সেই অগ্নি ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র অশ্বত্থ পাতার মত ভয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং নতমস্তকে বললেন, রাজার কর্তব্য পালনেই তিনি একাজ করেছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁর এই আচরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি সর্বদা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের এবং বিত্তহীনদের দান করে থাকেন। দুর্বলদের রক্ষা করেন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। বিশ্বামিত্র তখন ব্রাহ্মণ হিসাবে তাঁর কাছে দান গ্রহণ করতে চাইলেন। রাজা বিশ্বামিত্রকে বললেন যে তিনি যে কোনও দান তাঁর কাছ থেকে চাইতে পারেন যেমন—স্বর্গ, তাঁর নিজের পুত্র, পত্নী, তাঁর শরীর, জীবন, রাজ্য অথবা অন্য কোনও সৌভাগ্য। রাজা তখন বিশ্বামিত্র কর্তৃক রাজসূয় দানের জন্য প্রতিশ্রুত হলেন। রাজা তাঁর কাছে এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার পর এবং অনেক কিছু ঋষিকে দান ধ্যান করার পর ঋষি রাজার কাছে সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্য চেয়ে বসলেন। এছাড়া তিনি নিজে,

৩. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩৭৯-৩৮৭

তাঁর স্ত্রী বং পুত্র ছাড়া ঋষি তাঁর কাছে তাঁর সবকিছু চাইলেন। হরিশ্চন্দ্র সানন্দে রাজি হলেন। বিশ্বামিত্র তখন রাজা হরিশ্চন্দ্রকে তাঁর সব অলঙ্কার খুলে ফেলতে বললেন এবং তাঁকে গাছের বাকল পরিধান করে অবিলম্বে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বললেন। যখন হরিশ্চন্দ্র যাত্রার উদ্যোগ করলেন, তখন ঋষি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি যে দান করেছেন তার দক্ষিণা চাই। রাজা উত্তর দিলেন, একমাত্র তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী ও পুত্র ছাড়া তাঁর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশ্বামিত্র দক্ষিণার জন্য জিদ ধরলেন। তিনি বললেন, ব্রাহ্মণের দান অপূর্ণ থাকলে ধ্বংস অনিবার্য। তিনি তাঁকে অভিসম্পাতের ভীতি প্রদর্শন করলেন। হতভাগ্য রাজা তখন তাঁকে দক্ষিণা দেওয়ার জন্য একমাস তার কাছে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন। শ্রমে অনভ্যস্ত রাজা তারপর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আবার যাত্রা করলেন। প্রজারা শোকাশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। রাজা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় প্রজাদের তীব্র আপত্তির কথা শুনতে গিয়ে তাঁর যখন যাত্রা বিলম্বিত হচ্ছিল বিশ্বামিত্র তখন এগিয়ে এসে রাজার বিলম্বে এবং ইতস্ততঃ করায় বিরক্তি ও রাগ প্রকাশ করলেন। তিনি রানী শৈব্যাকে তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। রাজা তখন রানী এবং শিশু পুত্র নিয়ে বেনারসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন এই পবিত্র স্বর্গীয় শহর যা দেবাদিদেবের সম্পত্তি তাতে কোনও মানুষের অধিকার থাকতে পারে না। কিন্তু তিনি দেখলেন কঠিন হৃদয় বিশ্বামিত্র সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন এবং নির্দিষ্ট সময় পার না হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দক্ষিণার জন্য রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় রানী শৈবা আর্তকণ্ঠে রাজাকে বললেন, আমাকে বিক্রয় করে আপনি বিশ্বামিত্রের দানের দক্ষিণা প্রদান করুন। রানী শৈবার এই প্রস্তাব শুনে হরিশ্চন্দ্র মূর্ছা গেলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে শোক করতে করতে আবার মূর্ছা গেলেন। রানীও তাঁর এই হৃদয় বিদারক অবস্থা দেখে মূর্ছা গেলেন। যখন তাদের এই অচেতন অবস্থা তখন তাদের ক্ষুধার্ত শিশু কাঁদতে কাঁদতে তার মা-বাবার কাছে খাবার চাইল। শিশুটি বলতে লাগল আমি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে পড়েছি এবং সেইসঙ্গে আমি অত্যন্ত পিপাসার্ত। এই মুহূর্তে বিশ্বামিত্র ফিরে এলেন সেখানে। তিনি জলের ঝাপটা দিয়ে হরিশ্চন্দ্রের মূর্ছা ভঙ্গ করলেন এবং পুনরায় তার দক্ষিণা চাইলেন। রাজা আবার মূর্ছা গেলেন এবং বিশ্বামিত্র আবার তাঁর মূর্ছা ভঙ্গ করলেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে ভয় দেখিয়ে বললেন সূর্যাস্তের পূর্বে যদি তিনি দক্ষিণা দিতে না পারেন তাহলে তিনি তাকে অভিসম্পাত দেবেন। রানী শৈবার পীড়াপীড়িতে তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁকে বিক্রি করতে

সম্মত হলেন। তিনি বললেন কি করে আমি খারাপ কথা উচ্চারণ করি যা কোনও অমানুষও করতে পারে না। তিনি এই বলে শহরে গেলেন এবং নিজে অভিযুক্তের ভাষায় রানীকে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রির কথা ঘোষণা করলেন। একজন ধনী ব্রাহ্মণ উচিত মূল্যের বিনিময়ে তাকে বাড়ি ঘরের কাজের জন্য কিনে নিতে সম্মত হলেন। মাকে নিয়ে যেতে দেখে শিশুটি তার পিছনে চলল, তার দুই চোখ জলে পূর্ণ হল এবং ক্রন্দন করতে লাগল। শিশুটি মায়ের কাছে এলে সেই ব্রাহ্মণ তাকে লাথি মেরে সরানোর চেষ্টা করল কিন্তু শিশুটি তার মাকে ছেড়ে যাবে না এবং ক্রমাগত মা মা বলে ক্রন্দন করতে থাকল। রানী শৈব্যা তখন ঐ ব্রাহ্মণকে বললেন, হে প্রভু আপনি আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমার সঙ্গে এই শিশুটিও আপনি ক্রয় করুন। কারণ এই শিশুটি ছাড়া যদি আপনি শুধু আমাকেই নিয়ে যান তাহলে তা অর্থহীন হয়ে যায়ে। আপনি আমার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে এই শিশুটিকে আমার সঙ্গেই রাখুন, ঠিক যেমন বাছুর তার মার সঙ্গে থাকে। ব্রাহ্মণ রাজি হলেন এবং বললেন, রাজা এই অর্থ নিয়ে শিশুটিকে আমায় দিন। ব্রাহ্মণ তার ক্রয় লব্ধ জিনিস নিয়ে সেখান থেকে চলে যাবার পর বিশ্বামিত্র সেখানে পুনরায় উপস্থিত হয়ে আবার তার দক্ষিণার দাবি জানাতে লাগলেন। তারপর রাজা হরিশ্চন্দ্র যখন তাঁর স্ত্রী এবং শিশুপুত্র বিক্রয় করে যে অর্থ পেয়েছিলেন তা বিশ্বামিত্রকে প্রদান করতে গেলেন। বিশ্বামিত্র অত্যন্ত রাগত স্বরে বললেন, হে হতভাগা ক্ষত্রিয় তুমি কি মনে কর এই ক্ষুদ্র দক্ষিণা দান আমার যোগ্য? তুমি শীঘ্রই দেখবে যে আমি আমার তপস্যার প্রভাবে জ্বলে উঠব এবং তাতে তোমার সর্বনাশ হবে। হরিশ্চন্দ্র তখন তাঁকে বাকি দক্ষিণা প্রদানে প্রতিশ্রুত হলেন। তখন দিনের আর এক প্রহর বাকি। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে দক্ষিণার জন্য এই সময়টুকু মাত্র দিতে সম্মত হলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন ভীত এবং ক্লীষ্ট এবং ঐ নিষ্ঠুর ঋষির বাকি দান সংগ্রহ করার জন্য তিনি নিজেকে বিক্রি করতে প্রস্তুত হলেন। তখন ধর্ম এক ক্রুদ্ধ ও ভয়ঙ্কর চণ্ডালের বেশে সেখানে হাজির হলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে তার নিজের খুশিমত দামে কিনে নিতে সম্মত হলেন। হরিশ্চন্দ্র এই ধরনের অবমাননাকর শর্ত মেনে নিতে রাজি হলেন না এবং মনে মনে স্থির করলেন তিনি এইভাবে ভাগ্যের কাছে মাথা নত না করে বরং বিশ্বামিত্রে অভিশাপের আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবেন। বিশ্বামিত্র তখন সেই স্থলে হাজির হয়ে বললেন, কেন তিনি চণ্ডালের কাছে তার শর্তে বিক্রি হতে চান না। হরিশ্চন্দ্র যখন তাঁর সমর্থনে কারণ ব্যাখ্যা করলেন, তখন বিশ্বামিত্র তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য

তাঁকে অভিশাপের ভয় দেখালেন। হরিশ্চন্দ্র তখন বিশ্বামিত্রের কাছে কাতর অনুনয় করে বললেন, তাঁকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন বাকি দক্ষিণার জন্য তিনি নিজে যেন তাঁকে ক্রয় করেন। তখন বিশ্বামিত্র বললেন যদি তুমি আমার ক্রীতদাস হতে চাও তাহলে আমি তোমাকে এই চণ্ডালের কাছে দশ কোটি মুদ্রায় বিক্রয় করব। চণ্ডাল আনন্দের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করে তাকে পিটিয়ে, বেঁধে, বিধস্ত এবং ক্লিষ্ট অবস্থায় তার বাসগৃহে নিয়ে গেল। চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে বলল, তোমাকে শ্মশানের কাপড়-চোপড় চুরি করার কাজে নিয়োগ করলাম। এর থেকে যে অর্থ আয় হবে তার দুই ষষ্ঠাংশ তোমার, তিন ষষ্ঠাংশ আমার এবং এক ষষ্ঠাংশ রাজার। এই ধরনের বিভীষিকা পূর্ণ স্থানে এবং এই ঘৃণিত কাজে হরিশ্চন্দ্র ১২ মাস অতিবাহিত করলেন। এই সময়টা তাঁর কাছে মনে হল শত বছর। একসময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁর বর্তমানের এই জীবন নিয়ে তিনি একটার পর একটা স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এরপর জেগে উঠে তিনি দেখলেন তাঁর পত্নী শৈব্যা এসেছেন সেই মহাশ্মশানে। তিনি তাঁর পুত্র রোহিতাশ্বকে বহন করে নিয়ে এসেছেন তার অন্ত্যেষ্টির জন্য। সর্পাঘাতে রোহিতাশ্বের মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে হরিশ্চন্দ্র এবং শৈব্যা একে অপরকে চিনতে পারেননি। কারণ নিদারুণ দুঃখ কষ্টে তাদের শরীর শীর্ণ ও ক্লিষ্ট হয়ে গেছে। শৈব্যা শুধু বিলাপ করেই যাচ্ছেন এবং এর থেকে হরিশ্চন্দ্র তাঁর পত্নীকে চিনতে পারলেন এবং মূর্ছা গেলেন। শৈব্যাও হরিশ্চন্দ্রকে চিনতে পেরে তাঁর ঐ অবস্থা দেখে মূর্ছা গেলেন। যখন তাঁদের জ্ঞান ফিরে এল তখন উভয়ই আবার বিলাপ করতে লাগলেন। হরিশ্চন্দ্র প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং শৈব্যা ক্রন্দন করতে লাগলেন রাজার এই হতভাগ্য করুণ অবস্থা দর্শন করে। রানী শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের বুকে ভেঙে পড়লেন এবং সন্তাপ করতে করতে বলতে লাগলেন একি স্বপ্ন না বাস্তব! তিনি শোক ও দুঃখে বলে উঠলেন, এ যদি বাস্তব হয় তাহলে যারা ধর্ম আচরণ করে সৎ পথে থাকে তাদের ভাগ্যে কোনও কিছু পাওয়ার নেই। এরপর হরিশ্চন্দ্র ইতস্তত করতে লাগলেন তিনি তাঁর পুত্রের চিতায় নিজের জীবন বিসর্জন দেবেন কিনা, কারণ এই সুযোগ যেহেতু তাঁর প্রভু চণ্ডাল সেখানে উপস্থিত নেই। পরে হরিশ্চন্দ্র তাই করতে সংকল্প করলেন। এর ফলাফল জেনেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং নিজেকে মনে মনে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, আমি যদি দান ধ্যান করে থাকি, যজ্ঞে আহুতি দিয়ে থাকি এবং গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকি তাহলে অন্য জগতে গিয়ে আমি আমার পত্নী ও পুত্রের সঙ্গে মিলিত হব। রানী শৈব্যাও ঠিক একইভাবে

প্রাণ বিসর্জন দিতে মনস্থ করলেন। এরপর হরিশ্চন্দ্র তাঁর পুত্রের মৃতদেহের শেষকৃত্যের জন্য চিতায় আরোহন করলেন এবং সর্বশক্তিমান হরিনারায়ণ কৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। তখন ধর্মের সঙ্গে সেখানে সব দেবতা আবির্ভূত হলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রও সেখানে উপস্থিত হলেন। ধর্ম তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত হতে অনুরোধ করলেন এবং ইন্দ্র ঘোষণা করলেন, তিনি, তাঁর পত্নী এবং পুত্র সৎকর্মের দ্বারা স্বর্গ জয় করেছেন। আকাশ থেকে দেবতারা মৃত্যুর প্রতিষেধক অমৃত এবং পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব জীবন ফিরে পেয়ে যুবক রাজপুত্রে পরিণত হল। রাজা রানীর দেহ আবৃত হল স্বর্গীয় পোশাকে ও মাল্যে এবং তারা তাদের প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র অবশ্য তাঁর প্রভু চণ্ডালের অনুমতি না নিয়ে স্বর্গে যেতে চাইলেন না। এছাড়া প্রভু চণ্ডালকে মুক্তিপণ দিতে হবে। তখন ধর্ম রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে আবির্ভূত হলেন এবং বললেন কীভাবে বিস্ময়করভাবে তিনি চণ্ডালের ভূমিকা নিয়েছিলেন। রাজা তখন বললেন প্রজাদের ছেড়ে তিনি স্বর্গে যেতে পারেন না। কারণ তারা সুখে-দুঃখে সবসময়ই তাঁর সঙ্গে থেকেছে, এবং তাঁদেরও অন্তত একদিনের জন্য হলেও স্বর্গে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ইন্দ্র তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র তখন রাজপুত্র রোহিতাশ্বকে হরিশ্চন্দ্রের উত্তরাধিকারী হিসাবে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন তাঁর বন্ধু এবং অনুগামীদের সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করলেন, এই মহা পরিপূর্ণতার পরেও রাজা হরিশ্চন্দ্রের পারিবারিক পুরোহিত বশিষ্ঠ যিনি ১২ বছর ধরে গঙ্গার জলে অবস্থান করছিলেন তিনি রাজার এই অবস্থার কথা শ্রবণ করে বিশ্বামিত্রের প্রতি যারপরনাই কুপিত হলেন, হরিশ্চন্দ্রের মত ধর্মপরায়ণ, দানশীল এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান রাজার নিগ্রহের সংবাদে তিনি বিরক্ত ও ব্যথিত হলেন এবং ঘোষণা করলেন (যখন বিশ্বামিত্র তাঁর নিজের শত পুত্রকেও নিধন করেছিলেন তখনও তাঁর ক্রোধাগ্নি এতটা প্রজ্বলিত হয়নি) বিশ্বামিত্র একটি সারসে পরিণত হবে। তিনি এই ভাষায় বললেন, যে দুষ্ট এবং ব্রাহ্মণের শত্রু আমার অভিশাপে তুমি মানুষের সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়ে এবং সব বোধশক্তি তিরোহিত হয়ে একটি বকে রূপান্তরিত হবে। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠের এই অভিশাপ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে একটি পাখিতে পরিণত করলেন এবং এই প্রজাতির পাখির নামকরণ হল অরি। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ তাঁদের এই রূপে পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ করলেন। অরিরূপী বশিষ্ঠের অস্বাভাবিক উচ্চতা হল দুহাজার যোজন অর্থাৎ ১৮০০ মাইল এবং বকরূপী বিশ্বামিত্রের উচ্চতা হল তিন হাজার ৯০ যোজন, তাঁরা প্রথমে পরস্পরকে তাদের

ডানা দিয়ে আক্রমণ করলেন। এরপর বক তার প্রতিপক্ষকে ডানা দিয়েই আঘাত করতে থাকল। অন্যদিকে অরি বককে তার নখর দিয়ে আক্রমণ করল। তাদের দুজনের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের দাপটে পর্বত ভেঙে পড়ল। মেদিনী কেঁপে উঠল, সমুদ্রের জল উথলে উঠল এবং পৃথিবীর আকার, আয়তন বদলে গেল। এর প্রভাবে অসংখ্য জীবজন্তু প্রাণ হারাল। এই চরম অরাজকতা দেখে ব্রহ্মা সেখানে আবির্ভূত হলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন অন্য সব দেবতা। ব্রহ্মা তখন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা এই সংঘর্ষ থেকে বিরত হও। এতে তারা ভীষণ ক্রুদ্ধ হল এবং সংগ্রাম থেকে নিবৃত হল না। ব্রহ্মা তখন তাদের আগের মনুষ্য রূপ ফিরিয়ে দিয়ে এই সংঘর্ষের ইতি ঘটালেন এবং তাদের পরস্পর সন্ধি করতে উপদেশ দিলেন।'

এরপরের কাহিনীতেও তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অযোধ্যার রাজা অম্বরীশের সঙ্গে সেই কাহিনী যুক্ত :

'কাহিনীতে বলা হয়েছে রাজা অম্বরীশ[৪] যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন ইন্দ্র যজ্ঞের বলি নিয়ে গেলেন। পুরোহিত বললেন, এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য দায়ী রাজার কুশাসন এবং বললেন এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং একজন মানুষকে বলি প্রদত্ত হতে হবে । দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর রাজা অম্বরীশ ভৃগুর অধস্তন পুরুষ ব্রাহ্মণ ঋষি ঋচীকের সমীপে গমন করলেন। তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে একজনকে যজ্ঞ প্রদত্ত বলি হবার জন্য বিক্রি করতে অনুরোধ করলেন। রাজা অম্বরীশ তাঁকে একটি পুত্রের মূল্য হিসাবে একলক্ষ গাভী দান করতে চাইলেন। ঋচীক উত্তর দিলেন, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রি করবেন না। ঋচীকের স্ত্রী বললেন, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকেও বিক্রি করবেন না। তিনি বললেন, কনিষ্ঠ পুত্ররা সাধারণত মায়ের প্রিয় পাত্র হয়ে থাকে। তখন দ্বিতীয় পুত্র শনুসেপ বললেন, তিনিই রাজা অম্বরীশের যজ্ঞের বলির জন্য বিক্রি হবেন এবং মূল্য দিয়ে রাজাকে তাঁকে নিয়ে যেতে বললেন। রাজা তখন একলক্ষ গাভী, এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং প্রচুর পরিমাণ রত্নালঙ্কার দিয়ে শনুসেপকে নিয়ে গেলেন। যখন তাঁরা পুষ্কর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সুনাসেপা দেখলেন তাঁর মামা বিশ্বামিত্র হাত বাড়িয়ে তাঁর সাহায্য চাইছেন। বিশ্বামিত্র সেখানে তখন তপস্যায় রত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেখানে আরও অনেক ঋষি তপস্যা করছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁকে বললেন যে তিনি এখন নিঃস্ব, অসহায় এবং বন্ধুহীন এবং তার কাছে দান চাইলেন। বিশ্বামিত্র তাকে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে বললেন

৪. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৪০৫-৪০৭, উদ্ধৃতি।

শনুসেপের পরিবর্তে তাঁর নিজের পুত্র রাজা অম্বরীশের বলি প্রদত্ত হতে পারেন। কিন্তু ঋষি বিশ্বামিত্রের এই প্রস্তাবে তাঁর পুত্র মধুছন্দস্ (Madhushyanda) এবং অন্যরা রাজি হলেন না। তাঁরা অত্যন্ত উদ্ধতভাবে এবং উপহাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, এটা কেমন হল যে আপনি নিজ পুত্রদের জীবন উৎসর্গ করে অন্যের পুত্রকে মুক্তি দিতে চাইছেন? আমরা এই কাজকে অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে করি এবং আমাদের কাছে এটি নিজেই নিজের মাংস খাওয়ার সমতুল কাজ হবে। ঋষি বিশ্বামিত্র পুত্রদের এই কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁর আদেশের বিরোধিতা করার জন্য পুত্রদের অভিশাপ দিয়ে বললেন, তোমাদের জন্ম হবে সমাজের সবচেয়ে নিগৃহীত শ্রেণী বৈশ্যদের ঘরে এবং এক হাজার ধরে তোমাদের কুকুরের মাংস আহার্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এরপর তিনি শনুসেপকে বললেন, যখন তুমি একটি পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ, মাল্য দ্বারা আচ্ছাদিত, বলি প্রদত্ত এবং বিষ্ণুর জন্য যজ্ঞের আহুতির উদ্দেশ্যে আবদ্ধ, তখন তুমি নিজেকে অগ্নির উদ্দেশ্যে সম্বোধন কর এবং অম্বরীশের যজ্ঞস্থলে এই পংক্তি ঐশ্বরীয় গাথা কীর্তন কর এবং এতেই তোমার মনস্কামনা পূরণ হবে। রাজদরবারে হাজির করার পর শনুসেপকে রাজার কাছে তখনই প্রস্তাব করলেন যে, এখনই চলুন আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যখন যজ্ঞ প্রদত্ত তখন তিনি লাল কাপড়ে দেহ আবৃত করে তিনি দুই দেবতা ইন্দ্র এবং তদীয় ভ্রাতা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ঐ দুটি গাথা পাঠ করলেন। সহস্রলোচন বিশিষ্ট ইন্দ্র এই পবিত্র স্তোত্র পাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শনুসেপকে দীর্ঘ জীবন দান করলেন।'

শেষ কাহিনী হচ্ছে দুটি বিপরীত ধর্মী বিষয় নিয়ে এবং বিষয়টি রাজা কল্মাষপাদ সঙ্গে যুক্ত। মহাভারতের[৫] আদি পর্বে এই কাহিনী বর্ণিত আছে :

'কল্মাষপাদ ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা ছিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের খুব ইচ্ছা যে তিনি রাজপুরোহিত হন। কিন্তু রাজার পুরোহিত পদে পছন্দ ঋষি বশিষ্ঠকে। একদিন রাজা কল্মাষপাদ শিকারে গেলেন এবং প্রচুর শিকার করার পর তিনি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সেইসঙ্গে তিনি হলেন ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। রাজা তাঁর সামনে বশিষ্ঠের শতপুত্রের জ্যৈষ্ঠ পুত্র শক্তিকে দেখে বললেন তাঁর রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াতে। ঋষি শক্তি ভদ্রভাবে রাজাকে বললেন, এই রাস্তা আমার। হে রাজন, এটাই চিরন্তন নিয়ম এবং সর্বদা রাজাই ব্রাহ্মণদের রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ান। কোনওপক্ষেই একে

৫. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৪১৫-৪১৭

অপরকে পথ করে দিতে রাজি হলেন না এবং পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তুললেন। রাজা এরপর মুনিকে তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। মুনি স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ অপমানিত বোধ করে রাজাকে তার শাপ দিয়ে বললেন আপনি একটি নরখাদকে পরিণত হবেন। ঐ সময় রাজা কলাশ্মপাদের দরবারের পুরোহিত পদ নিয়ে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে চরম বিরোধ চলছিল। তারা উভয়ই ঐ পদের দাবিদার ছিলেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে অনুসরণ করে রাজা ও শক্তির বিবাদস্থলে এগিয়ে গেলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বশিষ্ঠের পুত্রকে দেখতে পেয়ে তিনি নিজেকে অদৃশ্য করলেন এবং সুযোগের সন্ধান করতে লাগলেন। রাজা শক্তিকে এই শাপ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র এই সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে সমঝোতা হবার আগেই রাজার শরীরে একটি নরখাদক রাক্ষসকে প্রবিষ্ট করালেন। এখন ব্রাহ্মণ ঋষির অভিশাপের তেজে এবং বিশ্বামিত্রের আদেশে রাক্ষস তখন তার কর্ম করতে প্রবৃত্ত হল। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে দেখে এবং ঘটনাপ্রবাহ স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে দেখে নিরীক্ষা করে বিশ্বামিত্র ঐ স্থান ছেড়ে চলে গেলেন। রাজা একজন ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে দেখে তাকে খাওয়ার জন্য কিছু নরমাংস ছুঁড়ে দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণও রাজাকে ঠিক শক্তির মতই অভিশাপ দিলেন। অভিশাপের শক্তি জোরদার হয়ে তখন তা বলতে শুরু করল এবং শক্তিই হলেন তার প্রথম শিকার। রাক্ষসরূপী রাজা কল্মাষপাদ শক্তিকে খেয়ে ফেললেন। বিশ্বামিত্রের উস্কানিতে বশিষ্ঠের অন্য পুত্রদেরও ঐ একই দশা হল। শক্তিকে মৃত দেখে বিশ্বামিত্র রাক্ষসকে বারে বারে উত্তেজিত করতে লাগলেন। অন্য ভ্রাতারা ছিল শক্তির বয়ঃকনিষ্ঠ এবং সিংহ যেমন বনের ছোট পশুদের হত্যা করে তেমন ঐ রাক্ষস শক্তির ভাইদের একে একে সবাইকে খেয়ে ফেলল। বিশ্বামিত্র কর্তৃক নিজের পুত্রদের ধ্বংসের কথা জানতে পারার পর বশিষ্ঠ বিশাল পর্বত যেমন পৃথিবীকে যন্ত্রণায় ধরে রাখে তেমনই যন্ত্রণা কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেকে ধ্বংস করে দিতে মনস্থ করলেন কিন্তু কখনও কৌশিকদের নিঃশেষ করে দেওয়ার কথা ভাবলেন না। তখন সেই মহান ঋষি মেরু পর্বতের ওপর থেকে ঝাঁপ দিলেন এবং প্রস্তর খণ্ডের ওপর পতিত হলেন। কিন্তু তাঁর মনে হল, তিনি যেন তুলোর ওপর পড়লেন। সুউচ্চ পর্বত থেকে পতনের পরও যখন তিনি জীবনে বেঁচে গেলেন। তিনি তখন জঙ্গলে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেই জ্বলন্ত অগ্নি তো তাকে দগ্ধ করলই না বরং তাঁর শরীর শীতল হয়ে গেল। তখন তিনি নিজেকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলেন এবং তার আগে তিনি তাঁর গলায়

বেঁধে নিলেন এক ভারী প্রস্তরখণ্ড। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ তাঁকে শুষ্ক ভূমিতে আছড়ে ফেলল। তিনি তখন তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। এবং দেখলেন সেই আশ্রমও শূন্য। এই দেখে তিনি পুনরায় শোকসাগরে নিমজ্জিত হলেন। তিনি দেখলেন পাশ দিয়ে বিপাশা নদী বয়ে যাচ্ছে। বর্ষার জলে বিপাশা তখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নদী তীরের বহু বৃক্ষ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বশিষ্ঠ নদী গর্ভে প্রাণ বিসর্জন দিতে মনস্থ করলেন। সেই অনুযায়ী তিনি নিজেকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করলেন এবং নদীতে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু নদী তাঁর রজ্জুর বন্ধন ছিন্ন করে শুষ্ক ভূমিতে রেখে গেল। তখন থেকেই ঐ নদীর নাম হল বিপাশা। এরপর তিনি দেখতে পেলেন ভয়ঙ্কর শতদ্রু নদী এবং মৃত্যুবরণের জন্য ঐ শতদ্রু নদীতে ঝাঁপ দিলেন। নদী ছিল কুমিরে পূর্ণ। অগ্নিকুণ্ডের মতো ঐ ব্রাহ্মণ দেখে নরখাদক মর্কটগণ শতদিকে পালিয়ে গেল এবং এই ঘটনা থেকেই ঐ নদীর নামকরণ হল শতদ্রু। এই ঘটনার পর তিনি আরও একবার অবাক হয়ে চিন্তা করলেন তিনি নিজে থেকে কিছুতেই মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হবেন না। এরপর তিনি আবার তাঁর কুটিরে ফিরে গেলেন।'

বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে যে ঝগড়া ছিল এগুলি তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই সব সাময়িক ঝগড়া ছাড়াও তাদের মধ্যে আরও ঘোর শত্রুতা ছিল। এই শত্রুতা এমন পর্যায়ের ছিল যে একসময় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। মহাভারতের শল্য পর্বে এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে। এখন দেখা যাক মহাভারতের[৬] রচয়িতা কি বলেছেন :

'কৃচ্ছ্রতা এবং সংযম আচরণের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র এবং ব্রাহ্মণ ঋষি বশিষ্ঠের মধ্যে সাংঘাতিক শত্রুতা ছিল। স্থানুতীর্থে ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল আর তার পূর্বদিকে বিশ্বামিত্রের। এই দুই বিখ্যাত তপস্বী একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিদিনই কিছু না কিছু তাদের তপঃপ্রভাব প্রদর্শন করতেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের কাছে বশিষ্ঠের শক্তি অসহ্য মনে হল এবং তিনি তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগলেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করলেন, সরস্বতী নদী তার তীব্র স্রোতে ভাসিয়ে বশিষ্ঠকে আমার আশ্রমে নিয়ে আসবে। এরপর সেই ভীষণ তপস্বী বশিষ্ঠকে হত্যা করবেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করে সেই তপপ্রভাবে মহাশক্তিশালী ঋষি বিশ্বামিত্র রাগতভাবে চক্ষু রক্তবর্ণ করে মনে মনে নদীর প্রধানকে আহ্বান

---

৬. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৪২০-৪২২, উদ্ধৃতি।

করলেন। নদী বিশ্বামিত্রের প্রজা এবং তাঁর আদেশ শুনে খুব ব্যগ্র বোধ করলেন। নদী জানতেন বিশ্বামিত্র একজন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কোপন স্বভাবসম্পন্ন ঋষি। নদী সরস্বতী ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হস্তে বিশ্বামিত্র মুনির কাছে এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন মনে হতে লাগল নদী সরস্বতীর স্বামীকে কেউ হত্যা করেছে। যারপরনাই ভীত হয়ে নদী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার করণীয় কর্তব্য কি? মুনি তখন বিরক্তভরে উত্তর দিলেন, দ্রুত বশিষ্ঠকে এখানে নিয়ে এস যাতে তাঁকে আমি হত্যা করতে পারি। তখন সেই পদ্মলোচনা দেবী নদী সরস্বতী বাত্যা তাড়িত লতার ন্যায় কাঁপতে লাগলেন ভয়ে। বিশ্বামিত্র তাঁর এই অবস্থা দেখেও তাঁকে পুনরায় ঐ একই আদেশ করলেন। সরস্বতী জানতেন এটা কত বড় পাপ কাজ এবং এও জানতেন বশিষ্ঠের শক্তি তাঁর সমকক্ষ নয়, তবুও উভয় ঋষির কাছ থেকে অভিশাপের ভয়ে তিনি বশিষ্ঠের কাছে গমন করে বিশ্বামিত্রের কথা তাঁকে বললেন। বশিষ্ঠ তাকে ভীত, ম্লান এবং উদ্বিগ্ন দেখে বললেন, হে নদী শ্রেষ্ঠা তুমি নিজেকে জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত করে কোনও প্রকার ইতস্তত না করে বিশ্বামিত্রের কাছে আমাকে নিয়ে চল কারণ পাছে বিশ্বামিত্র তোমাকে অভিশাপ দেবেন। সেই দয়ার্ত হৃদয় ঋষি বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করে সরস্বতী চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে সবথেকে ভালভাবে ঐ কাজ করা যায়। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বশিষ্ঠ সর্বদাই আমার প্রতি বিশেষভাবে দয়া প্রদর্শন করছেন। সুতরাং আমি অবশ্যই তাঁর মঙ্গল কামনা করব। তখন তিনি দেখলেন কৌশিক মুনি তার তীরে প্রার্থনা করে যজ্ঞ করছেন। তিনি তখন মনে করলেন এ তো চমৎকার সুযোগ। তিনি তাঁর স্রোতের দ্বারা নদীর তীর ভাসিয়ে দিলেন। ঐ একইভাবে মিত্রা ও বরুণের পুত্র বশিষ্ঠও নদীর স্রোতে ভেসে গেলেন। যখন তিনি নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন তখন তিনি নদীকে পূজা করলেন। নদীর উদ্দেশ্যে স্তব করে তিনি বললেন, হে সরস্বতী ব্রহ্মা হৃদ থেকে তোমার উৎপত্তি, সারা বিশ্বকে তুমি তোমার জলরাশি সিঞ্চিত করছ। স্বর্গ থেকে তুমি তোমার জলরাশি মেঘের ওপর বর্ষণ করছ। তুমিই একমাত্র জলের ভাণ্ডার। তোমার জলেই আমরা পুষ্ট। তুমি জগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছ, তুমি উজ্জ্বল, তুমি যশস্বী, তুমি পূর্ণ, তুমি বুদ্ধিদীপ্ত এবং আলোকোজ্জ্বল। তুমিই কথা, তুমিই স্তা, এই জগৎ তোমার প্রজা। তুমি চতুর্ভুজা রূপে সব প্রাণীর মধ্যে বাস কর। এইভাবে নদী সরস্বতীর স্তব করতে করতে, বশিষ্ঠ নদীতীরে আসছেন এবং তাকে দেখে বিশ্বামিত্র একটি অস্ত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। যার দ্বারা তিনি বশিষ্ঠকে হত্যা করতে পারেন।

তাঁর ক্রোধ দেখে এবং তাঁর অভিশাপের ভয়ে সরস্বতী নদী তখন বশিষ্ঠকে দ্রুত পূর্বদিকে বয়ে নিয়ে চললেন এবং নদী উভয় মুনির আদেশ পালন করলেন কিন্তু নদী কৌশলে বিশ্বামিত্রকে ছলনা করলেন। বশিষ্ঠকে এইভাবে নদীবাহিত হতে দেখে বিশ্বামিত্র ধৈর্যহারা হলেন এবং অত্যন্ত কুপিত হয়ে নদীকে বললেন, হে নদী শ্রেষ্ঠা যেহেতু তুমি আমাকে ছলনা করেছ এবং পশ্চাদপসরণ করেছ সেইহেতু তোমার জল হবে এখন রক্ত এবং তুমি রক্তের ঢেউয়ে ভাসতে থাকবে এবং তোমার জল কেবলমাত্র রাক্ষসদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। (সরস্বতী নদীর জল রক্তবর্ণ—একথা উপকথায় বর্ণিত আছে) এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে সরস্বতী নদীর জলের স্রোত একবছর ধরে রক্তবর্ণ ছিল। বশিষ্ঠকে সেখান থেকে নদী ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই তীর্থভূমিতে রাক্ষসগণ আবির্ভূত হল এবং নদীর সেই রক্ত স্রোত পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে নৃত্য, হুল্লোড় ও আনন্দোল্লাস শুরু করে দিল। তারা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যেন মনে হল তারা স্বর্গজয় করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর সেই স্থানে কয়েকজন ঋষি উপস্থিত হয়ে সেই নদীর রক্তাক্ত জল দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। রাক্ষসগণ তখন ব্যস্ত দ্রুত ঢকঢক করে এবং বহু শ্রমে সেই রক্তাক্ত জল পান করে সরস্বতী নদীকে উদ্ধার করতে।'

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে এই যে শত্রুতা তা শুধুমাত্র দু'জন পুরোহিতের মধ্যে শত্রুতা নয়, এটা ছিল একজন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পুরোহিতের মধ্যেকার শত্রুতা। বশিষ্ঠ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয়। বিশ্বামিত্র ছিলেন রাজকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদে দেখা যায় বিশ্বামিত্র ছিলেন কুশিকের পুত্র। বিষ্ণুপুরাণে[৭] বিশ্বামিত্র সম্পর্কে আরও বিস্তারিত খবর পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে[৮] বলা হয়েছে বিশ্বামিত্র ছিলেন গাধীর পুত্র এবং তিনি রাজা পুরুরবার অধস্তন পুরুষ। হরিবংশতেও[৯] এর সমর্থন পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ থেকে আমরা জানতে পারি বিশ্বামিত্রের বংশের প্রতি পুরুরবাই একটি উত্তেজনার আগুন[১০] জ্বালিয়ে রাখতেন। ঋগ্বেদ থেকে আমরা আরও জানি যে বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদের অনেক স্তোত্র রচনা করেন এবং একজন রাজর্ষি বলে স্বীকৃতি পান। তিনি যে স্তোত্র রচনা করেন তা বেদের মধ্যে সবথেকে পবিত্র এবং ঋগ্বেদে ঐ স্তোত্রের নাম হল গায়ত্রী। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে আরও

---

৭. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩৪৯, উদ্ধৃতি
৮. তদেব, পৃ : ৩৫৩, উদ্ধৃতি
৯. তদেব, পৃ : ৩১৬, উদ্ধৃতি
১০. তদেব, পৃ : ৩৫৪, উদ্ধৃতি

যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানি তা হল যে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তাঁর বংশ ভরত[১১] গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

মনে হয়, খুব সম্ভবত এই সময় কতকগুলি বিষয় নিয়ে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বিষয়গুলি এইরূপ :

(১) দান গ্রহণের অধিকার। এই দানের অর্থ হচ্ছে কোনও কাজের বিনিময়ে দান নয়। ব্রাহ্মণদের কথা ছিল অন্য কেউ দান গ্রহণ করতে পারবে না। দান গ্রহণের একমাত্র অধিকার ব্রাহ্মণদেরই।

(২) বেদ শিক্ষাদানের অধিকার। ব্রাহ্মণদের বক্তব্য ছিল, ক্ষত্রিয়দের শুধুমাত্র বেদ শিক্ষার অধিকার আছে। তাদের শিক্ষাদানের কোনও অধিকার নেই। এই সুযোগ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই।

(৩) যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার অধিকার। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণদের বক্তব্য ছিল ক্ষত্রিয়দের যজ্ঞ করার অধিকার আছে, কিন্তু সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার কোনও অধিকার নেই। এই অধিকার শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এইসব উপরোক্ত ক্ষেত্রে বিশেষ করে তৃতীয় বিষয়ে তারা একে অন্যের বিরোধিতা করার ব্যাপারে পিছিয়ে থাকত না। ত্রিশঙ্কুর কাহিনীতে এর বর্ণনা আছে। রামায়ণে[১২] ত্রিশঙ্কুর কাহিনী রয়েছে। এটি নিম্নরূপ :

'ইক্ষবাকু বংশের রাজা ত্রিশঙ্কু এমন একটি যজ্ঞ করার মনস্থ করলেন যার শক্তিতে তিনি সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করতে পারেন। এই কাজের জন্য বশিষ্ঠকে আহ্বান করলে তিনি জানালেন, এই কাজ অসম্ভব। রাজা ত্রিশঙ্কু তখন দক্ষিণ দেশে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন ঋষি বশিষ্ঠের একশত পুত্র তপস্যায় রত। পিতা বশিষ্ঠ যা অসম্ভব বলে দিয়েছেন রাজা সেই কাজের জন্য তাঁর পুত্রদের নিযুক্ত করলেন। রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের পুত্রদের উদ্দেশ্যে বিশেষ নম্রতা এবং শ্রদ্ধা করে বললেন, ইক্ষবাক্ষু বংশীয় রাজারা তাদের পারিবারিক পুরোহিতদের তাদের বিপদের দিনে বড় সহায় বলে মনে করেন। তিনি আরও বললেন, পিতার পর তিনিও তাদের ইক্ষবাক্ষু বংশের রক্ষাকারী পুরুষ বলে শ্রদ্ধা করে থাকেন। কিন্তু

১১. এই কারণেই মনু বলেছেন, 'যদি রাজা কোনও শূদ্রকে কিছু দান করতে চান, তাহলে কাজ করিয়ে তবে দিতে হবে। 'দান' কথাটির অর্থ কাজ না করিয়ে কিছু দেওয়া। শূদ্রদের ক্ষেত্রে এই ব্যাতিক্রম লক্ষ্যণীয়।

১২. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৪০১-৪০৪

রাজা ত্রিশঙ্কু এই কথা বলার পর সেই উদ্ধত পুরোহিতদের কাছ থেকে তিরস্কৃত হলেন। তাঁরা রাজাকে বললেন, মূর্খ রাজা, একজন সত্যভাষণকারী গুরু তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, এখন তার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তুমি এই কাজের জন্য অনুরোধ করতে এসেছ আমাদের কাছে? সকল ইক্ষবাকুদের কাছে তাঁদের পারিবারিক পুরোহিতরা মহাজ্ঞানী বলে সম্মানিত এবং সেই সত্যপরায়ণ মহাপুরুষদের আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না। বিখ্যাত ঋষি বশিষ্ঠ জানিয়ে দিয়েছেন যে এই কাজ সম্ভব নয়, সুতরাং আমরা কীভাবে ঐ যজ্ঞের ভার নেব! হে রাজা তুমি অত্যন্ত নির্বোধ তাই আমাদের কাছে এই অনুরোধ করতে এসেছ। তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও। ঋষি বশিষ্ঠই এই কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তি। আমরা কীভাবে তাঁকে অসম্মান করি?'

'রাজা ত্রিশঙ্কু তখন তাঁদের বললেন, যেহেতু তাঁর গুরু বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্রগণ তাঁর এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, এখন তাঁকে অন্য কোনও সুবিধাজনক পন্থার কথা ভাবতে হবে। রাজা তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অন্য উপায় গ্রহণ করবেন, একথা শ্রবণ করার পর বশিষ্ঠের পুত্ররা তাঁকে অত্যন্ত নিন্দা করলেন এবং তাঁকে এই বলে অভিশাপ দিলেন যে চণ্ডালে পরিণত হও। তাদের অভিশাপের ফলে রাজা ত্রিশঙ্কু তৎক্ষণাৎ চণ্ডালে পরিণত হলেন এবং রাজার রূপ মুহূর্তে চণ্ডালের রূপে পরিণত হল। এই অবস্থায় তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের শরণ নিলেন। বিশ্বামিত্রও ঐ সময় দক্ষিণ দেশে বাস করছিলেন। বিশ্বামিত্র ঐ সময় সেখানে তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তপস্যায় রত ছিলেন। তিনি রাজার অবস্থা বুঝে তাঁর যজ্ঞে পুরোহিত হতে সম্মত হলেন। তিনি রাজাকে আরও বললেন গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বর্তমানে তিনি যে চণ্ডালের রূপে আছেন ঠিক সেই অবস্থাতেই তিনি সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করবেন। বিশ্বামিত্র তাঁকে বললেন, তুমি কুশিকের পুত্র এবং স্বর্গ তোমার অধিকারেই আছে। তিনি এরপর রাজাকে যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন এবং বললেন সব ঋষিকে ঐ যজ্ঞে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং বশিষ্ঠের পরিবারকেও ঐ যজ্ঞে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতে হবে।'

'বিশ্বামিত্রের শিষ্যগণ তাঁর এই বার্তা প্রচার করে দিলেন এবং প্রচারের শেষে ফিরে এসে তারা বিশ্বামিত্রকে বললেন, আপনার বার্তা শ্রবণ করে সবদেশ থেকে সব ব্রাহ্মণ-ই সমাগত হচ্ছেন এবং তাঁরা বশিষ্ঠের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। এমতাবস্থায় বশিষ্ঠের শত পুত্রগণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে যে সব সাংঘাতিক কথা

উচ্চারণ করলেন তা শুনুন। তারা বললেন, কি করে দেবতা এবং ঋষিগণ ঐ রাজা যেহেতু তিনি এখন চণ্ডাল তাঁর নৈবেদ্য গ্রহণ করেন? এছাড়া ঐ যজ্ঞের পুরোহিতও হলেন একজন ক্ষত্রিয়। চণ্ডালের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করে এবং ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের পৌরোহিত্যে যজ্ঞের দান গ্রহণ করে কীভাবে ব্রাহ্মণ রূপে স্বর্গে যাবেন? এইসব অকথ্য কথাবার্তা বশিষ্ঠ ও তাঁর পুত্ররা বলতে লাগলেন এবং ক্রোধে তাদের শরীর থেকে অগ্নি স্ফূরিত হতে লাগল। ঋষি বিশ্বামিত্র এই সংবাদ শ্রবণ করে যারপরনাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হলেন এবং অভিশাপের দ্বরা বশিষ্ঠের পুত্রদের ছাইয়ে পরিণত করলেন। বিশ্বামিত্র তাদের আরও অভিশাপ দিলেন এই বলে, তাদের সাতশো বার অচ্যুৎ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং স্বয়ং বশিষ্ঠ জন্ম নেবেন নিষাদের ঘরে।

এই অভিশাপ কার্যকর হচ্ছে একথা জানার পর বিশ্বামিত্র রাজা ত্রিশঙ্কুর প্রশংসা করলেন এবং সমবেত ঋষিদের কাছে প্রস্তাব করলেন যে এই যজ্ঞ সম্পাদন করতে হবে। বিশ্বামিত্র ঋষির ভয়ঙ্কর ক্রোধের পরিচয়ে ভীত হয়ে তাঁরা এই কাজে সম্মত হলেন। বিশ্বামিত্র স্বয়ং সেই যজ্ঞে যাজকের পদ গ্রহণ করলেন এবং অন্য ঋষিরা পুরোহিত রূপে সেই যজ্ঞ সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করলেন।'

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মধ্যে এই বিবাদে সুদাস সম্ভবত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঋষি বশিষ্ঠ ছিলেন সুদাসের পারিবারিক পুরোহিত। বশিষ্ঠই তাঁর রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। দশ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে সুদাসকে বশিষ্ঠই সাহায্য করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুদাস বশিষ্ঠকে রাজপুরোহিত[১২] পদ থেকে অপসারণ করে সেই পদে ঋষি বিশ্বামিত্রকে নিয়োগ করেন। বিশ্বামিত্র রাজা সুদাসের জন্য যজ্ঞ করেন। সুদাসের এটিই ছিল বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে প্রথম কাজ এবং যার জন্য সুদাস ও বশিষ্ঠের মধ্যে শত্রুতা হয়। এছাড়া সুদাস আরও একটি কাজ করেছিলেন যার ফলে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। বশিষ্ঠের পুত্র শক্তিকে সুদাস জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। সত্যায়ণ ব্রাহ্মণে এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। কিন্তু সত্যায়ণ ব্রাহ্মণে এই ধরনের নিষ্ঠুর ঘটনার কারণ বর্ণনা করা হয়নি। ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় সদগুরু শিষ্য কাত্যায়নের টীকায় এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন। সদগুরুশিষ্যের মতে সুদাস একটি যজ্ঞ করেছিলেন। যেখানে বিশ্বামিত্র

---

১২. এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কিংবদন্তী অনুসারে এই তথ্য, যা ঋগ্বেদ (iii. ৫৩.৯), যাস্ক নিরুক্ত (ii, ২৪) ভিত্তি করে প্রচারিত। যাস্ক নিরুক্ত-এর (ii. ২৪) এ বলা হয়েছে, 'তারপর তাঁরা একটি কথা শোনালেন। যাতে আছে, বিশ্বামিত্র ছিলেন পিজবনের পুত্র সুদাসের পুরোহিত।

এবং বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির মধ্যে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। এ সম্পর্কে সদগুরুশিষ্যের ভাষায়, বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির কাছে বিশ্বামিত্রের ক্ষমতা ও বাগ্মিতা ঠাঁই পায় না এবং এতে গাধীর পুত্র বিশ্বামিত্র পরাজিত হয়ে খুব অপমান বোধ করেন।'

এই কারণেই সুদাস শক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করেন। এটা খুবই স্পষ্ট যে সুদাস ঐ কাজ করেছিলেন বিশ্বামিত্রের অপমানের প্রতিশোধ নিতে। এর ফলে সুদাসও বশিষ্ঠের মধ্যে যে শত্রুতা সৃষ্টি হল তা অবশ্যম্ভাবী ছিল, বশিষ্ঠ ও সুদাসের সঙ্গেই এই শত্রুতার ইতি হয়নি। এই শত্রুতা চলেছে তাদের পুত্রদের মধ্যেও। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে :

'পুত্র শক্তির মৃত্যুর পর বশিষ্ঠ আবার পুত্র কামনা করলেন এবং কামনা করলেন সুদাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার। তিনি Ekasmannapanchasa দেখতে পেলেন এবং তিনি তা নিয়ে যজ্ঞ করলেন। ফলে তিনি পুত্রলাভ করলেন এবং সুদাসকে পরাস্ত করলেন।'

কৌশিতকী[১৩] ব্রাহ্মণেও এর সমর্থন আছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'পুত্র নিহত হবার পর বশিষ্ঠ কামনা করলেন আমার পুত্রলাভ এবং বোধলাভ হোক এবং আমি সুদাসকে পরাস্ত করব। তিনি যজ্ঞে দান করার জন্য এই বস্তু দেখলেন এবং তা উৎসর্গ করলেন। যজ্ঞ সমাপিত হবার পর তিনি সুদাসকে পরাজিত করলেন।'

দুই

সুদাস এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বিরোধ রাজা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে একমাত্র বিরোধ ছিল না। রাজা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে আরও বিরোধের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। এগুলি এখানে একত্র করা হচ্ছে। প্রথম বিরোধটি ঘটে রাজা বেণ[১৪] (Vena)-কে কেন্দ্র করে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কথা অনেকেই বলে গেছেন। হরিবংশ থেকে এ সম্পর্কে কয়েকটি বিরোধের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে :

'প্রজাপতির (জীবজগতের সৃষ্টিকর্তা) কথা দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি ছিলেন অত্রি গোষ্ঠীর ন্যায়পরায়ণ অঙ্গ-এর রক্ষাকর্তা এবং ক্ষমতার অধীশ্বর। তাঁর পুত্রের

১৩. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩০২, উদ্ধৃতি
১৪. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩২৮

নাম প্রজাপতি বেণ। মৃত্যুর দুহিতা সুনিতার গর্ভে তার জন্ম। বেণ তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে খুবই উদাসীন ছিলেন। কাল অর্থাৎ মৃত্যুর কন্যার এই পুত্রটির মধ্যে তাঁর মাতামহের কলঙ্ক যুক্ত ছিল। তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে অনীহা দেখিয়ে কামনাতাড়িত লোলুপ জীবনযাপন করতেন। রাজা তাঁর রাজ্যে এক অধর্মের বাতাবরণ তৈরি করেন। বেদের অনুশাসন তিনি অগ্রাহ্য করতেন এবং সমস্ত প্রকার নীতিহীন কার্যকলাপে তার প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে মানুষ কোনও ধর্মচর্চা করত না। যজ্ঞে কোনও সোমরস পান করা হত না এবং তিনি নৈবেদ্য এবং অর্ঘ্যদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ প্রজাপতি এমন উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন যে যখন তাঁর ধ্বংস ঘনিয়ে এল তখন তিনি ঘোষণা করলেন, আমিই সব, যজ্ঞের হোতা এবং যজ্ঞ দুইই, এবং আমার নামেই উৎসর্গ ও নৈবেদ্য দান করতে হবে। এই নীতি ভঙ্গকারী, এবং পাপাচারী এবং স্বঘোষিত ক্ষমতার অধীশ্বরকে মারিচীর নেতৃত্বে মহান ঋষিরা বললেন, আমরা এমন একটা যজ্ঞানুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা চলবে বহু বছর ধরে এবং আমরা সেখানে অধর্মাচরণ হতে দেব না। হে রাজা ভেনা এই অধর্মাচরণ কোনও শাশ্বত বিধি নয়। তুমি প্রতি কাজেই অত্রি বংশের এক প্রজাপতি এবং তুমি তোমার প্রজাদের রক্ষাকর্তা। নির্বোধ রাজা বেণ তুমি জান না তোমার উচিত কাজ কোন্‌টি। ঋষিরা তাকে এইভাবে সম্বোধন করে উচ্চহাস্য করলেন। মূর্খ রাজন, তুমিই করণীয় কর্তব্য স্থির করে নাও? কার আদেশ আমি পালন করব তাও তুমি নির্ধারণ কর? তুমি ভাব আমার সমকক্ষ কে? জ্ঞানে, শক্তিতে, সত্যপরায়ণতায়, সংযমে আমার প্রতিপক্ষ কে? তুমি ভ্রান্ত ও নির্বোধ, তুমি জান যে আমিই সমস্ত সৃষ্টি ও কর্তব্যের উৎস। তোমার জানা উচিত যদি আমি চাই তাহলে এই পৃথিবী আমি প্রজ্বলিত করতে পারি অথবা জলমগ্ন করে দিতে পারি এবং স্বর্গ-মর্ত অন্ধকার করে দিতে পারি। অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত পথে চালিত হয়ে ভেনা যখন অনুশাসনের বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন মহাশক্তিশালী ঋষিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই মহাপরাক্রমশালী রাজাকে ধরে সজোরে তাঁর উরুদেশ ঘর্ষণ করে দিলেন। ঘর্ষণের জোর এত বেশি ছিল যে তা থেকে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উৎপন্ন হল। তার আকৃতি ছিল ক্ষুদ্র এবং ঋষিগণ তার উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। ভীত হয়ে সে জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে রাগত দেখে অত্রি তাঁকে যেতে বললেন। সে হল নিশাদ জাতির প্রতিষ্ঠাতা এবং ধীবরদের জন্মদাতা। ভেনার পাপ থেকে এদের উৎপত্তি।'

এর পরবর্তীকালে রাজা পুরূরবা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই

পুরূরবা ছিলেন ইলার পুত্র এবং বৈবস্বত মনুর পৌত্র। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তার বিরোধের কথা মহাভারতের[১৫] আদি পর্বে বর্ণিত আছে :

'পরবর্তীকালে ইলার পুত্র রূপে পুরূরবা জন্ম হল। কথিত আছে ইলা পুরূরবা একাধারে মাতা ও পিতা উভয়ই ছিলেন। সাগরের মধ্যে ১৩টি দ্বীপের রাজা ছিলেন পুরূরবা। তিনি অতিমানব পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করতেন। পুরূরবা নিজে ছিলেন একজন প্রভূত যশস্বী রাজা। পুরূরবা তাঁর নিজ শক্তিগর্বে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। পুরুরভ তাদের সবরকম প্রতিরোধ ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্মণদের সব ধনরত্ন লুণ্ঠন করলেন। এই সময় স্বর্গ থেকে সনত কুমার নেমে এলেন এবং এ-কাজের জন্য তিনি রাজা পুরূরবা ভর্ৎসনা করলেন। রাজা তাঁকে বিশেষ আমল দিলেন না। তারপর ব্রাহ্মণ ঋষিরা তাঁকে অভিশাপ দিলেন এবং তাতে তিনি ধ্বংস হলেন। এই অর্থলোলুপ এবং আত্মগর্বী রাজা তাঁর সমস্ত বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়েছিলেন।'

এই পর্যায়ের তৃতীয় রাজা হলেন নহুষ। রাজা নহুষ ছিলেন পুরূরবা পৌত্র। পুরূরবার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিবাদের কথা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজা নহুষের বিরোধের কাহিনী মহাভারতের দুটি পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। একবার বনপর্বে এবং একবার উদ্যোগপর্বে। উদ্যোগপর্বের কাহিনী নিম্নরূপ। সেখানে বলা হয়েছে[১৬] :

'বৃত্রাসুর বধ করার পর দেবরাজ ইন্দ্রের মনে হল তাঁর ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়েছে। কারণ বৃত্রাসুরকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করা হত। ইন্দ্র তখন ভীত হয়ে সরোবরের জলে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু এদিকে স্বর্গে ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে স্বর্গের এবং মর্ত্যের সকল কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তখন দেবতা এবং ঋষিগণ নহুষকে স্বর্গের রাজা হতে অনুরোধ করলেন। নহুষ প্রথমে রাজি হননি কারণ ক্ষমতা ছাড়া স্বর্গের রাজা হয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবার অনুরোধে তিনি স্বর্গে ইন্দ্রের পদ গ্রহণে সম্মত হলেন। স্বর্গের রাজা হওয়ার পূর্বে রাজা নহুষ অত্যন্ত ধার্মিকের জীবন যাপন করতেন। কিন্তু ইন্দ্র হবার পর তিনি আমোদ আহ্লাদে আর যৌনব্যাসনে নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন। এমনকি ইন্দ্রের পত্নী শচীকে দেখে তিনি কামনা তাড়িত হয়ে পড়লেন এবং তাকে করায়ত্ত করে ভোগ করতে চাইলেন।

১৫. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩০৭, উদ্ধৃতি

১৬. তদেব, পৃ : ৩১০-৩১৩, উদ্ধৃতি

দেবরানী শচী তখন দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হলেন এবং বৃহস্পতি তাঁকে রক্ষার আশ্বাস দিলেন। রাজা নহুষ বৃহস্পতির এই হস্তক্ষেপে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তখন অন্য দেবতারা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললেন, পরস্ত্রীর দিকে নজর দেওয়া খুবই নীতিহীন কাজ। নহুষ অবশ্য দেবতাদের এই কথা মানলেন না এবং বললেন তিনি যে কাজ করতে চাইছেন তা ইন্দ্র যে সব অন্যায় কাজ করেছেন তার থেকে কোনও অংশেই খারাপ নয়। নহুষ বললেন গৌতম মুনির জীবদ্দশাতেই ইন্দ্র তাঁর পত্নী অহল্যার সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হন। দেবতাদের উদ্দেশ্য নহুষ বলেন, তখন আপনারা কেন ইন্দ্রকে নিরস্ত করেননি? তিনি বলতে থাকেন, এছাড়া ইন্দ্র আরও অনেক অন্যায়, জালিয়াতি এবং কুকর্ম করেছেন। তখন কেন দেবতারা তাঁকে বাধা দেননি? তখন নহুষের আজ্ঞায় দেবতারা ইন্দ্রাণী শচীকে আনতে গেলেন, কিন্তু বৃহস্পতি তাঁকে যেতে দিলেন না। তখন দেবগুরুর পরামর্শে শচী নহুষের কাছে কিছু সময় চাইলেন। তাঁর স্বামী ইন্দ্রের কি হয়েছে এবং এখন তিনি কোন অবস্থায় আছেন তা জানার জন্য তিনি এই সময় চাইলেন। শচীর এই অনুরোধ রাজা নহুষ মঞ্জুর করলেন। ইন্দ্রাণী তখন তাঁর স্বামীর সন্ধানে গেলেন। রানী শচী উপশ্রুতির (রাত্রির দেবী এবং গোপন তথ্যের ফাঁসকারী) সাহায্যে ইন্দ্রকে খুব সূক্ষ্ম অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। ইন্দ্র তখন হিমালয়ের উত্তরে সমুদ্রের মধ্যে একটি পদ্মের ডাঁটার মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। শচী তাঁকে নহুষের কু প্রবৃত্তির প্রস্তাব জানালেন। এবং তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করলেন। শচী তাঁকে ইন্দ্রত্ব পদে ফিরে আসার জন্যও অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা নহুষের শক্তির ভয়ে ইন্দ্র তখনই শচীর এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না, বরং তিনি শচীকে এমন একটি উপদেশ দিলেন যার সাহায্যে নহুষকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। ইন্দ্র শচীকে বললেন নহুষের কাছে তিনি এই প্রস্তাব দেবেন যে নহুষ ঋষিদের দ্বারা বাহিত একটি স্বর্গীয় বাহনে করে যদি তাঁর কাছে আসেন তাহলে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবেন।

রানী শচী তখন সেই অনুযায়ী নহুষের কাছে প্রস্তাব করলেন, হে দেবতাদের রাজা, আমার ইচ্ছা আপনি আমার কাছে আসবেন এমন একটি স্বর্গীয় বাহনে যা বিষ্ণু, রুদ্র, অসুর এবং রাক্ষসদেরও অজানা। আপনার সেই বাহন বিখ্যাত সব ঋষি বহন করে আনবেন। হে প্রভু, আপনি যদি আমার কাছে এইভাবে মর্যাদা নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করব। রাজা নহুষ ক্ষমতার গর্বে উন্মত্ত হয়ে শচীর এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

তিনি শচীর কাছে তার শক্তির বিষয়ে নানা গুণ কীর্তন করলেন এবং বললেন মুনিদের তার বাহনের বাহক করার মত শক্তি তাঁর আছে। নহুষ আরও বললেন আমি শক্তিতে বিশ্বাসী এবং আমি অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের রাজা। আমি ক্রুদ্ধ হলে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সব কিছুই আমার ওপর নির্ভর করছে। সুতরাং হে ইন্দ্রাণী, আমি অবশ্যই তোমার প্রস্তাব মত কার্য করব। সপ্তঋষি এবং ব্রাহ্মণ ঋষিরা মিলে সেই স্বর্গীয় শকটে আমাকে বহন করে নিয়ে তোমার কাছে নিয়ে যাবেন। হে সুন্দরী দেবরানী তুমি আমার ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি দেখে অবাক হয়ে যাবে।'

কাহিনীতে আরও বলা হয়েছে, 'তখন সেই দুষ্ট, অধার্মিক এবং উত্তেজিত রাজা নহুষ তাঁর ক্ষমতার দম্ভে স্বেচ্ছাচারিতার চরম নিদর্শন স্বরূপ তাঁর শকট বহন করার জন্য ঋষিদের আদেশ করলেন। ঋষিরা তাঁর নির্দেশে তাঁকে ইন্দ্রাণীর কাছে বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। ইন্দ্রাণী তখনও বৃহস্পতির কাছে তাঁকে রক্ষা করার জন্য কাতর আবেদন জানিয়ে যাচ্ছেন। বৃহস্পতি তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, রাজা নহুষ শীঘ্রই তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করবেন। বৃহস্পতি শচীকে আরও বললেন যে তিনি নিজে রাজা নহুষকে ধ্বংস এবং ইন্দ্রের গোপন আবাস খুঁজে বের করার জন্য একটি যজ্ঞ করবেন। বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রকে খুঁজে বের করার জন্য অগ্নিকে প্রেরণ করলেন। ইন্দ্র এলে তাঁর অবর্তমানে যা যা ঘটেছে সব তাঁকে বলা হল। তখন ইন্দ্র কুবের, যম, সোম এবং বরুণের সঙ্গে কীভাবে নহুষকে ধ্বংস করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর অগস্ত্য মুনি সেখানে এসে নহুষকে ধ্বংস করার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। এখন কীভাবে রাজা নহুষের পতন হল অগস্ত্য মুনির বর্ণনায় তা পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় ঋষিগণ এবং নির্মল চরিত্রের ব্রাহ্মণ ঋষিরা সেই পাপাত্মা নহুষকে শকটে করে বহন করে নিয়ে যেতে যেতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তারা নহুষকে তাদের এই কষ্টের কথা বললেন। ঋষিরা নহুষকে বললেন হে মহাশক্তিশালী যুদ্ধজয়ী বীর, রাজাদের উৎসর্গ করার সময় যে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ পাঠ করা হয় তার কর্তৃত্ব কি আপনি স্বীকার করেন? রাজা নহুষ উত্তর দিলেন না আমি স্বীকার করি না। ঐ সব চিন্তাধারা অন্ধকারে ঢেকে আছে। ঋষিরা আবার বললেন অন্যায়ভাবে কাজে নিয়োগ করে আপনি কোনও ধর্মের কাজ করছেন না। মহান ঋষিরা আমাদের একথা বলে গেছেন এবং আমরা তা স্বীকার করি। রাজা তখন অগস্ত্য মুনির সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলেন। নহুষ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে এক অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে

বসলেন এবং অগস্ত্য মুনির মাথায় তাঁর পা রাখলেন। তার ফলে তাঁর রাজগৌরব অস্তমিত হল এবং ঐশ্বর্য্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। যখন রাজা নহুষ এর পর খুব উত্তেজিত এবং ভীত হয়ে পড়লেন অগস্ত্য মুনি তাঁকে বললেন, যেহেতু তুমি অত্যন্ত মূর্খ এবং যে সব ধর্মগ্রন্থ মুনি ঋষিরা রচনা করে গেছেন এবং যা অত্যন্ত শ্রদ্ধার বিষয় তার তুমি নিন্দা কর এবং ব্রাহ্মণ ঋষিদের তোমার বাহকের কাজে নিযুক্ত করে তোমার পা আমার মস্তকে রাখ এবং ব্রহ্মা সম পবিত্র ঋষিদের তোমার শকট বহনে নিযুক্ত কর সুতরাং তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং পুণ্য শেষ হয়ে যাক এবং তোমার পাপ কাজের জন্য তুমি ডুবে যাও এবং স্বর্গ থেকে তোমার পৃথিবীতে পতন হোক। তোমার এই কাজের জন্য দশ সহস্র বছর ধরে তুমি একটি বিরাট সর্প হয়ে থাকবে। ঐ সময় শেষ হলে তুমি আবার স্বর্গে আসবে। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই দুষ্ট নহুষের স্বর্গ থেকে পতন হল। তখন তারা ইন্দ্রকে বললেন ব্রাহ্মণদের শত্রু ধ্বংস হয়েছে এবং হে ইন্দ্র আপনি ত্রিভুবনের ভার গ্রহণ করুন এবং তাদের পালন করুন এবং রক্ষা করুন। হে শচীপতি ইন্দ্র আপনার শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে এবং ঋষিরা তাঁকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।'

নিমি হলেন চতুর্থ রাজা যিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে[১৭] এই সংঘাতের কাহিনী বলা হয়েছে:

'রাজা নিমি ব্রাহ্মণ ঋষি বশিষ্ঠকে একটি যজ্ঞের যাজক পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এই যজ্ঞ চলবে এক হাজার বছর ধরে। বশিষ্ঠ তার উত্তরে জানান দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে পাঁচ শত বছরের জন্য একটি যজ্ঞের কাজে নিযুক্ত করেছেন এবং ঐ সময় শেষ হলে তিনি নিমির যজ্ঞে যাজক হবেন বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। একথা শুনে রাজা নিমি কোনও মন্তব্য করলেন না। বশিষ্ঠ মনে করলেন রাজা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু বশিষ্ঠ ফিরে এসে দেখেন রাজা নিমি তাঁর যজ্ঞে ঋষি গৌতম এবং অন্যদের পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। (গৌতম মুনি বশিষ্ঠের মতই একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন) এতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁর নশ্বর দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। রাজা নিমি ঐ অভিশাপ দেওয়ার সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি যখন জেগে ওঠে শুনলেন যে আগে কোনও প্রকার সতর্ক না করেই ঋষি বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন তিনি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মুনি বশিষ্ঠকেও অনুরূপ অভিশাপ দিলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। রাজা নিমির দেহ

১৭. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩১৬, উদ্ধৃতি

সুগন্ধ ওষুধ প্রয়োগ করে তাজা রাখা হল। রাজা নিমি যে যজ্ঞ শুরু করেছিলেন তা সমাপান্তে ঋষি পুরোহিতের অনুরোধে দেবতারা নিমিকে জীবন দান করতে রাজি হলেন। কিন্তু রাজা নিমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন দেবতারা রাজা নিমির ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে সমস্ত জীবের চোখের মধ্যে স্থাপন করলেন। এর ফলে সব জীবের চোখের পাতা ওঠানামা করে (নিমিষ অর্থ চোখের পলক)।

মনু তাঁর স্মৃতিতেও[১৮] এই সংঘাতের বিষয়টি লিখে গেছেন :

'শালীনতার অভাবে বহু রাজা তাঁদের সর্বস্ব সহ ধ্বংস হয়ে গেছেন এবং এই শালীনতার জন্যই এমনকি আশ্রমবাসী ঋষিরাও রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছেন। বিনয়ের অভাবেই রাজা বেণ ধ্বংস হয়েছেন। ঐ একই কারণে রাজা নহুষ, পিজবনের রাজা সুদাস, সুমুখ এবং নিমিও ধ্বংস হয়েছেন।'

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখের মাধ্যমে শূদ্রদের অবস্থান যতটা পরিষ্কার হবে বলে আশা করা হয়েছিল, ততটা হয়নি। তার কারণ কেউ-ই বুঝতে চেষ্টা করেনি যে, এই সংঘর্ষ ছিল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিরোধ। সুদাস নিশ্চিতভাবে একজন শূদ্র ছিলেন। অন্যদের যদিও শূদ্র বলে বর্ণনা করা হয়নি, তাদের বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে যে তারা ইক্ষ্বাকু বংশের অধস্তন পুরুষ। তাঁরা সকলেই শূদ্র ছিলেন একথা বলা কোনও কষ্ট কল্পনা নয়। এমনকি মনুরও এ সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। তিনি এই ঘটনাগুলিকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিরোধ বলে বর্ণনা করেছেন। সুদাস যে শূদ্র ছিলেন তা ডঃ ম্যুরও (Dr. Muir) বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এই কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধকে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধ বলে বর্ণনা করেছেন। এক অর্থে এটি সত্য যে, এই বিরোধ ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বিরোধ। কারণ শূদ্ররা ক্ষত্রিয়ের একটি শাখা ছিল। বিষয়টি আরও বেশি যুক্তিযুক্ত হত, যদি তারা পরিষ্কারভাবে বলতেন যে, এই সংঘর্ষ ছিল ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের মধ্যে। এই ভ্রান্তির জন্যই ইন্দো-আর্য সমাজের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এতদিন গোপন ছিল এবং এখনও তা রয়ে গেছে। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য এই পরিচ্ছেদের নাম রাখা হয়েছে ব্রাহ্মণ বনাম শূদ্র, ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয় নয়। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের মধ্যে বিরোধের এই ইতিহাস জানার পর একথা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কীভাবে শূদ্ররা দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় থেকে পতন হয়ে চতুর্থ বর্ণে পর্যবসিত হল।

□ □

১৮. সেক্রিড বুকস্ অব্ দি ইস্ট, ম্যাক্সমুলার, খণ্ড ২৫, পৃ : ২২২

অধ্যায় ১০

শূদ্রদের সামাজিক অধঃপতন

বর্ণপ্রথা দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় থেকে শূদ্রদের চতুর্থ বর্ণে অবনমিত করতে বা পতন ঘটাতে ব্রাহ্মণরা কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল? এ বিষয়ে এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা মূলত দুটি প্রশ্নকে ঘিরে। প্রথম প্রশ্ন শূদ্ররা আদিতে দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণের অংশ ছিল কি না এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন শূদ্রদের সামাজিক পতন ঘটানোর জন্য ব্রাহ্মণদের উস্কিয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না। এখন এই প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা করতে হবে। ক্রমান্বয় অনুসারে প্রথমেই আলোচনায় আসবে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের অবনমন করার জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা খতিয়ে দেখা।

এই প্রশ্নে আমার উত্তর হচ্ছে ব্রাহ্মণগণ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা হল শূদ্রদের উপনয়ন দিতে অস্বীকার করা। আমার এ বিষয়ে কোনও প্রকার সন্দেহ নেই যে এই পদ্ধতির দ্বারাই ব্রাহ্মণরা তাদের লক্ষ্য হাসিল করে এবং শূদ্রদের ওপর তাদের প্রতিশাধ গ্রহণ করে।

এখন এই উপনয়ন কি এবং ইন্দো আর্য সমাজ ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব কতটা ছিল তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উপনয়ন কি তার ধারণা দেওয়ার জন্য সবথেকে ভাল উপায় হল ঐ উৎসবের বর্ণনা দেওয়া।

আদিতে উপনয়ন ছিল একটি অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। একটি বালক তার হাতে করে সমিধ নিয়ে গুরুগৃহে এসে ব্রহ্মচারী হবার বাসনা জানাত এবং গুরুর কাছে থেকে অধ্যয়নের আবেদন করত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অনুষ্ঠানে অনেক ব্যাপকতা আসে। উপনয়ন অনুষ্ঠানে কতটা ব্যাপকতা এসেছিল আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে[১] তার উল্লেখ রয়েছে।

'যে বালকটির উপনয়ন হবে তার মুণ্ডিত মস্তক এবং সে নতুন পোশাকে আচ্ছাদিত

---

১. 'হিস্ট্রি অব্ ধর্মশাস্ত্র, কানে, খণ্ড ২, পৃ : ২৮১-২৮৩

অথবা ব্রাহ্মণ বালক হলে সে পরিধান করবে হরিণের চর্ম, ক্ষত্রিয় হলে রুরুর (কৃষ্ণসার) চর্ম এবং বৈশ্য হলে ছাগ চর্ম। আর যদি নতুন পোশাক পরিধান করে তাহলে তা হবে রংয়ে চোপান। ব্রাহ্মণ বালকের ঐ পোশাকের রং হবে লালচে হলুদ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে লাল এবং বৈশ্যের ক্ষেত্রে হলুদ বর্ণের। তাদের কোমরে থাকবে কোমরবন্ধ এবং হাতে লাঠি দণ্ড। বালকটি যখন তার গুরুর হাত ধরবে তিনি তখন ঘৃত নৈবেদ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন এবং তিনি অগ্নিকুণ্ডের উত্তরে নিজে উপবেশন করবেন। তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে বসবেন। যে বালকটির উপনয়ন হচ্ছে তাকে বসতে হবে গুরুর দিকে মুখ করে। তার মুখ থাকবে পশ্চিম দিকে। গুরু তখন তাঁর দুহাত জোড় করে এবং অনুরূপভাবে বালকটিও জোড় হাত করে এবং হাতের মধ্যে জল সংস্থাপন করে শ্লোক উচ্চারণ করে বলবেন, আমরা সাবিত্রী মন্ত্র স্থির করলাম। গুরু তাঁর জোড় হস্তের জল বালকটির জোড় হাতের জলের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ফেলতে থাকবেন। এরপর হাতের জল ফেলা শেষ হলে তিনি তাঁর নিজের হাত বালকটির হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সহিত বেঁধে দেবেন। এরপর তিনি সাবিত্রীর নির্দেশে অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং পুণর নামে বলবেন আমিষ তোমার হাত বেঁধে দিলাম। গুরু দ্বিতীয়বার আবার একই কথা উচ্চারণ করবেন। তিনি আবার বালকটির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে বলবেন অগ্নি তোমার গুরু। একথা তিনি তিনবার বলবেন। গুরু বালকটিকে সূর্যের দিকে মুখ করতে বলবেন। এবং গুরু মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকবেন এবং বলবেন, হে সাবিত্রী এই তোমার ব্রহ্মচারী একে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর। গুরু পুনরায় বলবেন, তুমি কার ব্রহ্মচারী? তুমি প্রাণের ব্রহ্মচারী, যিনি তোমাকে দীক্ষা দিলেন এবং আমি তোমাকে প্রজাপতিকে দিলাম। অর্ধেক মন্ত্রোচ্চারণের পর সেই সুন্দর পোশাক পরিহিত বালক এগিয়ে আসবে এবং গুরু তাকে দক্ষিণ দিকে ঘুরে বসতে বলবেন। তার হাত দুটি থাকবে তার কাঁধের ওপর। গুরু তখন বালকের বক্ষদেশ স্পর্শ করে মন্ত্রের বাকি অংশ উচ্চারণ করবেন। অগ্নির চারপাশের ভূমি এরপর মুছে ফেলার পর ঐ বালক ব্রহ্মচারী নীরবে একটি অগ্নিদণ্ড ঐ আগুনের ওপর স্থাপন করবে। শ্রুতি থেকে জানা যায়, যা কিছু প্রজাপতির তা নীরবে করতে হয় এবং এখন ঐ ব্রহ্মচারী প্রজাপতির অংশ। কেউ কেউ অগ্নিতে আগুনের ঐ দণ্ড স্থাপন করে মন্ত্র উচ্চারণ করে অগ্নির উদ্দেশ্যে বলেন, আমি একটি অগ্নিদণ্ড নিয়ে এসেছি মহান জাতিভেদের কাছে, এই অগ্নিদণ্ডের মাধ্যমে তোমার শক্তি বৃদ্ধি হোক। হে অগ্নি, আমরা ব্রাহ্মণের মাধ্যমে 'স্বহা' বৃদ্ধি করি। ঐ অগ্নিদণ্ডটি আগুনের ওপর স্থাপন করে এবং আগুন

স্পর্শ করার পর ব্রহ্মচারী বালকটি 'আমি আলোকে অভিষিক্ত হলাম' এই মন্ত্রটি উচ্চারণ পূর্বক তিনবার মুখমণ্ডল মুছে ফেলবে। শ্রুতি থেকে একথা জানা যায় যে সে দীপ্ত আলোকে অভিষিক্ত হল। সে বলবে, হে অগ্নি আমার ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ কর। হে অগ্নি আমাকে অন্তর্দৃষ্টি দাও, আমাকে সন্তান দাও, আমাকে আলো দাও। হে ইন্দ্র আমাকে অন্তর্দৃষ্টি, সন্তান ও শক্তি দান কর। আমার প্রতি সূর্যদেবের করুণা বর্ষিত হোক। হে সূর্যদেব আমাকে অন্তর্দৃষ্টি, সন্তান এবং আলো দাও। হে অগ্নি তোমার কি উজ্জ্বলতা! আমি তোমার আলোতে দীপ্ত হই। হে অগ্নি তোমার কি শক্তি! আমি তোমার শক্তিতে শক্তিমান হই। হে অগ্নি কি তোমার সর্বগ্রাসী ক্ষমতা! আমি তোমার থেকে তা আহরণ করি। এইভাবে অগ্নিপূজা করার পর ব্রহ্মচারী বালক হাঁটুগেড়ে বসে গুরুর চরণ স্পর্শ করবে এবং তাঁকে বলবে হে দেব আপনি আমাকে সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করান। বালকের হাত তাঁর পোশাকের ওপরের অংশ দ্বারা স্পর্শ করে, গুরু ব্রহ্মচারীকে সাবিত্রী মন্ত্রের একটি একটি করে পদ তাকে পাঠ করাবেন এবং সেই শ্লোকের অর্থ বিবৃত করবেন এবং এইভাবে শেষে পুরো শ্লোকটি পাঠ করবেন। ছাত্রটি যতটা পারে গুরু তাকে দিয়ে সাবিত্রী মন্ত্র ততটা আবৃত্তি করাবেন। ছাত্রের বক্ষদেশে গুরু তাঁর হাত স্থাপন করে আঙ্গুলগুলি ওপরে তুলে ধরে বলবেন, আমি তোমার অন্তরকে আমার সেবার জন্য স্থাপন করছি। তোমার মন আমার মনকে অনুসরণ করুক। তুমি একাগ্রচিত্তে আমার কথা শ্রবণ কর, বৃহস্পতি তোমাকে আমার সেবায় নিয়োগ করুন। এরপর গুরু বালকটির কোমর কোমরবন্ধ দিয়ে বেঁধে এবং তার হাতে দণ্ড স্থাপন করে তাকে ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দেবেন। তিনি তাকে এই কথা বলে ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলবেন, তুমি একজন ব্রহ্মচারী হও, এক চুমুক জল পান কর, সেবা কর, দিবা নিদ্রা ত্যাগ কর এবং সম্পূর্ণ গুরুনির্ভর করে বেদ অধ্যয়ন কর। ছাত্রটি তখন খাদ্যের জন্য সকাল সন্ধ্যায় ভিক্ষায় গমন করবে, সে সকাল সন্ধ্যায় অগ্নিতে একটি একটি অগ্নিদণ্ড স্থাপন করবে। ভিক্ষার দ্বারা অর্জিত খাদ্য সে গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে এবং দিনের বাকি সময় সে উপবেশন না করে দণ্ডায়মান অবস্থায় অতিবাহিত করবে।'

আচার্যগুরু ব্রহ্মচারী বালককে বৈদিক মন্ত্র শেখানোর পর উপনয়ন পর্ব শেষ হয়। এই বৈদিক মন্ত্রকেই গায়ত্রী মন্ত্র বলে। উপনয়ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে গায়ত্রী মন্ত্রের গুরুত্ব কতটা, তা ঐ গায়ত্রী মন্ত্র শেখানোর পূর্বে বুঝা খুব-ই কষ্টকর।

এই উপনয়ন অনুষ্ঠানের বর্ণনা থেকে দু'টি বিষয় খুবই পরিষ্কার। প্রথমত

উপনয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে একজনকে বেদ অধ্যায়নের জন্য অভিষিক্ত করা এবং বেদ অধ্যয়নের অধিকার জন্মায় গুরু যখন ব্রহ্মচারীকে গায়ত্রী মন্ত্র শেখান তারপর থেকে। দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় এর থেকে তা হল উপনয়ন অনুষ্ঠানের জন্য কি কি জিনিস বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই জিনিসগুলি হল :

(১) দুই প্রস্থ পোশাক। এক প্রস্থ ব্রহ্মচারীর নিচের অংশে পরিধান করার জন্য যাকে বলা হয় 'বাস' এবং তার ওপরের অংশে পরিধান করার জন্য অন্য প্রস্থ যাকে বলা হয় 'উত্তরীয়'। (২) দণ্ড অথবা কাঠের ছড়ি এবং (৩) মেখলা অথবা ঘাসের তৈরি কোমরবন্ধ।

অতীত দিনের এই উপনয়ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর পরবর্তীকালের উপনয়ন অনুষ্ঠানের তুলনা করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। উপনয়নের অঙ্গ হিসাবে ব্রহ্মচারীকে কোথাও যজ্ঞোপবীত[২] ধারণের উল্লেখ নেই। কিন্তু বর্তমান যুগের উপনয়নের অনুষ্ঠানের আসল অঙ্গই হচ্ছে যজ্ঞোপবীত ধারণ। এই যজ্ঞোপবীত ধারণ পরবর্তীকালে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যে, এর জন্য এবং উপবীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রতি যজ্ঞোপবীতে তিনটি করে সুতো থাকে এবং প্রতি সুতোয় তিনটে করে তন্তু থাকে। একটি করে তন্তু এক একজন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই উপবীত নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়া উচিত। নাভির নিচে যাবে না এবং তা দৈর্ঘ্যে বক্ষ দেশের ওপরে উঠবে না।[৩] একজন একটির বেশি উপবীত ধারণ করবে না। সব সময়-ই তাকে উপবীত ধারণ করে থাকতে হবে। যদি কোনও ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত ধারণ না করে খাদ্য গ্রহণ করে অথবা তার দক্ষিণ কর্ণে উপবীত স্থাপন না করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়, তাহলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ স্নান, উপবাস এবং প্রার্থনা করতে হবে। অন্যের উপবীত ধারণ করা এবং সেই সঙ্গে অন্যের জুতা, গহনা, মালা এবং কমন্ডলু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

---

২. যাজ্ঞবল্ক্য (i. ১৬ এবং ১৩৩)। একে ব্রহ্ম সূত্র বলা হয়।

৩. ধর্মসূত্র, কানে, খণ্ড ২, পৃ : ২৯২। নয় জন দেবতার জন্য নয়টি সুতো। 'দেবতা স্মৃতি' অনুসারে—এঁরা হলেন ওঙ্কার, অগ্নি, নাগ, সোম, পিতৃ, প্রজাপতি, বায়ু, সূর্য ও বিশ্বদেব। কিছু পরিবর্তন হয়েছে এর মধ্যে। 'মেধাতিথি'র (কানে দ্রষ্টব্য) মতে 'ইষ্টি' (যার দ্বারা বর্জন করা হয়), পশুবলী, সোম, যজ্ঞ—তিনটি সুতোর একটি যজ্ঞোপবীত কিন্তু তা তিন প্রকারের—অগ্নি, এক এবং সূত্র—তিনটি যজ্ঞের অগ্নির জন্য এবং সাত সোমজ্ঞস্ব সাতটি ভাঁজের ব্রহ্মচারীকে একটি উপবীত পরিধান করতে হয়, এক স্নাতক এবং গৃহস্থকে দুটি এবং দীর্ঘজীবী হবার বাসনা থাকলে অনেক ....।

তিন ভাবে উপবীত ধারণের বিষয় স্বীকৃত : (১) নিবীতা (Nivita) (২) প্রাচীনবিতা (Pracinavita) এবং (৩) উপবীত (Upavita)। যখন উপবীত গলা, উভয় ঘাড় এবং বক্ষ দেশের ওপর দিয়ে ধারণ করা হয় এবং তা দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ধরা থাকে এবং তা বক্ষ দেশের নিচ ও নাভির ওপর পর্যন্ত ঝুলে থাকে তখন তাকে বলা হয় নিবীতা। যখন উপবীত বাম স্কন্ধের ওপর দিয়ে ডান দিকে ঝুলে থাকে তখন তাকে উপবীত বলা হয়। আর উপবীত যখন ডান স্কন্ধের ওপর দিয়ে বাম দিকে ঝুলে থাকে তখন তাকে বলা প্রাচীনবিতা।

কীভাবে যজ্ঞোপবীত ধারণ পদ্ধতির প্রবর্তন হল? তিলক এ সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা[৪] দিয়েছেন। এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিলক বলেছেন :

'বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে কালপুরুষ অথবা মৃগশিরাকে প্রজাপতি বলা হয়ে থাকে। এই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে যজ্ঞও বলা হয়। একটি কোমরবন্ধ অথবা কাপড়ের একটি বেড় কালপুরুষের কোমরের চারিদিকে বাঁধা থাকে এবং ঐ যজ্ঞের নাম স্বাভাবিকভাবেই তার নামানুসারে যজ্ঞোপবীত হয়। অথবা একে উপবীত বা যজ্ঞও বলা হয়। এই শব্দটি বলতে এখন অবশ্য বুঝায় ব্রাহ্মণের পবিত্র সুত্র। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই পবিত্র সুত্র তার আদি চরিত্র অর্থাৎ কালপুরুষের কোমরবন্ধের সঙ্গে কোনও মিল আছে কিনা। আমার মনে হয় নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে এর মিল রয়েছে :

যজ্ঞোপবীত শব্দটিকে দেশীয় গবেষকরা যজ্ঞ + উপবীত থেকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু আমরা এই যৌগিক শব্দ যজ্ঞোপবীত বলতে যজ্ঞের জন্য উপবীত অর্থাৎ যজ্ঞের উৎসর্গের কথা বুঝি অথবা এটিকে যজ্ঞের উপবীত বুঝি তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। প্রথম বিষয়টি সত্য নয়, দ্বিতীয় বিষয়টির অনুকূলে যুক্তি আছে। এইজন্য প্রয়োগ পণ্ডিতগণ এই মর্মে একটি স্মৃতির উল্লেখ করেন যে উচ্চস্তরের আত্মাকে হোতৃরা যজ্ঞ নাম দিয়ে থাকেন। এটাই তার উপবীত এবং একেই যজ্ঞোপবীত বলা হয়। পবিত্র সূত্র ধারণ করার সময় যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় তার অর্থ হচ্ছে আমি তোমাকে যজ্ঞের উপবীত দ্বারা বন্ধন করলাম। ব্রাহ্মণগণ যে সাধারণ সূত্রের দ্বারা এই পবিত্র উপবীত ধারণ করে থাকেন তার প্রথম অর্থ হচ্ছে এই :

यज्ञपवीतं परमंपवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्

এই মন্ত্রটি প্রচলিত কোনও সংহিতায় পাওয়া যায় না। কিন্তু বুধায়নের

৪. ওরিয়ন, পৃ : ১৪৪-১৪৬

ব্রহ্মোপনিষদে এই মন্ত্রের কথা আছে। এই শ্লোকটির সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে 'হাওমা ফ্রেস্ট'-র যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মিল রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যজ্ঞোপবীত অতি উঁচু স্তরের এবং পবিত্র। প্রজাপতির সঙ্গে এর জন্ম। পুরস্তাত শব্দটি আবেস্তার শ্লোক 'পৌরবানিম'-এর সঙ্গে যুক্ত এবং এইভাবে বিষয়টি ড: হগের প্রশ্নের সমাধান করে। পক্ষান্তরে সহজ যার জন্ম প্রজাপতি অঙ্গ প্রতঙ্গের সঙ্গে তা মৈনুতস্ত্রেম তার মত একই অর্থ প্রকাশ করে। এই শ্লোকের পারস্পরিক মিল থাকা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয় এবং আমার মনে হয় পবিত্র সুত্র অবশ্যই কালপুরুষের কোমরবন্ধ থেকেই এসেছে। উপবীত এসেছে 'বে' থেকে যার অর্থ বরণ করা যায় আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে এক খণ্ড বস্ত্র, এক খণ্ড সুত্র নয়। অতএব প্রতীত হয় যে কোমরের চারদিকে এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান করাই আদি যজ্ঞোপবীত প্রথা ছিল, এবং পবিত্রতার ধারণা এই মতবাদের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়েছিল যে বিষয়টি প্রজাপতির কোমরবন্ধ বা কোমরের বেড়ের একটি প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব'।

কোনও সন্দেহ নেই তিলকের এই ব্যাখ্যা খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছু সমস্যার কোনও ব্যাখ্যা এতে নেই। যজ্ঞোপবীত এবং দুই প্রস্থ পোশাক—'উত্তরীয়' ও 'বাস'-এর মধ্যে সম্পর্ক কি তা এতে বলা হয়নি। যজ্ঞোপবীত উপলক্ষে ব্রহ্মচারীকে ঐ দুই প্রস্থ পোশাক পরিধান করতে হয়। যজ্ঞোপবীত কি ঐ দুই প্রস্থ পোশাকের অতিরিক্ত? যদি তাই হয় তাহলে পূর্বেকার উপনয়ন অনুষ্ঠানের বর্ণনায় এর কোনও উল্লেখ নেই কেন? অন্য আর একটি সমস্যারও কোনও ব্যাখ্যা নেই এতে। যদি পবিত্র সুত্র বস্ত্রখণ্ডের বিকল্প হয় তাহলে ঐ বস্ত্র পরিধান করা উপনয়ন অনুষ্ঠানে থেকে যায় কি করে?

মনে হয় এর অন্য ব্যাখ্যা আছে। আমি এর একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা দিই। সেই অনুসারে আমার মনে হয় গোত্র পরিচয়ের জন্য এই সুত্র ধারণ করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হল একজনকে তার গোত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করা। উপনয়ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কে নেই, যে উপনয়নের অর্থ হচ্ছে একজনকে বেদ পাঠের জন্য অভিষিক্ত করা। প্রাচীন আর্য আইনে পুত্র স্বাভাবিকভাবে তার পিতার গোত্র উত্তরাধিকার সূত্রে না পাওয়ার কারণ বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। দেখা যায় পুত্রকে নিজ গোত্রের উত্তরাধিকার প্রদান করার জন্য পিতাকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হত। একমাত্র এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পরই পুত্র তার পিতার গোত্রভুক্ত হত। এই প্রসঙ্গে ইন্দো-আর্য সমাজে প্রচলিত দুটি বিধির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে অপবিত্রতা বিধি এবং অন্যটি দত্তক গ্রহণ

বিধি। অপবিত্রতা বিধি অনুযায়ী মৃত্যুর পর অপবিত্রতা বা অশৌচ পালন নির্ভর করে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। জ্ঞাতি সম্পর্কে যদি খুব কাছের হয় তাহলে বেশি দিন অশৌচ পালন করতে হবে আর সম্পর্কে যদি দূরের হয় তাহলে অপেক্ষাকৃত কম দিন অশৌচ পালন করতে হবে। উপবীত হওয়ার পূর্বে যদি কোনও বালকের মৃত্যু হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে জ্ঞাতি বর্গের অশৌচ পালন করতে হবে মাত্র কয়েক দিন। আর দত্তক বিধি অনুযায়ী উপবীত হওয়ার পর আর কোনও বালককে দত্তক নেওয়া যাবে না। এই নিয়মের পিছনে কি কারণ রয়েছে? কারণ খুবই পরিষ্কার। উপবীত হওয়ার পূর্বে অপবিত্রতা নামমাত্র। কারণ বালকটি আনুষ্ঠানিকভাবে তখনও পিতার গোত্রের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়নি। অন্যদিক দত্তক গ্রহণের অর্থ হচ্ছে বালকটি যিনি দত্তক নিচ্ছেন সে তার গোত্র পাবে। কিন্তু উপবীত হয়ে যাবার পর বালকটি অবধারিতভাবেই অন্য একটি গোত্রে প্রবেশ করল। তখন আর তাকে দত্তক নেওয়ার সুযোগ থাকে না। কিন্তু এই বিধিগুলিতে দেখান হয়েছে সূত্র অনুষ্ঠান গোত্রের সঙ্গে যুক্ত, উপনয়নের সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই।

সূত্রের সঙ্গে যে গোত্রের সম্পর্ক আছে এই মতামতের সঙ্গে জৈন সাহিত্যের সমর্থন আছে। আচার্য রবি সেন পদ্মপুরাণের চতুর্থ পর্বের ৮৭ নং শ্লোকে এর উল্লেখ আছে।[৫] এর অর্থ এইরূপ :

'হে ভগবান, তুমি আমাদের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তির কথা বলেছ। এখন আমি সারা গলায় সূত্র পরিধান করে তাদের উৎপত্তি জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি'।

'গলায় যারা সূত্র পরিধান করে'—এই শব্দগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনও সন্দেহ নেই যে এই বর্ণনা ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে। এটি খুব পরিষ্কার, এর থেকে যে এক সময় শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই উপবীত ধারণ করত। অন্য কোনও জাতির লোক করত না। গোত্রের সম্পর্ক শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমিত ছিল। একথা খুবই স্পষ্ট যে সূত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি বালককে তার পিতার গোত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হত। এর সঙ্গে উপনয়নের কোনও যোগ ছিল না, যার অর্থ একজনকে বেদ অধ্যয়নে অভিসিক্ত করা।

একথা যদি সত্য হয় তাহলে সূত্র অনুষ্ঠান এবং উপনয়ন অনুষ্ঠান—এই দুটির আলাদা উদ্দেশ্য ছিল। কিছুকাল পরে এই দুটি অনুষ্ঠান একটিতে পরিণত হয়। দুটি

৫. জৈন সাহিত্য আউর ইতিহাস, নাথুরাম প্রেমী (হিন্দি), পৃ : ৫৫

অনুষ্ঠান একত্রিত হওয়ার কারণ খুবই স্বাভাবিক। সুত্র অনুষ্ঠান ছাড়া শুধুমাত্র উপনয়নের মধ্যে আচার্যের তার নিজের গোত্রে বালকটিকে নিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। এই ভয় এড়ানোর জন্য পিতা আচার্যের কাছে বালকটিকে সমর্পণ করার আগে তার সূত্র অনুষ্ঠান সম্পাদন করতেন। দুটি অনুষ্ঠান এক-ই সঙ্গে সম্পন্ন করার এটাই ছিল সম্ভাব্য কারণ। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, উপনয়নের অর্থই হচ্ছে বৈদিক ব্রাহ্মণ কর্তৃক বেদ শিক্ষা দান।

দুই

আমি যদিও নিশ্চিত আমার এই বক্তব্য খুব-ই জোরাল তবুও আমি একেবারেই সুনিশ্চিত নই যে, আমার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করবে না। আমি নিম্নলিখিত প্রতিবাদগুলির আশঙ্কা করছি :

(১) উপনয়ন না হওয়াই কি শূদ্রদের পরীক্ষা?

(২) শূদ্রদের কোনও দিন কি উপনয়নের অধিকার ছিল?

(৩) উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই কি শূদ্রদের সাধারণভাবে পতন ঘটল?

(৪) শূদ্রদের উপনয়ন অস্বীকার করার ব্রাহ্মণদের কি অধিকার ছিল? আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এই আপত্তির বিষয়ে আমি আমার উত্তর দিতে চাই।

তিন

প্রথমটি দিয়েই শুরু করা যাক। এই বিরোধিতার উত্তর দেওয়ার জন্য সব থেকে ভাল উপায় হল বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তর উল্লেখ করা। এখানে দেখতে হবে ভারতবর্ষের বিচারবিভাগীয় আদালতে শূদ্র কারা তা স্থির করার জন্য কি কি নীতি ধার্য করেছেন।

এ ব্যাপারে প্রথম ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ৭. এম.আই.এ. ১৮[৬] য়ে। ১৮৩৭ সালে প্রিভি কাউন্সিলে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল প্রাসঙ্গিক সময়ে ভারতবর্ষে কোনও ক্ষত্রিয় ছিল কি না। বিরোধের বিষয়—একদিকের বক্তব্য ছিল

৬. চৌধুরি রণ মর্দন সিংহ বনাম সাহেব প্রহ্লাদ সিংহ

ঐ সময়ে ভারতে ক্ষত্রিয় ছিল। পক্ষান্তরে অন্যপক্ষের বক্তব্য ছিল ঐ সময়ে ভারতে কোনও ক্ষত্রিয় ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষের মতামতের ভিত্তি ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমর্থিত ছিল। এই মতবাদ হল পরশুরাম সব ক্ষত্রিয়কে নিধন করেছিলেন এবং এর পরেও যদি কোনও ক্ষত্রিয় বেঁচে থেকে থাকে শূদ্র রাজা মহাপদ্ম নন্দ তাদের ধ্বংস করেন। সুতরাং এর পরে আর কোনও ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব ছিল না। ছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। প্রিভি কাউন্সিল এই মতামত গ্রহণ করেননি। প্রিভি কাউন্সিলের মতে এই তত্ত্ব মিথ্যা এবং ব্রাহ্মণদের তৈরি কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রিভি কাউন্সিল এই রায় দেন যে ভারতবর্ষে এখনও ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব আছে। প্রিভি কাউন্সিল অবশ্য এমন কোনও পদ্ধতির কথা বলেননি যার দ্বারা শূদ্রদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের আলাদা করা যেতে পারে। কাউন্সিলের মতে এই প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হবে প্রতিটি ঘটনা তার তথ্যের ভিত্তিতে।

এই বিষয়ে দ্বিতীয় ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় আই.এল.আর.ক্যাল,[৭] ৬৮৮ পৃষ্ঠায়। এখানে বিতর্কের বিষয় ছিল বিহারের ক্ষত্রিয়রা কি ক্ষত্রিয় ছিল না শূদ্র ছিল। উচ্চ আদালত রায় দেন যে তারা শূদ্র ছিল। গোঁড়া কায়স্থদের মতামত হল বিহারের কায়স্থরা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ এবং বারণসীর কায়স্থদের থেকে আলাদা। তাদের আরও মতামত হল উত্তর প্রদেশ এবং বেনারসের কায়স্থরা শূদ্র এবং বিহারের কায়স্থরা ক্ষত্রিয়। আদালত এই পার্থক্য স্বীকার করেননি এবং রায় দিয়েছেন এই বলে যে বিহারের কায়স্থরাও শূদ্র।

এই বিচারের রায়কে এলাহাবাদ উচ্চ আদালত মেনে নেননি। আই.এল.আর[৮] ১২. এলাহাবাদ. ৩২৮-য়ে বিচারপতি মাহমুদ ৩৩৪ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে বলেছেন :

'উভয় আদালত এই মতামতের পক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন তার যথার্থতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। দেশের এই অংশের ক্ষত্রিয়রা যারা শিক্ষিত জাতি বলে পরিচিত তাদের শূদ্রের শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। মনুর শাস্ত্রে মানুষের শ্রেণী বিভাজনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া হিন্দু আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থেও এই বিভাজনের কথা বলা হয়েছে, বিষয়টি যথেষ্ট সমস্যাপূর্ণ। শুধু জাতিগত দিক দিয়েই নয়, আইনগত দিক দিয়েও। জনসংখ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কে হিন্দু আইনের প্রশাসনিক দিকে বেশ সমস্যা রয়েছে। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকদের রায়েই যে

৭. রাজকুমার লাল বনাম বিশেশ্বর দয়াল

৮. তুলসীদাস বনাম বিহারীলাল

বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে তা আমি মনে করি না। শ্রী নারায়ণ মিত্র বনাম শ্রীমতী মুট্টি কিষেণ সুন্দরী দাসী অথবা মহাশয় শশীনাথ ঘোষ বনাম শ্রীমতী কৃষ্ণা সুন্দরী দাসী এই দুটি মামলা প্রিভি কাউন্সিলে যায় এবং তাদের বিচারই যে অভ্রান্ত তা আমি মনে করি না। এই উভয় মামলায় নিম্নবঙ্গের কায়স্থদের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দ্বাদশ কায়স্থ সম্প্রদায়কে আলাদা করার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহ এবং অযোধ্যার কায়স্থদের নিম্নবঙ্গের কায়স্থদের সঙ্গে আলাদা করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া আরও একটি ক্ষেত্রে, যেমন চৌধুরী হাজারিলাল বনাম বিষ্ণু দয়াল মামলায়ও আমার ভ্রাতৃপ্রতিম মাননীয় প্রধান বিচারপতি Tyrell যে রায় দিয়েছেন সেটিও একটি দত্তক সংক্রান্ত মামলা এবং এর রায়কে আমি সঠিক বলে মনে করি না। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমার আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

তৃতীয় মামলাটির উল্লেখ পাওয়া যায় ২০ কলকাতা, ডব্লু.এন. ৯০১-এ[৯]। এখানে প্রশ্ন ছিল বাংলার কায়স্থরা ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্র, এর কোন্‌টি। এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে যাওয়া হয়। প্রিভি কাউন্সিলের রায় এ সম্পর্কে প্রকাশিত হয় (1926) ৪৭.আই.এ.১৪০-এ। বাংলার কায়স্থরা ক্ষত্রিয় না শূদ্র, এ সম্পর্কে প্রিভি কাউন্সিল কোনও মতামত না দিয়ে বিষয়টি উন্মুক্ত রাখেন। ১৯১৬ এবং ১৯২৬ সালের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট তার দুটি রায়ে জানায় যে, বাংলার কায়স্থ এবং নিম্নবর্ণের দুটি সম্প্রদায় তাঁতি[১০] ও ডোমের[১১] মধ্যে বিবাহ আইনসিদ্ধ, কারণ উভয় সম্প্রদায়ই শূদ্রদের উপশাখা।

এই রায়ের ফলে কায়স্থদের অবস্থান আরও নেমে যায়। এর পরে আরও একটি আদালতের রায় আছে যা আই.এল.আর ৬, পাটনা ৫০৬-এ প্রকাশিত হয়। ৪৭ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত এই রায়ে বিচারপতি শ্রী জাওলা প্রসাদ যেখানে যেখানে কায়স্থদের উল্লেখ আছে এমন প্রতিটি পুরাণ এবং স্মৃতি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর এ সম্পর্কে রায় দিয়েছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গে একমত পোষণ না করে তাঁর রায়ে বলেন, বিহারের কায়স্থরা ছিলেন ক্ষত্রিয়।

পরবর্তী যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন জাগে তা হল মারাঠারা ক্ষত্রিয় ছিল না শূদ্র ছিল? এ ব্যাপারে প্রথম ঘটনাটি জানান হয় ৪৮.মাদ্রাজ ১-এ। এটি একটি আন্ত

৯. অসিত মোহন ঘোষ বনাম নীরদ মোহন ঘোষ মল্লিক

১০. (১৯২১) ৪৮ ক্যাল, ৬২৬ বিশ্বনাথ ঘোষ বনাম শ্রীমতী বলাই দেশাই

১১. (১৯২৪) ৫১, ক্যাল, ৭৮৮, ভোলানাথ মিটার বনাম সম্রাট

সওয়ালের মামলা। তাঞ্জোরের রাজার এস্টেটের রিসিভার এই মামলাটি দায়ের করেন। এই মামলার রাজার সমস্ত অধস্তন এবং সগোত্রীয়দের প্রতিবাদী হিসাবে দাঁড় করান হয়। তাঞ্জোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভেনকোজি। তিনি ইকোজি নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন মারাঠা এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজির ভ্রাতা। ২২৯ পৃষ্ঠা ধরে এই বিচারের রায় প্রকাশিত হয়েছিল। মারাঠারা ক্ষত্রিয় কিনা তা ঐ রায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। মাদ্রাজ হাইকোর্টের সে রায় ছিল মারাঠারা ক্ষত্রিয় নয় শূদ্র ছিল। প্রতিবাদীরা তার বিপক্ষে যান।

পরবর্তী ঘটনাটিও মারাঠাদের কেন্দ্র করে। এটি প্রকাশিত হয় আই.এল.আর ১৯২৮, ৫২ বোম্বাই ৪৯৭-এ। আদালতের রায় ছিল :

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মারাঠাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী ছিল। (১) পাঁচ পরিবার, (২) ছিয়ানব্বর পরিবার, এবং (৩) অবশিষ্ট পরিবার, এদের মধ্যে প্রথম দুটি শ্রেণী আইনানুগভাবে স্বীকৃত ক্ষত্রিয়।

শেষ যে ঘটনাটি সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় তা প্রকাশিত আই.এল.আর (১৯২৭) ৫২ মাদ্রাজ ১-এ। বিষয় ছিল মাদুরার যাদবরা ক্ষত্রিয় কিনা। যাদবরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। কিন্তু মাদ্রাজ হাইকোর্ট তাদের এই দাবি খারিজ করে দিয়ে রায় দেন যে যাদবরা শূদ্র।

কারা ক্ষত্রিয় আর কারা শূদ্র ছিল তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিচার বিভাগের এই ছিল রায়। তবে আদালতের এইসব রায় এমনই বিভ্রান্তিকর যে এই মিশ্র রায়ে সমস্যার সমাধান যতটা না হয়েছে তার থেকে বিভ্রান্তি বেড়েছে অনেক বেশি। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বেনারসের কায়স্থরা ক্ষত্রিয়, অথচ বাংলার কায়স্থদের শূদ্র বলা হয়েছে। আবার মাদ্রাজ উচ্চ আদালত তার রায়ে বলেছেন, সব মারাঠাই শূদ্র। কিন্তু বোম্বাই উচ্চ আদালত বলেছেন, পাঁচটি এবং ৯৬টি পরিবার ক্ষত্রিয় এবং বাকিরা শূদ্র। সব থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা মাদ্রাজ উচ্চ আদালত তার রায়ে বলেছেন সব যাদবই শূদ্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে জন্মেছিলেন সেই যাদব বংশ ক্ষত্রিয় বলেই পরিচিত।

এখন দেখতে হবে ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র নির্ণয় করার ব্যাপারে আদালত কোন কোন বিষয়কে তাদের বিচারের মাপকাঠি বলে স্থির করেছিলেন। এ বিষয়ে আদালত যে নীতি নির্ধারণ করেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) আই.এল.আর ১০ ক্যাল ৬৮৮-এ নির্ধারিত নীতিগুলি হল :

(ক) পদবী হিসাবে দাস ব্যবহার, (খ) পবিত্র উপবীত ধারণ, (গ) যজ্ঞ সম্পাদন করার ক্ষমতা, (ঘ) অশৌচ পালনের সময়, (ঙ) অবৈধ সন্তানের উত্তরাধিকার প্রভৃতি।

(২) আই.এল.আর-৬ পাটনা ৬০৬ অনুযায়ী এই নীতি নির্ভর করছে সাধারণ খ্যাতির ওপর। যদি কোনও সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় হিসাবে খ্যাত থাকে তাহলে তাদের ক্ষত্রিয় হিসাবেই ধরতে হবে।

(৩) ৪৮ মাদ্রাজ ১-এ বিভিন্ন ধরনের মানের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে আছে (ক) সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতনতা, (খ) উপনয়ন উৎসব যা পবিত্র সূত্র ধারণ থেকে আলাদা, (গ) যারা অব্রাহ্মণ তারা যদি প্রমাণ দিতে না পারে যে তারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য তাহলে শূদ্র বলে বিবেচিত হবে।

(৪) আই.এল.আর, বোম্বে ৪৯৭-এ উল্লিখিত বিষয়গুলি হল : (ক) জাতি সম্পর্কে সচেতনতা, (খ) সেই জাতির প্রথা এবং (গ) সেই সচেতনতা কতখানি অন্য সমাজে গ্রহণযোগ্য। যাঁরা এসব বিষয়ের কিছু জানেন না তাঁদের কাছে মনে হতে পারে আদালত যে সব নীতি নির্ধারণ করেছেন তা সঠিক। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তা নয়। যেমন জাতি নির্ধারণের ব্যাপারে অশৌচ পালনের সময় একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এবং এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এর কোনও গুরুত্ব নেই। কারণ স্থির করতে এটি একটি ভুল নীতি। অন্য আর একটি বিষয় যেমন যজ্ঞ সম্পাদন প্রাসঙ্গিক বিষয় কিন্তু বৈধ নয়। সচেতনতাবোধ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেটি আসলে কোনও মানই নয়। একটি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে তাদের ধর্মীয় আচার পরিস্থিতির চাপে পড়ে পালন না করলে তাদের সচেতনতাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। উপনয়ন সম্পর্কে যে নীতির কথা বলা হয়েছে তার অন্য অর্থ আছে। আদালত বিষয়টিকে সঠিকভাবে তুলে ধরেনি। কিন্তু সন্দেহের অবশ্য অবকাশ থাকে না যদি উপনয়নের বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝা যায় এবং একে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় তাহলে এটি একটি শক্ত ভিত্তি হতে পারে। উপনয়নের ব্যাপারে আদালত সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি এবং আইনে তার অবস্থান—এই বিষয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেননি। বরং আদালত এই পথেই অগ্রসর হয়েছেন বাস্তবে যা আছে আইনেও তাই গ্রাহ্য। এই ধরনের ভুলের প্রয়োগের জন্যই উপনয়ন অনুষ্ঠান নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে একটি সম্প্রদায়ের একটি এলাকায় যা

সামাজিক মর্যাদা অন্য এলাকায় সেই মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। এতে এমনও হয়েছে কোনও সম্প্রদায় বেআইনিভাবে উপবীত ধারণ করে একটি এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে তাদের স্বার্থ হাসিল করে চলেছে। পক্ষান্তরে অন্য একটি সমাজের মানুষ যাদের উপবীত ধারণের অধিকার আছে কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক চাপে বাধ্য হয়ে তা করতে পারছে না তারা তাদের ন্যায্য সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকৃত ব্যাপার হল কারা পবিত্র উপবীত ধারণ করে আসছে তা নয়, কাদের সেই পবিত্র উপবীত ধারণের অধিকার আছে প্রশ্ন সেটাই। বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝার পর একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে একমাত্র উপনয়নের অধিকারের মধ্যে দিয়েই কোনও ব্যক্তি শূদ্র অথবা ক্ষত্রিয় তা বিচার করা যায়।

চার

দ্বিতীয় যে আপত্তির কথা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই আপত্তির কথা ধরে নিয়ে বলা যায় আর্য সমাজের প্রথম থেকেই উপনয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে পার্থক্য করা হয়েছে, তা আমার মতে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। আদি সমাজে বিভেদ দিয়ে থাকে না। সমাজের শুরুতে থাকে একটা ঐক্য এবং শেষ হয় বিভেদের মধ্যে। স্বাভাবিক ব্যাপার হল, উপনয়নের ক্ষেত্রে প্রাচীন আর্য সমাজে সব শ্রেণীকে সমভাবে দেখা হত। পক্ষান্তরে এমন কথা অবশ্য বলা যেতে পারে, ঐক্যের ক্ষেত্রে আদি অবস্থা সর্বকালের জন্য গ্রহণযোগ্য না হতে পারে। একথা হয়ত সত্য যে, প্রাচীন আর্য সমাজে শূদ্র এবং মহিলাদের উপনয়নের অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে এই ধরনের যুক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়নি, যদিও যুক্তি আমার সপক্ষে, কারণ বাস্তব পরিস্থিতিগত এবং প্রত্যক্ষভাবে আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, আর্য সমাজে একসময় শূদ্র এবং মহিলাদের উপনয়নের অধিকার ছিল। প্রাচীন আর্য সমাজে সকলের পক্ষেই উপনয়নকে অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মূক, বধির, নির্বোধ এবং ক্লীবদেরও উপনয়ন হত। মূক, বধির এবং নির্বোধদের উপনয়নের ক্ষেত্রে এক বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হত। অন্যদের সঙ্গে তাদের উপনয়নের প্রভেদ ছিল এই যে সমিধ দান, প্রস্তর স্পর্শ, পোশাক পরিধান, মেখলা বাধা, ছাগচর্ম দান এবং দণ্ড গ্রহণ সবকিছুই নীরবে সম্পন্ন হত। ব্রহ্মচারী বালকটি

নিজে তার নাম উচ্চারণ করত না, আচার্য নিজেই রান্না করা খাবার অথবা পরিশোধিত মাখনের নৈবেদ্য দিতেন এবং সমস্ত প্রকার মন্ত্র আচার্য খুব নিচু স্বরে উচ্চারণ করতেন। ক্লীব, দৃষ্টিহীন, উন্মাদ এবং মৃগী ও কুষ্ঠ রোগীদের উপনয়নের ক্ষেত্রেও ঐ এক-ই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত।

ছটি অনুলোম জাতিরও উপনয়নের অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং মিশ্রজাতি যেমন রথকর, অম্বস্থ প্রভৃতির উপনয়নের জন্য যে বিধি রয়েছে তার থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১২] পতিতসাবিত্রীক জাতিরও উপনয়নের অধিকার ছিল। উপনয়নের জন্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ছিল জন্ম থেকে অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে একাদশ বর্ষ এবং বৈশ্যদের ক্ষেত্রে দ্বাদশ বর্ষ। কিন্তু এই বয়ঃসীমার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে ১৬, ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে ২২ এবং বৈশ্যদের ক্ষেত্রে এই বয়ঃসীমা ২৪ বছর পর্যন্ত শিথিল হতে পারত। এই বয়ঃসীমার মধ্যে উপনয়ন না হলে তার আর উপনয়ন হতে পারত না এবং এর ফলে তার আর সাবিত্রী অর্থাৎ পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র শিক্ষার আর কোনও অধিকার থাকত না। নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে যাদের উপনয়ন না হত, তাদের বলা হত পতিতসাবিত্রীক অথবা সাবিত্রীপতিত। নিয়ম বিধি কঠোরভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় তাদের আর কোনও উপনয়ন হত না। তাদের বেদ শিক্ষার কোনও অধিকার থাকত না। তাদের নৈবেদ্য বা যজ্ঞে কেউ পৌরোহিত্য করত না এবং তাদের সঙ্গে কোনও সামাজিক সম্পর্ক যেমন বিবাহ ইত্যাদি স্থাপিত হত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু শাস্তিদান সাপেক্ষে এই বিধিও[১৩] শিথিলযোগ্য ছিল।

ব্রহ্মাঘ্নদের (যার পিতা বা পিতামহর উপনয়ন হয়নি) ক্ষেত্রেও উপনয়নের অনুমতি ছিল। মূল নিয়ম ছিল, যদি পিতা বা পিতামহ কারও উপনয়ন না হত এবং এইভাবে তিন পুরুষ চলত তখন তাদের বলা হত ব্রহ্মহত্যাকারী। লোকজন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না, তাদের বাড়িতে আহার্য গ্রহণ করত না এবং তাদের সঙ্গে

১২. বৌধায়ন গৃহসূত্র (II. ৮), কানে, হিস্ট্রি অব্ ধর্মশাস্ত্র, খণ্ড ২ (১), পৃ : ২২৯

১৩. আপস্তম্ব ধর্মসূত্র I.I.I. ২৮-৩১-এ বলা হয়েছে যে ১৬ বা ২৪ বছরের পর যে কেবল তিনটি বেদ অধ্যয়ন করতে চায় এবং যার যজ্ঞোপবীত ধারণরূপ সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে, সে ক্ষার লবণ বর্জিত ভিক্ষান্ন ভক্ষণের দ্বারা জীবন-যাপন করবে, এক বৎসর ধরে দিনে (সম্ভব হলে) তিন বার অবগাহন করবে এবং তারপর বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করবে। এ ছিল কিছুটা সহজ ব্রহ্মচর্যা। কিন্তু অন্যান্য অনেক ধর্মশাস্ত্রে কঠোর বিধি পালনের নির্দেশ আছে। ভাস ধর্মসূত্র XI. ৭৬-৭৯ এবং বৈক স্মৃতি ১১.৩ অনুসারে একজন পতিতসাবিত্রীক হয় উদ্দালক ব্রত পালন করবে অথবা কোনও অশ্বমেধ যজ্ঞের হোত্রীর সঙ্গে অবগাহন করবে কিংবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করবে। (কানে রচিত 'হিস্ট্রি অব্ ধর্মশাস্ত্র' দ্রষ্টব্য)।

কোনও প্রকার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত না। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও তাদের জন্য নিয়ম শিথিল করে উপনয়নের ব্যবস্থা[১৪] করা হত যদি তারা নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করত।

শুধু তাই নয়, প্রপিতামহ থেকে বর্তমান পুরুষ পর্যন্ত কারোর-ই যদি উপনয়ন না হয়ে থাকে, তাদের বর্তমান পুরুষ ইচ্ছা করলে উপনয়নের অধিকার পেত যদি সে এর জন্য নির্ধারিত দণ্ডভোগ গ্রহণ করত। এই শাস্তি ছিল ১২ বছর পর্যন্ত আচার্যের ছাত্র হয়ে অধ্যয়ন করা, পবসান জলে স্নান এবং স্তোত্র আবৃত্তি প্রভৃতি। তার উপনয়নের সময় তাকে গার্হস্থ্য কর্ম সম্পর্কে উপদেশ দান করা হত[১৫]। তার নিজের যদিও বেদ পাঠের কোনও অধিকার ছিল না, তার পুত্রের জন্য সংস্কার সম্পন্ন করে পতিত সাবিত্রিকের ন্যায় আর্য সমাজের অন্যদের মত অধিকার দেওয়া হত।

ব্রাত্যদেরও উপনয়ন হত। তবে একথা বলা শক্ত, কারা এই ব্রাত্য ছিল। আর্যদের মধ্যে পরস্পর তিন পুরুষ ধরে যাদের উপনয়ন হত না অথবা অনার্য যারা কোনও দিন আর্য নিয়মের অধীন ছিল না এবং ব্রাহ্মণরা তাদের আর্যদের মতে আসার জন্য চেষ্টা করত—এদের মধ্যে ব্রাত্য কারা তা স্পষ্ট ছিল না। তবে মনে হয় সম্ভবত এই দুই গোষ্ঠীর লোকদের-ই ব্রাত্য বলা হত। কিন্তু সে যাই হোক না কেন ব্রাত্যস্তোম যদি ব্রাত্যস্তমাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত, তাহলে তাদের উপনয়ন হত। ব্রাত্যরা প্রকৃত অর্থে ব্রাত্য জীবন যাপন করত। তারা যেহেতু ব্রহ্মচর্য পালন করত না, ভূমি কর্ষণ করত না এবং ব্যবসা বাণিজ্যে নিজেদের নিয়োজিত করত না, তাদের মর্যাদা ক্রমশই নিচু থেকে আরও নিচুতে চলে যায়। চার ধরনের ব্রাত্যস্তোম (এক ধরনের যজ্ঞ) অনুষ্ঠান হত। এর মধ্যে প্রথমটি ব্রাত্যদের কাছে উন্মুক্ত ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল অভিশপ্তদের জন্য। এরা ছিল অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির, তাদের কাজকর্ম ছিল পাপপূর্ণ এবং এদের কাজকর্মের প্রতি সমাজ লক্ষ্য রাখত এবং এর ফলে তারা ব্রাত্য জীবন যাপন করত। তৃতীয়টি ছিল অল্পবয়স্ক ব্রাত্যদের

১৪. আপস্তম্ব ধর্মসূত্র I.I.I. ৩২.২.৪-এ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। এর মধ্যে রয়েছে এক বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যা পালন (যাদের উপনয়ন হয়নি) এবং যাদের উপনয়ন হয়েছে তাদের এক বৎসর পর্যন্ত মন্ত্রপাঠ ও অবগাহন (এক বা তিন বার)। মন্ত্রগুলি হল সাত পবশন, যেগুলির আরম্ভ 'যদন্তি যচ্চ দূরকে' (যেখানে যত ভয় আমার) ঋগ্বেদ IX. ৬৭.২১-২৭ এর সঙ্গে 'যজুস পবিত্র' তৈত্তিরীয় সংহিতা (I.২.১), (ঋগ্বেদ XVII. ১৭.১০), সামপবিত্র তথা অঙ্গীরস (ঋগ্বেদ IV. ৪০.৫) পাঠ করব অথবা 'ব্যাহৃতি'র (গায়ত্রী মন্ত্র) সঙ্গে জল দিয়ে অর্ঘ্য দান। এর পরেই বেদ পাঠ করা যেতে পারে। (কানে, পৃঃ ৩৭৮)

১৫. আপস্তম্ভ ধর্ম সূত্র, I.I. ২.৫.১০

জন্য এবং চতুর্থটি ছিল যারা বয়স্ক অথচ ব্রাত্য জীবন যাপন করত। প্রতিটি ব্রাত্যস্তোমেই ষোড়স্তোম[১৬] (১৬টি মন্ত্রের যজ্ঞ) পালন করা হত। ষোড়স্তোম অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়েই তারা এই উঁচুস্তরে পৌঁছতে পারত। মনে করা হত সদাসপ্তম অনুষ্ঠান পালন করলেই সব প্রকার দোষ দূর হয়ে যায়। ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞের পর তারা আর ব্রাত্যে বলে পরিচিত হত না। এর পর তারা গোঁড়া আর্যদের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত। এই ভাবে তাদের উপনয়ন হওয়ার পর তারা বেদ অধ্যয়নের অধিকার পেত।

ব্রাত্যত্ব শুদ্ধি সংগ্রহ[১৭] অনুযায়ী এক পরিবার বারো পুরুষ পরও উপযুক্ত শাস্তির বিনিময়ে শুদ্ধীকরণের সুযোগ পেত। বোধায়নে উপনয়নকে এত উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছিল যে অশ্বত্থ বৃক্ষেরও উপনয়ন হত।

এইসব তথ্য জানার পর একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, আদি যুগে আর্য সমাজে মহিলা ও শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন ইন্দো-আর্য সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ইন্দো-ইরানীয়দের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্দো-ইরানী সমাজে সব শ্রেণীর সব পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পবিত্র সূত্র ধারণ করার রীতি প্রচলিত ছিল। এখন কাজ হল ইন্দো-আর্য সমাজে ঐ একই প্রথা প্রচলিত কিনা তা প্রমাণ করা। এর জন্য শুধুমাত্র ঘটনাক্রমের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে, যার দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে যে এক সময় পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই উপনয়নের অধিকার ছিল এবং তা পালন করা হত।

মহিলাদের উপনয়নের[১৮] প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে যে সব বিবৃতি রয়েছে প্রমাণের পক্ষে তা যথেষ্ট। যদি কেউ ঐ সব বিবৃতি অনুসন্ধান করে দেখেন তাহলে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, মহিলাদের জন্যও উপনয়ন উন্মুক্ত ছিল। ঐ সময় মহিলারা শুধুমাত্র যে বেদ অধ্যয়ন করতেন তাই নয়, তাঁরা বেদ শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ও পরিচালনা করতেন। এমনকি তাঁরা পূর্ব মীমাংসার ওপরে টীকা ভাষ্যও রচনা করেন।

---

১৬. তদেব, পৃ : ৩৮৫। অধ্যাপক কানে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ (XVII. ১.১)-এর উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে যখন দেবতারা স্বর্গে চলে যান, তখন ব্রাত্যদের মর্ত্যে রেখে যান। দেবতাদের করুণায় পরে তারা ষোড়স্তোম মন্ত্র পাঠ করে (অনুষ্টুপ ছন্দে) স্বর্গে যেতে সমর্থ হয়।

১৭. তদেব, কানে, পৃ : ৩৮৭

১৮. পুরুষার্থ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

শূদ্রদের ক্ষেত্রেও উপনয়নের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাও সমভাবে ইতিবাচক। রাজা সুদাস যদি ক্ষত্রিয় হন এবং সেই শূদ্র রাজার রাজ্যাভিষেক উৎসব যদি বশিষ্ঠ সম্পন্ন করে থাকেন এবং তিনি যদি রাজসূয় যজ্ঞ করে থাকেন তখন আর কোনও সন্দেহই থাকে না যে, শূদ্ররা এক সময় পবিত্র উপবীত ধারণ করতেন। ঘটনা পরম্পরার এই সাক্ষ্য প্রমাণ এবং গ্রন্থকারদের দেওয়া প্রমাণ ছাড়াও অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার[১৯] সংস্কার গণপতিতে উল্লেখ করেছেন যে সেই সময় শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার ছিল।

মহিলা এবং শূদ্রদের ক্ষেত্রে উপনয়নের বিষয়ে একমাত্র পার্থক্য হল মহিলাদের উপনয়ন প্রথা বন্ধ হবার পশ্চাতে আপাতগ্রাহ্য কিছু কারণ দেখান হয়েছে কিন্তু শূদ্রদের উপনয়ন বন্ধ করে দেওয়ার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দর্শানো হয়নি। বলা হয়েছে মহিলাদের উপনয়ন প্রথা চালু ছিল যতদিন তাদের উপনয়ন ও বিবাহের বয়স আলাদা ছিল। কথিত আছে প্রাচীনকালে উপনয়নের বয়ঃসীমা ছিল আট এবং বিবাহের বয়স ছিল তার থেকে বেশি। কিন্তু পরবর্তীকালে মেয়েদের বিবাহের বয়স আট-এ নামিয়ে আনা হয় এবং আলাদাভাবে তাদের উপনয়ন অনুষ্ঠান করা হতে থাকে এবং তা বিবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই ব্যাখ্যা সঠিক কি ভুল তা অবশ্য অন্য ব্যাপার কিন্তু কথা হচ্ছে শূদ্রদের উপনয়ন নিয়ে। এক সময় যখন শূদ্রদের ক্ষেত্রে উপনয়ন উন্মুক্ত ছিল এবং তা পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু এর কোনও কারণ দেখান হয়নি।

আমি যে সব সাক্ষ্য প্রমাণের উল্লেখ করেছি তারপরও যদি কেউ তাদের বিরোধিতা নিয়ে অটল থাকে, তাহলে তাদের মনে করা উচিত এটা তাদের একগুঁয়েমি এবং দুর্বলতা। যদি ধরে নেওয়া হয় শূদ্রদের কখনই উপনয়নের সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া হত না। তাহলে তাদের এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে যে কেন তাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল? যাঁরা অত্যন্ত গোঁড়া, তাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন যে, শূদ্রদের কোনও উপনয়ন ছিল না। কিন্তু কেন শূদ্রদের উপনয়ন ছিল না, সে সম্পর্কে কিন্তু তাঁরা নীরব।

শূদ্রদের উপনয়ন না থাকার ব্যাখ্যা হল এই যে, বর্তমান গবেষকদের মতে তারা আর্য ছিল না। কিন্তু একথা যে পুরোপুরি ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন তা দেখান হয়েছে। ঘটনা হল হয় শূদ্রদের একসময় উপনয়ন প্রথা চালু ছিল এবং পরে তা

১৯. হিস্ট্রি অব্ এইনশনট্ সংস্কৃত লিটারেচার, (১৮৬০), পৃ : ২০৭

বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথবা একেবারে শুরু থেকেই তাদের উপনয়ন স্থগিত করে রাখা হয়েছে। এর যে কোনওটিই সত্য হতে পারে। এর যে কোনওটিকে সত্য বলে ধরে নেওয়ার আগে, এর পিছনে কারণ খুঁজতে হবে। শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনও কারণ দেখাতে না পারার জন্য আমার দেওয়া মতবাদের অনুকূলেই জনমতের যাওয়া উচিত। আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি, শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার ছিল। তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে এবং এই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার কারণও দর্শন হয়েছে।

পাঁচ

তৃতীয় আপত্তি প্রকৃতপক্ষে কোনও আপত্তিই নয়। উপনয়ন সংক্রান্ত সব ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞাত কোনও ব্যক্তিই একমাত্র এই ধরনের আপত্তি তুলতে পারে।

আর্য সমাজে কয়েকটি অনুষ্ঠানকে সংস্কার বলা হত। গৌতম ধর্মসূত্রে (VIII. ১৪-২৪) চল্লিশটি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল :

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, কৌল, উপনয়ন, বেদের চার ব্রত, স্নান অথবা সমাবর্তন, বিবাহ, (দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ব্রহ্মার জন্য) দৈনন্দিন পাঁচটি মহাযজ্ঞ, সাতটি পাকযজ্ঞ (যেমন অষ্টক, পর্বনাস্থালীপক্ব, শ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, অগ্রহায়ণী, চৈত্রী, এবং অশ্বযুজি), সাতটি হবির্যজ্ঞ—এতে অগ্নি আহুতি দিতে হবে কিন্তু সোমরস নয় (এগুলি হল অগ্নিযাধ্যেয়, অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস, অগ্রায়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরুদ্ধপশুবন্ধ এবং সৌত্রমনি) এবং সাত সোমযজ্ঞ (এগুলি হল অগ্নিস্তোম, আত্মাগ্নিস্তোম, উক্থ্যা, সোদাসিন, ভাজপেয়, অতিরত্র এবং অপ্তোয়)।

ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর অর্থে সংস্কারের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানা হয়েছে। বৃহত্তর অর্থে সংস্কার হচ্ছে যজ্ঞ এবং সেই কারণে যথার্থতার বিচারে যজ্ঞকে সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এবং এই জন্যই প্রকৃত অর্থ সংস্কারের সংখ্যা ষোলো করা হয়। সংস্কার সম্পর্কে অবাক হবার কিছু নেই। প্রত্যেক সমাজেই সংস্কারের স্বীকৃতি আছে। উদাহরণ স্বরূপ খ্রিস্টান সমাজেও অনেক সংস্কার প্রচলিত আছে। যেমন পবিত্র বারি দ্বারা অভিসিঞ্চন, দীক্ষানুষ্ঠান, বিবাহ, ধর্মীয় আলোচনা, যীশুর নৈশভোজ এবং পবিত্র আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রভৃতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের পথ। তবে এই সংস্কারের বিষয়ে ইন্দো-আর্য এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে এর ধারণা নিয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে, খ্রিস্টান ধর্মমতে সংস্কার অথবা ঈশ্বর চিন্তা সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়।

কতকগুলি অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের করুণা লাভের উপায়। এসবের কোনও সামাজিক গুরুত্ব নেই। ইন্দো-আর্য সমাজে আদিতেও সংস্কারের অর্থ ছিল পুরোপুরি আধ্যাত্মিক। পূর্ব মীমাংসার রচয়িতা জৈমিনি সংস্কার সম্পর্কে যা বলেছেন তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈমিনির মতে, সাধারণ তত্ত্ব হল সংস্কার পালনে শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সংস্কার এই বিষয়ে দুইভাবে কাজ করে। মানুষের দেহ-মন থেকে কালিমা মুছে নিয়ে নতুন শক্তি জোগায়। সংস্কার ব্যতীত মানুষ তার যজ্ঞের ফললাভ করতে পারে না, কারণ সংস্কার ছাড়া তারা এই কাজের যোগ্য নয়। অন্যান্য সংস্কারের মত উপনয়নও একটি সংস্কার এবং এর গুরুত্বও আধ্যাত্মিক। শূদ্রদের উপনয়ন অস্বীকার করার ফলে উপনয়নের গুরুত্বের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আসে। এর ফলে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ছাড়াও এর একটি সামাজিক গুরুত্ব দেখা যায়। এই সামাজিক গুরুত্ব ইতিপূর্বে ছিল না।

আর্য হোক আর অনার্য হোক, উপনয়ন যখন সবার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ছিল তখন এর কোনও সামাজিক গুরুত্ব ছিল না। সব শ্রেণীর মানুষের উপনয়নের অধিকার ছিল। এটি শুধু অল্প কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এরপর যখন শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল তখন উপবীত ধারণ একটি মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল এবং উপবীত না থাকাটা এক ধরনের ভৃত্যসুলভ ব্যাপারে পরিণত হল। শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার কেড়ে নেওয়ার পর তা ইন্দো-আর্য সমাজে নতুন মাত্রা পেল। এর ফলে শূদ্রদের মনে এই ধারণা হল, উচ্চবর্ণের জাতিরা সামাজিকভাবে তাদের থেকে ওপরে। এছাড়া উচ্চবর্ণের জাতিরা শূদ্রদের তাদের তুলনায় নিচু ভাবতে শুরু করল। এইভাবে উপনয়নের অধিকার হারানোর ফলে শূদ্রদের সামাজিক পতন শুরু হল।

উপনয়নের সঙ্গে আরও অনেক ঘটনা যুক্ত ছিল। পূর্ব মীমাংসার[২০] বিধি অনুসারে এ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই সব বিধির মধ্যে অন্যতম হল সব সম্পত্তি প্রাথমিকভাবে এমন ব্যক্তির অধিকারে থাকবে যার যজ্ঞ[২১] করার ক্ষমতা আছে। যজ্ঞ করার ক্ষমতার ওপর সম্পত্তির অধিকার নির্ভর করত। অন্যভাবে বলতে গেলে, যে ব্যক্তির যজ্ঞ করার ক্ষমতা নেই সম্পত্তির ওপরও তার কোনও অধিকার

---

২০. পূর্ব মীমাংসা, শ্রী গঙ্গানাথ ঝা, পৃ : ৩৬৮-৩৬৯ এবং ১৭১-১৭২ দ্রষ্টব্য।

২১. অনেকেই বুঝতে পারে না, কেন মনুস্মৃতি এবং অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে শূদ্র এবং নারীদের সম্পত্তি এবং বেদপাঠ থেকে বঞ্চিত করা হল। তবে যদি উপলব্ধি করা যায় যে, এই প্রতিবন্ধ সেই নিয়মের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি যা পূর্ব মীমাংসা চাপিয়ে দিয়েছে, তাহলে এ-ধারণার সমাপ্তি ঘটে।

নেই। যজ্ঞ করার ক্ষমতা নির্ভর করত উপনয়নের ওপর। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, একমাত্র যাদের উপনয়ন হত তারাই সম্পত্তির অধিকারী হত।

পূর্ব মীমাংসার দ্বিতীয় নীতি হল যজ্ঞের সময় বেদ মন্ত্র উচ্চারণ আবশ্যিক। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি উৎসর্গ করবে অবশ্যই তার বেদ অধ্যয়ন করা আছে। যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করেনি তার উৎসর্গ করার কোনও অধিকার নেই। একমাত্র যাদের উপনয়ন হয়েছে শুধু তাদেরই বেদ অধ্যয়নের অধিকার আছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের উপায় হল বেদ অধ্যয়ন এবং সেই বেদ অধ্যয়ন-ই নির্ভর করত উপনয়নের ওপর। উপনয়ন না হলে জ্ঞানার্জনের সব পথই বন্ধ। উপনয়ন শুধুমাত্র অর্থহীন অনুষ্ঠান নয়। উপনয়নের সঙ্গে যুক্ত বড় দুটি বিষয় হল—সম্পত্তি ও জ্ঞানার্জনের অধিকার লাভ।

উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার পর শূদ্রদের কি সাংঘাতিক সামাজিক পতন হয়েছে একথা যারা না বুঝার চেষ্টা করে তারা উল্লিখিত পূর্ব মীমাংসার বিধিগুলি মনে রাখলেই বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারবে। সম্পত্তির অধিকার ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে উপনয়নের কি সম্পর্ক, তা হৃদয়ঙ্গম করায় একথা উপলব্ধি করতে আর কোনও অসুবিধা হবে না যে উপনয়নের অধিকার হারানোর ফলে শূদ্রদের কীভাবে পতন ঘটেছে।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে দেখা যাবে প্রাচীন আর্য সমাজে উপনয়ন অনুষ্ঠানের কতটা গুরুত্ব ছিল এবং কীভাবে এর ওপর সামাজিক মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত অধিকার নির্ভর করত। উপনয়ন ব্যতিরেকে একজন মানুষ সামাজিকভাবে পতিত হত এবং সে হয়ে যেত মূর্খ এবং দরিদ্র। শূদ্রদের ওপর নিপীড়ন চালানোর জন্য তাদের উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি ব্রাহ্মণদের কাছে ছিল ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। এর ফল হল আণবিক বোমা বিস্ফোরণের সমতুল। ব্রাহ্মণদের ভাষায় এর ফলে শূদ্রদের ভাগাড়ে নিক্ষেপ করা হল।

ছয়

উপনয়ন অস্বীকার করার ক্ষমতা যে ব্রাহ্মণদের ছিল এতে কোনও সংশয় নেই। তবে একটা ব্যাপারে সংশয় জাগে এবং তা হল ব্রাহ্মণদের যে উপনয়নের অধিকার অস্বীকার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এমন কথা কোথাও কোথাও পরিষ্কারভাবে বলা নেই। কোনও মানুষের মনে এ ধরনের সন্দেহ থাক বা না থাক, সে এক-ই

কথা, কিন্তু ইন্দো-আর্য সমাজের ধর্মীয় প্রথায় অত্যাচার ও নিপীড়নের দিকটা কতটা ব্যাপক ছিল তা দুটি বিষয় থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় :

এগুলি হল (১) উপনয়ন অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য করার একছত্র অধিকার এবং (২) কোনও ব্রাহ্মণ বিধি বহির্ভূত উপনয়ন সম্পন্ন করলে তার ওপর আরোপিত শাস্তি।

সম্ভবত এমন হতে পারে যে, অত্যন্ত আদিতে পিতাই তার পুত্রকে গায়ত্রী মন্ত্র শিক্ষা দিতেন এবং এর সঙ্গে তার বেদ শিক্ষা শুরু হত। উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্ভবত পরবর্তীকালে চালু হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই উপনয়ন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য গুরু অথবা শিক্ষক নিয়োগ করা হত। সেই গুরুকে বলা হত আচার্য এবং বালকটিকে আচার্যের গৃহে অবস্থান করতে হত।

এই আচার্য কে হবেন এবং সেই আচার্যের যোগ্যতাই বা কি হবে, তা নিয়ে বহু প্রাচীনকালে থেকেই আলোচনা হয়ে আসছে। আচার্যকে হতে হবে বেদে সুপণ্ডিত। একটি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে[২২] আছে, যে আচার্যের বিদ্যার গভীরতা নেই, তার ছাত্র অন্ধকার থেকে অন্ধকারে ডুবে যায় এবং ঐ অশিক্ষিত আচার্য নিজেও অন্ধকারে নিমজ্জিত হন।

(আপস্তম্ব ধর্মসূত্র I.I.I, কানে, ১২-১৩) এ বলা হয়েছে উপনয়নের জন্য এমন আচার্য নিয়োগ করতে হবে যিনি হবেন প্রকৃত বিদ্বান। যার পরিবার উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্বান, তিনি হবেন ধীর শান্ত প্রকৃতির, বেদে পারঙ্গম এবং ধর্মে[২৩] মতিমান। কিন্তু আচার্যের সবথেকে বড় যোগ্যতা হবে যে, তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণ হবেন। শুধুমাত্র সঙ্কটের সময় অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি যখন ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না তখনই কোনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আচার্য[২৪] হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এই ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা তখনই চালু ছিল যখন বেদ শিক্ষা এবং বেদ শিক্ষাদানের বৈষম্য চালু হল তখন থেকে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করতে পারতেন এবং অতি প্রাচীন

২২. ধর্মসূত্র, কানে, পৃ : ৩২৪, উদ্ধৃত

২৩. আচার্য বেদ-বিজ্ঞ, ধর্মবিদ, কুলিন, পবিত্র এবং গোত্রীয় হবেন এবং অলস হবেন না।

২৪. খুব-ই আশ্চর্য হবার মতো বিষয় যে, একজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গুরুকে কেবল অনুসরণ করে। গুরুর দেহ মালিশ বা পদসেবা করতে পারে না। দ্রষ্টব্য : আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, II. ২৪. ২৫-২৮ গৌত, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, I.II. ৪০-৪২, মনু, II. ২৪১। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণ শিষ্য কর্তৃক কেবল অনুরুদ্ধ হলেই ক্ষত্রিয় ব৷ বৈশ্য গুরু হতে পারেন।

কাল থেকেই এই বৈষম্য চালু ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টা ছিল বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিরোধ চলাকালীন এবং সেই সময় থেকে উপনয়নে পৌরোহিত্য করার অধিকার পুরোপুরি ব্রাহ্মণদের অধিকারে চলে যায়। অতএব একটি বিষয় সমাজে স্বীকৃত হয়ে যায় যে, একমাত্র ব্রাহ্মণরাই উপনয়ন সম্পন্ন করতে পারবেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ উপনয়ন সম্পন্ন করলে তা প্রকৃত উপনয়ন বলে স্বীকৃত হবে না। এছাড়া ইন্দো-আর্য ধর্মীয় ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের ওপর আর একটি বাধ্যতামূলক বিষয় চাপিয়ে দেওয়া হয় যে ধর্মের স্বীকৃতি ছাড়া কোনও কাজ করতে পারবেন না। যদি কোনও ব্রাহ্মণ এমন কাজ করেন তাহলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রাচীন আইন গ্রন্থে এ ধরনের অনেক শাস্তির কথা বলা আছে। আমি মনু এবং পরাশর থেকে কিছু উল্লেখ করছি। মনু বলেছেন, কোনও শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ঈশ্বর এবং মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার অনুপযুক্ত বিবেচিত হবেন। তিনি তাঁর এই তালিকায় বলেছেন :

'যে আচার্য দক্ষিণার বিনিময়ে শিক্ষা দেন এবং যে ছাত্রকে ঐ শর্তে শিক্ষা দেওয়া হয়, যে গুরু শূদ্র ছাত্রদের শিক্ষা দেন এবং যে ছাত্রদের গুরু শূদ্র, যিনি কর্কশভাষী, যে ব্যক্তি জারজ সন্তান এবং যে বিধবার পুত্র তার আচার্য হওয়ার অধিকার নেই'।[২৫]

'যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণার বিনিময়ে শূদ্রের জন্য অগ্নিতে নৈবেদ্য দেয়, সে শূদ্র হয়ে যাবে। এবং যে শূদ্রের জন্য ঐ ব্রাহ্মণ অগ্নিতে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন সেই শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। মাধবের মতে এই কাজের জন্য শূদ্র পুণ্য ভোগ করে এবং ব্রাহ্মণ পাপী বলে গণ্য হবে'।

যারা প্রশ্ন করে, শূদ্রদের স্বার্থে উপনয়ন সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণরা তাদের কি অধিকার হারাল তাদের উদ্দেশ্যে দুটি বিষয় বলা যেতে পারে : (১) উপনয়নে পৌরোহিত্য করার একচ্ছত্র অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের। (২) বিধি-বিরুদ্ধ উপনয়ন করলে সেই ব্রাহ্মণকে দণ্ডভোগ করতে হত। যদি কোনও ব্রাহ্মণ এই বিধি-বিরুদ্ধ কাজ করতেন তাহলে তাঁর উপনয়নের এবং উপনয়নে পৌরোহিত্য করার এই দুই অধিকার-ই কেড়ে নেওয়া হত। এটি অবশ্য ঘটনা যে, ব্রাহ্মণদের থেকে সরাসরি

২৫. ব্যাস কৃত 'ব্যবহার ময়ূখ', (কানে কর্তৃক সম্পাদিত) থেকে উদ্ধৃত।

ঐ অধিকার নিয়ে নেওয়া হত না, এবং তার প্রয়োজনও ছিল না। এই অধিকার হরণ করা হত অপ্রত্যক্ষভাবে কিন্তু অধিকতর ক্ষেত্রে বাস্তবে। ব্রাহ্মণদের যে উপনয়ন অস্বীকার করার এই ক্ষমতা ছিল, সে সম্পর্কে তারা যে পূর্ণ সচেতন ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। তথ্য প্রমাণে দেখা যায়, এই ধরনের ১৬টি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যেখানে ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর এই নিপীড়ন চালিয়েছে। ৯টি ঘটনায় তারা কায়স্থদের চ্যালেঞ্জ করেছেন, চারটি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে পাঞ্চালদের এবং একটি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে পালশদের। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁরা এ ব্যাপারে দুইজন মারাঠা রাজাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। ৫৫৬ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে এইসব ঘটনা ঘটে। তবে একথা সত্য যে এইসব ঘটনা প্রাচীনকালের নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, উপনয়ন অস্বীকার করার ক্ষমতা যে ব্রাহ্মণদের ছিল এইসব ঘটনায় তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ক্ষমতা ব্রাহ্মণরা পেয়েছিলেন অত্যন্ত প্রাচীনকালেই। ব্রাহ্মণরা তখন-ই যে এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন তার সমর্থনে প্রমাণও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ সত্যকাম জাবালির ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঘটনা অত্যন্ত প্রাচীন। ঐ ঘটনা প্রমাণ করে যে কোনও ব্যক্তির শ্রেণী নির্ভর করত তার আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর ওপর, তার জন্মের দ্বারা নয়। একথা যদিও সত্য, তথাপি জাবালির ঘটনা প্রমাণ করে যে, এমনকি অত্যন্ত প্রাচীনকালেও ব্রাহ্মণরা উপনয়ন অস্বীকার করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন।

এইসব ঘটনাবলির উল্লেখ আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে কোনও সাহায্য করবে না যদি না ঐ সব উদাহরণ থেকে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারি। এই কাজ করতে হলে আমাদের ঐসব ঘটনার প্রতি ক্ষেত্রের বিশদ বিবরণ জানা চাই। দুর্ভাগ্যক্রমে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট নয়। একটি মাত্র ঘটনারই আমরা বিশদ বিবরণ পাই। ঘটনাটি হল ব্রাহ্মণ বনাম শিবাজির। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ আমাদের জানা আছে। ঘটনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অতএব এ নিয়ে বিশদ গবেষণা করা যেতে পারে। এই ঘটনা থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌছান যায়, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবানই শুধু নয় আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ওপর তা যথেষ্ট আলোকপাতও করে।

সাত

একথা সবারই জানা যে মহারাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে শিবাজি একটি স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। রাজ্য গঠনের পর শিবাজি মনে মনে চিন্তা করলেন, অভিষেক উৎসবের মাধ্যমে তিনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করবেন। শিবাজি ও তাঁর বন্ধুদের মনে হল, ঐ অভিষেক উৎসবকে অর্থবহ করে তোলার জন্য অবশ্যই বৈদিক মতে করতে হবে। কিন্তু শিবাজি দেখলেন তাঁর ইচ্ছাপূরণের সামনে বিস্তর বাধা। তাঁর এই অভিষেক বৈদিক মতে করতে হলে তা সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণদের ওপর নির্ভরশীল। এই অভিষেক উৎসব সম্পন্ন করার জন্য ধর্মীয় বিচারে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত তিনি আরও দেখলেন, তিনি যদি নিজেকে ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে এই ধরনের কোনও অভিষেক উৎসব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এছাড়া আরও একটি অসুবিধা ছিল। তিনি যদি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে প্রমাণও করতে পারেন তাহলেও সমস্যা হচ্ছে যে তাঁর উপনয়নের বয়স পার হয়ে গেছে এবং উপনয়ন ছাড়া কোনও অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হবে না। এই অসুবিধা এমন কোনও মারাত্মক ছিল না, কারণ ব্রাত্যস্তোম অনুষ্ঠানের দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যায়। কিন্তু প্রথম অসুবিধাই বড় ধরনের বাধাস্বরূপ। এর ওপরই শিবাজির মর্যাদা নির্ভরশীল। এখন প্রশ্ন হল শিবাজি কি ক্ষত্রিয় ছিলেন? এই সমস্যার সমাধান করা গেলে অন্যগুলি সহজ হয়ে দাঁড়ায়। শিবাজিকে ক্ষত্রিয় বলে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি ছিল। তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন ব্রাহ্মণরাই এবং তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁরই প্রধানমন্ত্রী মোরোপন্ত পিংলে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মারাঠা সর্দারগণও তাঁকে এই সামাজিক স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করলেন। তাঁদের মতে শিবাজি শূদ্র ছিলেন।[২৬] ক্ষত্রিয় বলে শিবাজির দাবির সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘাত হওয়ার আরও কারণ এই যে দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণা বদ্ধমূল

---

২৬. রাজ্যাভিষেকের উদ্ভব সম্বন্ধে কিনকেড একটি আকর্ষক পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'যদিও দক্ষিণের উচ্চ বিচার সম্পন্ন সামন্তরা শিবাজিকে প্রসন্নতাপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সেই ঘটনাকে পূর্বাধিকার হিসাবে মান্যতা দিতে চাননি। সম্রাটের ভোজসভায় সিংহাসনে বসার জন্য তাঁরা মোহিতে, নিম্বলকর, সাবন্ত অথবা ঘোড়পাড়ের পরিবর্তে একজন ভোসলেকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি তাঁর সচিব বালাজি আয়াজি চিটানিসকে একথা বলেন এবং বারাণসীর পুরোহিতের কাছ থেকে শিরোভূষণ নিতে বলেন—মোগল সম্রাটের কাছ থেকে নয়। মহারাজ তাঁর মাতা জিজাবাঈ, সন্ত রামদাস এবং আরাধ্য দেবী ভবানীর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং সকলেই যে সচিবের মতামতের অনুসারী, তা লক্ষ্য করেন। (হিস্ট্রি অব্ মহারাষ্ট্র, পৃ : ২৪৪) এর থেকে মনে করা যেতে পারে, আইনগত বা সামাজিক মান্যতার চেয়ে পূর্বাধিকার চায় এই অনুষ্ঠান।

হয়ে গিয়েছিল যে কলিযুগে কোনও ক্ষত্রিয় নেই এবং শিবাজি কলিযুগেরই মানুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয় হতে পারেন না। ক্ষত্রিয় হিসাবে তাঁর দাবির আরও বিরোধিতা করা হল এই কারণে, যে তাঁর না হয়েছে কোনও উপনয়ন অনুষ্ঠান অথবা উপযুক্ত বয়সে তিনি না ধারণ করেছেন পবিত্র উপবীত। কারণ শাস্ত্রে বলা আছে, ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে ১১ বছর বয়সে উপবীত ধারণ করতে হবে এবং এই উপবীত ধারণ না করাটাই তাঁর শূদ্রত্বের পরিচয়। এই বিপদে শিবাজি অবশ্য বারাণসীর বিখ্যাত ব্রাহ্মণ গগাভাটের সমর্থন পেয়েছিলেন। তিনি বেদ ও শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। গগাভাট শিবাজির সব সমস্যা দূর করে দেন এবং শিবাজির জন্য রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন করান। ১৬৭৪ সালে ৬ই জুন তারিখ শিবাজির রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রায়গড়ে এই রাজ্যাভিষেক[২৭] অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে তাঁর জন্য ব্রাত্যস্তোম অনুষ্ঠান করা হয় এবং পরে উপনয়ন সম্পন্ন হয়।

---

২৭. এর থেকে মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করাতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু বৈদিক রীতি অনুসারে নয় অর্থাৎ শূদ্ররা যেভাবে পৌরাণিক রীতি অনুযায়ী করে। তাঁরা ভবিষ্যবাণী করেছিলেন যে, বৈদিক রীতিতে শিবাজির রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান করলে অনেক কিছু অশুভ হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুষ্ঠানটি অশুভ হয়েছিল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিবাজি আবার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান করেছিলেন অবৈদিক রীতিতে। দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেকের বিবরণ শ্রী সি. ভি. বৈদ্যের পরবর্তী বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। অসন্তুষ্ট এবং বাধাদানকারী ব্রাহ্মণরা আগের মতোই উপস্থিত ছিল। তাঁরা মনে করেন যে, অনুষ্ঠানটি ঠিক রীতি অনুযায়ী হয়নি, যদিও সারা মহারাষ্ট্র তা মেনে নিয়েছিল। 'রাজ্যাভিষেক কল্পতরু' শীর্ষক একটি কবিতা, যার একটি প্রতিলিপি বেঙ্গল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে এবং যেটি পুণের 'ইতিহাস মন্ডল' (ত্রৈমাসিক, খণ্ড X. ১) প্রকাশ করেছিল, যাতে এই অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছু আপত্তির কথা রয়েছে। কবিতাটি সমসাময়িক ছিল না। কারণ তাতে বলা হয়েছে যে শিবাজি শিবের অবতার (বিষ্ণুর নয়—শৈব ভারতে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে)। অবশ্য উক্ত কবিতাটি রচনার সময় ধরা হয়ে থাকে রাজারামের কালকে। এই কবিতায় বারাণসীর এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ নিশ্চলপুরীর সঙ্গে যিনি গগাভাটের বিরোধী ছিলেন এবং কোঙ্কণের গোবিন্দভাট ভার্বের একটি কাল্পনিক সংলাপ রয়েছে। এতে রাজ্যাভিষের পূর্ব ও পরবর্তী কিছু অশুভ ঘটনার কথা আছে। যেমন, প্রতাপরাও গুজ্জর এবং শিবাজির পত্নী কাশীবাঈয়ের মৃত্যু এবং তাঁর নিজের ঘরের চাল ভেঙে তার নাকে আঘাতের কথা। অনুষ্ঠানের অনেক ত্রুটির কথাও আছে। অনুষ্ঠানের পরে যখন শিবাজি রথে চড়ে ফিরছিলেন, তখন তাঁর সামনে বসেছিলেন গগাভাট। অনুষ্ঠানটি দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে নিশ্চলপুরী দুর্গ ছেড়ে চলে যান। যাবার আগে শিবাজিকে বলে যাঁন যে, আগত ১৩, ২২ এবং ৫৫ দিনের মধ্যে কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে। ১৩ দিনের দিন শিবাজির মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর প্রতাপগড়ের ঘোড়শালে আগুন লাগে এবং শিবাজির একটি হাতি দগ্ধ হয়। উদ্বিগ্ন শিবাজি নিশ্চলপুরীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর পৌরোহিত্যে নতুন রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করেন, বৈদিক রীতিতে নয়—তান্ত্রিক রীতিতে। এই অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে এতে। সামবেদ থেকে কিছু মন্ত্র পাঠ করার কথাও আছে। আশ্বিন শুদ্ধ পঞ্চমী (ললিত পঞ্চমী ১৫৯৬) তিথিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়—কবিতাটির অন্তিমে একথা বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন জে এবং মুসলমান অভিলেখে (record), নিশ্চলপুরীর কথাও আছে।—(শিবাজি, দি ফাউন্ডার অব্ মারাঠা স্বরাজ, পৃ : ২৫২-২৫৩।

বিভিন্ন কারণেই শিবাজির রাজ্যাভিষেকের ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই ঘটনা প্রমাণ করে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারও উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কোনও অধিকার নেই এবং ব্রাহ্মণরা স্বেচ্ছায় না করলে জোর করে উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য তাদের কেউ বাধ্য করতে পারে না। শিবাজি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন এবং নিজেকে মহাযোদ্ধা এবং ছত্রপতি বলে ঘোষণা করেন। তাঁর প্রজাদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্তু শিবাজি তাঁদের কাউকে দিয়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করতে বাধ্য করতে পারেননি।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে অনুষ্ঠানটিকে বৈধ করানোর জন্য একজন ব্রাহ্মণকে দিয়ে এটি সম্পন্ন করতে হবে। অব্রাহ্মণকে দিয়ে কোনও অনুষ্ঠান সম্পন্ন করালে তা হবে বিধি লঙ্ঘনের সামিল। শিবাজি ইচ্ছা করলেই কোনও অব্রাহ্মণকে দিয়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি সাহস পাননি। কারণ তিনি জানতেন তাহলে তাঁর রাজ্যাভিষেকের কোনও সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক গুরুত্ব থাকবে না।

তৃতীয়ত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে হিন্দুদের সামাজিক মর্যাদা যে ব্রাহ্মণরাই স্থির করেছেন এই ঘটনা তারই প্রমাণ। শিবাজির এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য প্রমাণিত। শিবাজি ক্ষত্রিয় একথা প্রমাণ করার জন্য তাঁর বন্ধু বালাজি আভাজি মেবার থেকে শিবাজির বংশ তালিকা উদ্ধার করেন। ঐ তালিকায় দেখা যায় শিবাজির বংশ মেবারের শিশোদীয় বংশের সঙ্গে যুক্ত এবং শিশোদীয়রা ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃত। তবে এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হয় যে ঐ বংশতালিকা জাল এবং শিবাজির রাজ্যাভিষেকের জন্য ঐ বংশ তালিকা তৈরি করা হয়েছিল।

এখন যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই বংশ তালিকা জাল নয় তাহলেও শিবাজি ক্ষত্রিয় ছিলেন তাঁর এই দাবি কীভাবে প্রমাণ করা যাবে? এই বংশ তালিকা থেকে শিবাজি যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তা প্রমাণ হওয়া দূরে থাক এবং শিশোদীয়রাই ক্ষত্রিয় ছিলেন কিনা এই প্রশ্নে জাগে। শিশোদীয়রা ছিলেন রাজপুত। এখন প্রশ্ন জাগে রাজপুতরা কি সেই ক্ষত্রিয় যারা ইন্দো-আর্য সমাজে দ্বিতীয় বর্ণভুক্ত ছিলেন? একদল বলেন তাঁরা ছিলেন বিদেশি এবং তাঁরা হুনদের বংশধর। এই হুনরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে রাজপুতনা এলাকায় তাঁদের রাজ্য স্থাপন করে। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার রুখতে ব্রাহ্মণরা তাঁদের ক্ষত্রিয় পদে উন্নীত করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের জন্য অগ্নিসাক্ষী করে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত এবং তাঁরা পরিচিত

হয় অগ্নিকুল ক্ষত্রিয় হিসাবে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই মত সমর্থন করেছেন।

ভিন্সেন্ট স্মিথ[২৮] বলেছেন :

'এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটি ঘটনা যে দীর্ঘদিন ধরে যা সন্দেহ করা হয়েছিল এবং বর্তমানে যা সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তা হল দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে রাজপুতনা এবং গঙ্গার অববাহিকা এলাকায় বিদেশি অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়নি। যুদ্ধের ফলে অনেক বিদেশি নিহত হয় ঠিকই আবার অনেক থেকেও যায় এবং তারা ভারতের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। তাদের বংশধরদের সংখ্যা কিন্তু এদেশে কম নয়। এই সব বিদেশি তাদের পূর্বসূরী শক এবং ইউ-চির মত হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশে যায় এবং দ্রুত তারা হিন্দু বলে পরিচিত হয়। যেসব গোষ্ঠী অথবা পরিবার গোষ্ঠীপতি হবার সুযোগ লাভ করল তাদের হিন্দু সমাজে নিয়ে নেওয়া হল এবং তারা ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুত হিসাবে পরিচিত হল। এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উত্তর ভারতের পরিহার এবং অনেক বিখ্যাত রাজপুত গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা ছিল বর্বর ও নিষ্ঠুর এইসব বিদেশিদের বংশধর যারা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এই বিদেশিরা গুর্জর বলে পরিচিত হল এবং বংশ গৌরবের দ্বারা রাজপুতদের নিচে ছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণেও বিভিন্ন দেশীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী উপজাতিরাও ঐ এক-ই ধরনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় হিন্দু সমাজে স্থান পায় এবং এইভাবে গোন্দ, ভর, খাড়োয়া প্রভৃতি চান্ডেল, রাঠোর, গহরওয়ার এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাজপুত বংশ হিসাবে পরিচিত হয়। এইসব গোষ্ঠীর বংশ তালিকা সুদূর অতীতের সূর্য এবং চন্দ্র বংশের সঙ্গে যুক্ত'।

উইলিয়ম ক্রুক[২৯] বলেছেন :

'আধুনিক গবেষণার ফলে রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে মধ্য যুগের রাজপুতদের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই প্রভেদ এত বেশি যে, তা এখন কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। এখন এটি নিশ্চিত যে অনেক গোষ্ঠীর উৎপত্তি শক, হুন অথবা কুষানদের সঙ্গে জড়িত। এই হুনরাই ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। গুর্জর উপজাতিদের সম্পর্ক ছিল হুনদের

২৮. হিস্ট্রি অব্ মেডিঈভ্যাল্ ইন্ডিয়া, সি. ভি. বৈদ্য, খণ্ড ২, পৃ : ৮, উদ্ধৃতি

২৯. তদেব, পৃ : ৮, উদ্ধৃতি

সঙ্গে। পরে তারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের নেতারা যেসব গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করে তা থেকে উচ্চ রাজপুত বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। যখন এই নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই রামায়ণ ও মহাভারতের বীরদের সঙ্গে তাদের যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন লোকগাথার, যাতে সূর্য ও চন্দ্র বংশের সঙ্গে ঐসব রাজপুত পরিবারের সংযোগ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারা ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুত বলে পরিচিত হবে তা নির্ভর করত তার বংশের ওপর নয় বরং তার মর্যাদার ওপর এবং এই কারণেই বিদেশিরা তাদের বংশ পরিচয় ছাড়াই এইসব গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিতি পেয়ে যায়। এই ব্যবস্থা তখন আংশিকভাবে চালু হয়েছে। কিন্তু ছদ্মবেশে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কিছু অসুবিধা দেখা দিল। এই অবস্থায় প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের নির্দেশমত শুদ্ধিকরণ অথবা অভিষেকের মাধ্যমে বিদেশিরা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে লাগল এবং তারা বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মের প্রভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণদের সহায়তা করতে লাগলেন। এই সুযোগ শুধুমাত্র চারটি গোষ্ঠীকেই দেওয়া হল। এরা পরিচিত হল অগ্নিকুল অথবা অগ্নিজাত হিসাবে। এই গোষ্ঠীগুলি হল পারমার, পরিহার, চালুক্য এবং চৌহান'।

ড: ভি. আর ভাণ্ডারকার[৩০] ঐ এক-ই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, রাজপুতরা গুর্জরদের বংশধর। গুর্জররা ছিল বিদেশি, সুতরাং রাজপুতরা হচ্ছে বিদেশিদের বংশধর। যে ব্রাহ্মণরা এইসব বিদেশি রাজপুতের অভিষেক সম্পন্ন করাতেন, তাঁদের উৎপত্তি সম্পর্কে এবং তাঁদের ক্ষত্রিয় বলে দাবির বিষয়ে তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা এই ঘটনা জানেন না মনে করে এমনভাবে ঐ অভিষেক সম্পন্ন করাতেন যে, এগুলি ব্রাহ্মণদের একটি পূর্ব সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত হল কলিযুগে কোনও ক্ষত্রিয় নেই। এটি একটি পুরনো এবং বহুদিনের সিদ্ধান্ত। আর ব্রাহ্মণদের যদি পূর্বেকার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনও শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তারা শিশোদীয় এবং শিবাজির ক্ষত্রিয় বলে দাবির বিরোধিতা করতে পারতেন। তারা যদি তাই করতেন তাহলে তাদের কেউ দোষারোপ করতে পারত না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা পূর্বেকার এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেয়নি। তাদের কাছে কোনও কিছুই অপরিবর্তনীয় ছিল না।

৩০. হিস্ট্রি অব্ মেডিঈভ্যাল ইন্ডিয়া, সি. ভি. বৈদ্য, খণ্ড ২, পৃ : ১০, উদ্ধৃতি। ড. বৈদ্য এই অভিমতের বিরোধী ছিলেন এবং রাজপুতরা বিদেশি নয়—আর্য ক্ষত্রিয় ছিল, একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ড. বৈদ্যের অভিমত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।

চতুর্থত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, মর্যাদার প্রশ্নে ব্রাহ্মণদের সিদ্ধান্ত ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের সিদ্ধান্তের মতো শিথিল ছিল এবং তা পণ্যের মত বিক্রি হত। শিবাজি সম্পর্কে গগাভাটের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না এবং শিবাজির রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করতে গিয়ে গগাভাট এবং অন্য পুরোহিতরা যে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন তা স্পষ্ট। শিবাজির রাজ্যাভিষেকে কত টাকা খরচ হয়েছিল এবং গগাভাট এবং অন্য ব্রাহ্মণরা তাঁদের কাজের জন্য কত অর্থ পেয়েছিলেন, তা একটি সূত্র থেকে জানা যায়। বৈদ্য[৩১] এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

'মন্ত্রীদের প্রত্যেককে এক লক্ষ হোন (Hon), একটি হাতি, একটি অশ্ব, পোশাক ও রত্নালঙ্কার দান করা হয়েছিল। আর সমগ্র রাজ্যাভিষেক উৎসবটি তদারকি করার জন্য গগাভাটকে দেওয়া হয় এক লক্ষ টাকা। অভিষেক উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিবাজি যে অর্থ দক্ষিণা হিসাবে দান করেন তার পরিমাণও ছিল বিরাট এবং ঐ পরিমাণ ছিল অনুষ্ঠানের উপযোগী। সভাসদগণের দেওয়া বিবরণে জানা যায় এই রাজ্যাভিষেকের জন্য শিবাজির খরচ হয়েছিল এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ হুন অর্থাৎ চার কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।

সভাসদগণ আরও জানিয়েছেন, শিবাজির এই রাজ্যাভিষেকে ৫০ হাজার বৈদিক ব্রাহ্মণ কাজ করেন।[৩২] এছাড়া ঐ উৎসবে হাজার হাজার যোগী এবং সন্ন্যাসী অংশ নেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপক আয়োজন ছিল এবং গাড়ি বোঝাই করে শষ্য দেওয়া হয়। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়, রাজ্যাভিষেকের পূর্বে শিবাজিকে সম ওজনের সোনার সঙ্গে ওজন করা হয়। এছাড়া অন্যান্য মূল্যবান ধাতু এবং পবিত্র জিনিসের সঙ্গেও তাঁকে ওজন করা হয়। ওলন্দাজদের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর শিবাজির রাজ্যাভিষেক হয়। ঐ বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে সতের হাজার হুন অথবা একশ ষাট পাউন্ড ওজন হয়েছিল শিবাজির এবং তাকে রুপো, তামা, লোহা, কর্পূর, লবণ, চিনি, মাখন, ফল এবং পানের সঙ্গেও ওজন করা হয়েছিল। ঐসব ওজন করা সামগ্রীর মূল্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। উৎসবের পর ৭ জুন সাধারণভাবে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতি ব্রাহ্মণ তিন থেকে পাঁচ টাকা করে এবং প্রতি মহিলা এবং শিশুকে দুই থেকে এক টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। মোট দক্ষিণার পরিমাণ দাঁড়ায় দেড় লক্ষ হোন।[৩৩]

৩১. শিবাজি, দি ফাউন্ডার অব্ মারাঠা স্বরাজ, সি.ভি. বৈদ্য, পৃ : ২৪৮ ও ২৫২

৩২. তদেব, বৈদ্য মনে করেন, এ তথ্য ভুল। আসল সংখ্যা হবে ৫০০০। কোনও তথ্য দেননি।

৩৩. এক হোন ছিল তিন টাকার সমান।

অক্সেন্ডেন তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন ১৮ মে থেকে ২৩ জুনের মধ্যে শিবাজিকে সোনার সঙ্গে ওজন করা হয়েছিল এবং তাঁর ওজন দাঁড়িয়েছিল ষোল হাজার হোন। এর সঙ্গে আরও ১ লক্ষ হোন ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল। ওলন্দাজদের বিবরণে আরও জানা যায় ব্রাত্য উৎসবের জন্য গগাভাটকে সাত হাজার হন এবং অন্য ব্রাহ্মণদের সতেরো হাজার হোন দেওয়া হয়েছিল। ৫ জুন শিবাজি পবিত্র গঙ্গায় স্নান করেন এবং সেখানে উপস্থিত প্রতি ব্রাহ্মণকে ১০০ হোন করে দেওয়া হয়'।

গগাভাটকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল তাকে কি শুধুমাত্র পুরোহিতের প্রাপ্য দক্ষিণা[৩৪] বলে ধরে নেওয়া যায়? একটি ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, গগাভাটকে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হয়নি। কারণ শিবাজির মন্ত্রীরা যে পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলেন সে তুলনায় গগাভাট অনেক কম পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোনও উপসংহারে আমার পূর্বে দুটি ঘটনা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এই দুটি ঘটনা এই যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়। প্রথমটি হচ্ছে, মন্ত্রীরাই শিবাজির রাজ্যাভিষেকে প্রচুর উপহার দেন। শিবাজির প্রধানমন্ত্রী অথবা পেশোয়া মজুমদার মোরোপন্ত পিংলে শিবাজিকে সাত হাজার হন দিয়েছিলেন এবং অন্য দুই মন্ত্রী শিবাজিকে পাঁচ হাজার হন দিয়েছিলেন। এই অর্থ বাদ দিলে শিবাজি তার মন্ত্রীদের যে অর্থ দিয়েছিলেন তার পরিমাণ যা দেখা যায় তার থেকে অনেক কম ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, শিবাজির এই মন্ত্রীরা তাঁর রাজ্যাভিষেকের প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শিবাজি ছিলেন শূদ্র এবং তাঁর এই ধরনের অভিষেকের কোনও অধিকার নেই। ঐ অধিকার আছে একমাত্র ক্ষত্রিয়দেরই। সুতরাং অবাক হওয়ার কিছু নেই, শিবাজি তাঁদের মুখ বন্ধ করা এবং স্থায়ীভাবে তাঁদের নিজের পক্ষে আনার জন্য তাঁদের প্রচুর উপঢৌকন দেন। অতএব শিবাজি তাঁর মন্ত্রীদের যে অর্থ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে শিবাজির রাজ্যাভিষেকের সময় পৌরোহিত্য করার জন্য গগাভাটকে যে অর্থ দেওয়া হয় এর কোনও তুলনা চলে না। প্রকৃতপক্ষে গগাভাট ঐ রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করার জন্য এমন সব শর্ত আরোপ করেন, তার ফলে অনেকের মনে হতে পারে এই কাজের জন্য তার নেওয়া দক্ষিণা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল এবং এর মধ্যে কিছু বেআইনি লেনদেন ছিল।

এই রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য যে লোকটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ

৩৪. শিবাজি, দি ফাউন্ডার অব্ মারাঠা স্বরাজ, সি.ভি. বৈদ্য, পৃ : ২৪৭

ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন শিবাজির ব্যক্তিগত সচিব বালাজি আওয়াজি। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের কায়স্থ। বালাজির এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হল, তিনি শিবাজির দূত হিসাবে তিনজন ব্রাহ্মণকে[৩৫] বারাণসীতে পাঠান গগাভাটকে আনার জন্য। কেন গগাভাটকে আসতে হবে ঐ তিন ব্রাহ্মণের কাছে সে সংবাদও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গগাভাট কি করলেন? তিনি ঐ তিন ব্রাহ্মণ দূতের কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন যে, এই আমন্ত্রণ তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় কারণ শিবাজি শূদ্র এবং শূদ্রের এই রাজ্যাভিষেকের কোনও অধিকার নেই। বালাজির এর পরের পদক্ষেপ হল ক্ষত্রিয় হিসাবে শিবাজির দাবির পক্ষে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা। তিনি এমন একটি বংশ তালিকা সংগ্রহ করলেন যাতে প্রমাণ ছিল শিবাজি শিশোদীয় বংশোদ্ভূত এবং শিশোদীয়রা ছিল মেবারের রাজপুত এবং রাজপুতরা ক্ষত্রিয়। এই প্রমাণপত্র বালাজি দূত মারফত আবার গগাভাটের কাছে পাঠালেন।[৩৬] এই বংশ তালিকা দেখে গগাভাট মেনে নিলেন শিবাজি ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং শিবাজির রাজ্যাভিষেক পৌরোহিত্য করতে সম্মত হলেন। কিন্তু এরপর গগাভাট উপস্থিত হয়ে কি করলেন? তিনি বললেন যে, তিনি ঐ বংশ তালিকা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন যে শিবাজি শূদ্র এবং রাজ্যাভিষেকের যোগ্য নন।

গগাভাটের এটিই প্রথম ব্যবসায়িক চাল ছিল না। তিনি আর একটি চাল দিলেন এই বলে যে, তিনি বালাজি আওয়াজির অভিষেক সম্পন্ন করতে রাজি আছেন, কারণ তিনি কায়স্থ এবং কায়স্থরা ক্ষত্রিয় কিন্তু শিবাজির নয় কারণ শিবাজি শূদ্র। গগাভাট কিন্তু এখানেই থামলেন না। তাঁর পরবর্তী চাল ছিল, তিনি হঠাৎ তাঁর মত পরিবর্তন করলেন এবং জানালেন শিবাজি ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং তিনি তাঁর রাজ্যাভিষেক করতে প্রস্তুত আছেন। শুধু তাই নয়, তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করলেন, যার নাম গগাভট্টি এবং ঐ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে কায়স্থরা জারজ।

এইসব চাল দেওয়া এবং পালটি চালের অর্থ কি বুঝায়? এতে কি বুঝায় না যে, গগাভাট শিবাজির রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করতে সম্পূর্ণ অসম্মত ছিলেন

---

৩৫. তাঁরা হলেন : (১) কেশব ভাট, (২) ভালচন্দ এবং (৩) সোমনাথ ভট্ট।

৩৬. দূতের নাম ছিল নীলো য়েশাজি। তিনি ছিলেন কায়স্থ। যে তিনজন ব্রাহ্মণকে আগে পাঠানো হয়েছিল, তারা ছিলেন শিবাজির বিরোধী এবং শিবাজির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। হয়তো বালাজি ভেবেছিলেন, যে চিঠি নিয়ে তারা ফিরে এসেছিলেন, তা ছিল চক্রান্তের ফলশ্রুতি। এই কারণেই বালাজি এবার একজন কায়স্থকে পাঠান।

এবং অর্থের বিনিময়ে তাঁকে রাজি করান হয়েছিল। এই যুক্তি যদি সঠিক হয় তাহলে আর কোনও সংশয় থাকে না যে, শিবাজি ক্ষত্রিয় বলে যে সিদ্ধান্ত গগাভাট গ্রহণ করেন তা ছিল অর্থের বিনিময়ে এবং সেই অর্থের লেনদেন ছিল বেআইনি। শিবাজির এই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে ব্রাহ্মণদের সিদ্ধান্তে কোনও নীতি মানা হত না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এমন ব্যাপারেও তাঁরা আবার নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। এখন দেখতে হবে, শিবাজি ক্ষত্রিয় বলে ব্রাহ্মণরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্তকে তাঁরা কত দিন সম্মান করেন?

শিবাজির রাজ্যাভিষেকের উৎসবের সময় থেকে তিনি একটি নতুন সনের প্রবর্তন করেন। ১৬৭৪ সালের ৬ জুন থেকে ঐ সন চালু হয়। নামকরণ করা হয় রাজ্যাভিষেক সন। কতদিন ঐ সন চালু ছিল? শিবাজি এবং তাঁর অধস্তনগণ যতদিন শাসক হিসাবে শক্তিশালী ছিলেন, ততদিন-ই ঐ ব্যবস্থা চালু ছিল। যে মুহূর্তে শাসন কর্তৃত্ব ব্রাহ্মণ পেশোয়াদের[৩৭] হাতে গেল তখনই তাঁরা আদেশ জারি করলেন ঐ সন ব্যবস্থা অচল। তাঁরা যে শুধু এই সন ব্যবস্থা অচল-ই করলেন তাই নয়, তাঁরা মুসলমান শাসকদের অনুকরণে 'ফসলী' সাল প্রবর্তন করলেন। ব্রাহ্মণরা এখানেই থেমে থাকেননি। শিবাজির বংশধরগণ ক্ষত্রিয় কিনা, তাঁরা তখন সেই প্রশ্ন তুলতে লাগলেন। তাঁরা শিবাজির দুই পুত্র শম্ভুজি ও রাজারাম সম্পর্কে নতুন কিছু করতে পারেননি। কারণ শিবাজি তাঁর জীবদ্দশাতেই ঐ দুই পুত্রের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে যান। বৈদিক মতে ব্রাহ্মণরাই তার ঐ দুই পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন। শিবাজির পৌত্র শাহুর সময়ও ব্রাহ্মণরা কিছু করতে পারেননি। কারণ তখনও ব্রাহ্মণদের হাতে শাসন ক্ষমতা যায়নি। শাহু যে মুহূর্তে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ব্রাহ্মণ পেশোয়াদের হাতে ছেড়ে দিলেন, তখন থেকেই তাঁরা পূর্বেকার নিয়ম অস্বীকার করতে শুরু করলেন। শাহুর দত্তক পুত্র এবং উত্তরাধিকারী রামজি রাজে তখন বয়সে খুব ছোট এবং অভিভাবক পেশোয়ার এবং এই অবস্থায় তাঁর উপনয়ন হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলেও তা বৈদিক মতে হয়েছিল কিনা তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় শাহু যাঁকে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে দত্তক নেওয়া হয়েছিল, তাঁর যে পৌরাণিক রীতি[৩৮] অনুযায়ী পেশোয়াদের নির্দেশে উপনয়ন হয়েছিল তার কিন্তু নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় শাহুর উপনয়ন পৌরাণিক রীতি

৩৭. মারাঠি রিয়াসত, সরদেশাই, খণ্ড ২, পৃ : ৩৬৩ এবং শিবাজি, দি ফাউন্ডার অব্ মারাঠা স্বরাজ, সি.ডি. বৈদ্য, পৃ : ২৫১

৩৮. সিদ্ধান্ত বিজয় রাও বাহাদুর ডোগরে কর্তৃক সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ : ৬

অনুযায়ী হয়েছিল কারণ পেশোয়ারা তাঁকে শূদ্রের সমান মনে করতেন এবং একমাত্র শূদ্রদের উপনয়ন হত পৌরাণিক রীতি অনুযায়ী। দ্বিতীয় শাহুর উত্তরাধিকারী ছিলেন মহারাজা প্রতাপ সিং। তিনি ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে শাহুর উত্তরাধিকারী হন। তাঁর কোনও উপনয়ন হয়েছিল কিনা এবং যদি হয়েও থাকে তা বৈদিক মতে কি পৌরাণিক মতে হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে একটি বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে কারভির শঙ্করাচার্য সাংলির কায়স্থদের মর্যাদা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে বলেন, কলিযুগে কোনও ক্ষত্রিয় নেই। তাঁর আরও সিদ্ধান্ত ছিল যে নথিপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করা যাবে না যে, শিবাজি, শম্ভুজি এবং শাহু ক্ষত্রিয় ছিলেন। তবে এ সম্পর্কে অভিযোগ শোনা যায় যে এই সিদ্ধান্ত শঙ্করাচার্যের মূল সিদ্ধান্ত নয় এবং সাংলির ব্রাহ্মণ রাজা এটি সংযোজিত করেন। সে যাই হোক না কেন, শিবাজির অধস্তন পুরুষ হিসাবে প্রতাপ সিংহের কাছে এটি ছিল এক সরাসরি চ্যালেঞ্জ। প্রতাপ সিংহ বিষয়টি ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণদের এক সম্মেলনে উত্থাপন করেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই প্রতাপ সিংহের অনুকূলে তাঁদের সিদ্ধান্ত দেন এবং এইভাবে প্রতাপ সিংহ শূদ্রে পতিত হবার হাত থেকে রক্ষা পান। এইভাবে শিবাজির একটি ধারাকে শূদ্রে অবনমিত করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রাহ্মণরা শিবাজির অন্য ধারাকে তাঁদের মর্যাদার ওপর আক্রমণ করতে শুরু করলেন।

এই দ্বিতীয় ধারা কোলাপুরে রাজ্য স্থাপন করে। এই কোলাপুরের এক শাসকের নাম বাবাসাহেব মহারাজ। তাঁর সময়ে রাজপ্রাসাদের পুরোহিত রঘুনাথ শাস্ত্রী পর্বতে প্রাসাদের সব অনুষ্ঠান পৌরাণিক রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন করতেন। কথিত আছে পৌরাণিক রীতি অনুযায়ী তাঁর কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাবাসাহেবের মৃত্যু হয়। ১৮৮৬ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত কোলাপুরের সব শাসক-ই নাবালক ছিলেন। ঐ সময় প্রশাসনের কর্তৃত্ব ব্রিটিশের ওপর। ঐ সময় রাজপুরোহিত কোন রীতি অনুযায়ী প্রাসাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতেন তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী শাহু মহারাজ এক আদেশ জারি করে বলেন রাজপুরোহিতকে সব ক্রিয়াকর্ম বৈদিক মতে করতে হবে। পুরোহিত তা অস্বীকার করেন এবং পৌরাণিক মতে ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এবং বলেন কোলাপুরের শাসকরা শূদ্র, ক্ষত্রিয় নন। এ ব্যাপারে কারভির মঠের শঙ্করাচার্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন এই বিরোধ চলছিল তখন মঠের প্রধান যাকে গুরু বলা হয় তিনি এমন একজন শিষ্য গ্রহণ করেন যাকে তিনি ঐ মঠের প্রধানের সব অধিকারই দান করেন। ঐ শিষ্যের নাম ছিল ব্রহ্মানলকর। প্রথমদিকে গুরু এবং শিষ্য উভয়ই প্রাসাদ পুরোহিতের পক্ষে এবং

মহারাজার বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু পরে শিষ্য মহারাজার পক্ষ নেন এবং তাকে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করেন। গুরু ছিলেন রাজপুরোহিতের পক্ষে এবং তিনি শিষ্যকে ঐ মঠ থেকে বহিষ্কার করলেন। পরে মহারাজা তাঁর নিজের জন্য শঙ্করাচার্য[৩৯] পদ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই শঙ্করাচার্য মহারাজার সঙ্গে মতের বিরোধিতা করেন।

শিবাজিকে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই মর্যাদা তার ব্যক্তিগত ছিল না। এই মর্যাদা তার পরিবার এবং উত্তরাধিকারীদেরও প্রাপ্য ছিল। এ সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না। বংশের কোনও পুরুষ যদি বংশ মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে কোনও কাজ করে তবেই এই মর্যাদা নষ্ট হতে পারে। সাধারণভাবে এই মর্যাদা নষ্ট হয় না। শিবাজির কোনও অধস্তন পুরুষ বংশ মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে কোনও কাজ করেননি। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণরা তাদের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মণরা এই কাজ করতে পেরেছেন কারণ কোনও হিন্দুর মর্যাদা নিয়ে যে কোনও সময় তাদের এই ধরনের কাজের অধিকার ছিল বলে তাঁরা দাবি করেন। তাঁরা একজন শূদ্রকে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দিতে পারতেন এবং একজন ক্ষত্রিয়কে শূদ্রে নামিয়ে আনতে পারতেন। শিবাজির ঘটনা প্রমাণ করে যে এ ব্যাপারে তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল সীমাহীন এবং ঐ কর্তৃত্বকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারত না।

এই উদাহরণগুলি[৪০] যে শুধুমাত্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল তাতে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু এই সব উদাহরণ থেকে বিষয়টি খুব-ই পরিষ্কার হয়ে যায় যে সাধারণভাবে ঐসব নীতি প্রয়োগ করা হয়। এগুলি নিম্নরূপ :

(১) উপনয়ন অনুষ্ঠানের একচ্ছত্র অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের। শিবাজিই বলুন আর প্রতাপ সিংহই বলুন অথবা কায়স্থ, পাঞ্চাল ও পালশিরা কেউই কিন্তু অ-ব্রাহ্মণ দ্বারা উপনয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। কোনও এক সময় কায়স্থরা অবশ্য চেয়েছিল তাদের সব ক্রিয়াকর্ম কায়স্থরাই করুক। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি।

(২) ব্রাহ্মণদের একথা বলার অধিকার ছিল, কাদের উপনয়ন সম্পন্ন তারা করবে আর কাদের তারা করবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনও সম্প্রদায়ের উপনয়ন হবে কিনা তা বিচারের পুরোপুরি অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের।

(৩) উপনয়ন অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণদের সমর্থনের পিছনে কোনও মহৎ ধারণা ছিল না। অর্থের বিনিময়ে ব্রাহ্মণদের ঐ সমর্থন পাওয়া যেত। শিবাজিও গগাভাটের সমর্থন লাভ করেছিলেন অর্থের বিনিময়ে।

৩৯. ড. কূর্তকোটি নামে তিনি পরিচিত ছিলেন।
৪০. বিস্তৃত জানবার জন্য কে. এস. ঠাকরে রচিত মারাঠি গ্রন্থ 'গ্রাম্যাঁচা ইতিহাস' (১৯১৯) দ্রষ্টব্য।

(৪) ব্রাহ্মণদের উপনয়ন সম্পন্ন করতে অস্বীকার করার পিছনে কোনও আইনি বা ধর্মীয় ভিত্তি ছিল না। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই কাজ করতেন। ব্রাহ্মণরা কায়স্থদের উপনয়ন সম্পন্ন করতে অস্বীকার করার একমাত্র কারণ ছিল, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা।

(৫) ব্রাহ্মণরা উপনয়ন সম্পন্ন করাতে অস্বীকার করলে একমাত্র বিদ্যা পরিষদের কাছে সেই অভিযোগ জানান যেত। কিন্তু বিদ্যা পরিষদ ছিল ব্রাহ্মণদের একটি সমাবেশ এবং একমাত্র ব্রাহ্মণরাই এর সদস্য হতে পারতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সবার কাছে বিষয়টি অবশ্য স্পষ্ট হবে যে, ব্রাহ্মণদের অধিকার ছিল উপনয়ন অস্বীকার করার। তাদের ক্ষমতা এবং খারাপ উদ্দেশ্য তারা শূদ্রদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

□ □

অধ্যায় ১১

সমন্বয়ের কাহিনী

এ পর্যন্ত আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি :

(১) ব্রাহ্মণরাই ইন্দো-আর্য সমাজ ব্যবস্থায় শূদ্রদের দ্বিতীয় বর্ণ থেকে চতুর্থ বর্ণে পতন ঘটায়;

(২) শূদ্রদের অবনমনের পদ্ধতি হিসাবে ব্রাহ্মণরা যে পদ্ধতি বেছে নেয়, তা হল শূদ্রদের উপনয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা;

(৩) শূদ্র রাজাদের সময় ব্রাহ্মণদের ওপর শূদ্র রাজগণ যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতেন, সেই অত্যাচার ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের এইভাবে সমাজে অবনমিত করে;

এইসব বিষয় যদিও খুব পরিষ্কার, তথাপি এমন কেউ এখনও থাকতে পারেন যাঁরা এ ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন তুলতে পারেন যেমন :

(i) কয়েকজন মাত্র শূদ্র রাজার সঙ্গে বিরোধের জন্য কেন ব্রাহ্মণরা সমগ্র শূদ্র জাতির শত্রু হয়ে গেল?

(ii) শূদ্র রাজাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ক্রোধ কি এতই বেশি ছিল যার জন্য তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে?

(iii) এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে কি কোনও সমন্বয় হয়নি? যদি সমন্বয় হয়েই থাকে তাহলে শূদ্রদের পতিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের চেষ্টার কোনও প্রশ্ন ওঠে না;

(iv) শূদ্ররা কীভাবে এই পতনের ফল ভোগ করে?

আমি স্বীকার করি এইসব প্রশ্ন তাদের মধ্যে থাকতে পারে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই যথাযথ কর্তব্য।

এক

এখন প্রশ্ন হল কয়েকজন শূদ্র রাজার সঙ্গে বিরোধের জেরে কেন ব্রাহ্মণরা সমগ্র শূদ্র জাতির অবনমনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? বিষয়টি শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। দুটি বিষয় মনে রাখলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কোনও সমস্যা নয়। প্রথমত নবম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র রাজাদের মধ্যে যে বিরোধের কথা বলা হয়েছে তা কোনও ব্যক্তিগত ছিল না। যদিও এমন কথা মনে হতে পারে। ব্রাহ্মণদের পক্ষে বলতে গেলে কোনও সন্দেহই নেই যে এ ব্যাপারে সমগ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীই জড়িত ছিল। একমাত্র বশিষ্ঠের ঘটনা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণরা সাধারণভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আর রাজার পক্ষে বলতে গেলে এটি ঘটনা যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঐ বিরোধ মুষ্ঠিমেয় রাজা জড়িত ছিলেন। কিন্তু একথা ভুললে অবশ্যই চলবে না যে ঐ ঘটনায় তাঁরা সুদাসের সঙ্গে একই পংক্তিভুক্ত ছিলেন।

রাজা সুদাসের প্রসঙ্গে বলতে হয়, বিরোধ ঘটেছিল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের শূদ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে। বিষয়টি নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আমাদের এমন কোনও প্রমাণ নেই যার দ্বারা আমরা বলতে পারি অন্য যে সব রাজা এ ব্যাপারে অপরাধ করেছিলেন, তাঁরা ক্ষত্রিয়দের শূদ্র গোষ্ঠীজাত কিনা। কিন্তু আমাদের হাতে এমন প্রমাণ আছে, যার দ্বারা বলা যায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধে ঐ রাজারা সুদাসের পথেই চলেছিলেন। এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত বংশ তালিকার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। এই বংশ তালিকা মহাভারতের[১] আদি পর্ব থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যে সব ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে এই বংশ তালিকায় কিছুটা আলোকপাত করে। রাজা তিন্নি ছিলেন ইলার পুত্র এবং বৈবস্বত ছিলেন মনুর পৌত্র এবং নহুষ[২] হলেন পুরূরবার[৩] পৌত্র। ইক্ষ্বাকু পুত্রদের অন্যতম ছিলেন নিমি[৪] আর ইক্ষ্বাকু ছিলেন বৈবস্বত মনুর পুত্র। ত্রিশঙ্কু[৫] ছিলেন ইক্ষ্বাকুর ২৮তম অধস্তন পুরুষ এবং সুদাস[৬] ইক্ষ্বাকুর

১. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ১২৬
২. তদেব, পৃ : ১২৬
৩. তদেব, পৃ : ৩০৭
৪. তদেব, পৃ : ৩১৬
৫. তদেব, পৃ : ৩৬২
৬. তদেব, পৃ : ৩৬২

৫০তম অধস্তন পুরুষ। বৈবস্বতর অপর এক পুত্রের নাম বেণ। সবাই মনুর অধস্তন পুরুষ বলে দাবি করেন। অবশ্য কেউ কেউ ইক্ষ্বাকুর বংশধর বলেও দাবি করেন। মনু এবং ইক্ষ্বাকুর বংশধর হওয়ায় এটি সম্ভব যে তাঁরা সকলেই সুদাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এখন সুদাস[৭] যদি শূদ্র হন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই যুক্তি প্রযোজ্য হয় যে ঐসব রাজাই শূদ্র গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

আমাদের যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তথাপি একথা মনে করা অস্বাভাবিক হবে না যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এইসব বিরোধে শুধুমাত্র কয়েকজন শূদ্র রাজা নন সমগ্র শূদ্র শ্রেণী জড়িয়ে পড়েছিল। একথা অবশ্যই মনে করতে হবে যে, ঐসব বিরোধ সংঘটিত হয়েছে অত্যন্ত প্রাচীন কালে যখন কাজে ও চিন্তায় জীবনযাত্রা ছিল উপজাতি প্রকৃতির এবং তখনকার সমাজে এই ব্যবস্থা চালু ছিল যে, কোনও গোষ্ঠীর একজন কোনও কাজ করলে সমগ্র ঐ গোষ্ঠীকে তার দায়ভার বহন করতে হবে। প্রাচীন সব সমাজেই ব্যক্তি নয়, জাতি বা গোষ্ঠীই ছিল সব এবং এর ফলে ব্যক্তি বিশেষের অপরাধ সমষ্টির অপরাধ বলে গণ্য হত এবং গোষ্ঠীর কোনও অপরাধ ঐ গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেকেরই অপরাধ বলে গণ্য হত। এই সত্য যদি মনে রাখা হয় তাহলে একথা বলা খুবই স্বাভাবিক হবে যে অত্যাচারিত ব্রাহ্মণরা তাদের ক্রোধ ও হিংসা শুধুমাত্র অপরাধী রাজাদের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখেননি বরং সমগ্র শূদ্র জাতির ওপর তা ব্যাপ্ত করেন এবং সকল শূদ্রের উপনয়নের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

বংশাবলী

মারীচি[৮]

কাশ্যপ—দাক্ষায়নী (দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা)

আদিত্যগণ   বৈবস্বত

মনু   যম

(তাঁর দশ পুত্র)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বেণ	ধৃষ্ণু	নৌশৌত	নভগ	ইক্ষ্বাকু	কুরুন	শর্যাত	ইলা	প্রসাদ	নভগৌশালা

৭. ঋগ্বেদে দিবোদাসকে সুদাসের পিতা বলা হয়েছে। পুরু বর্ণিত হয়েছে ইক্ষ্বাকু হিসাবে।

৮. ধর্মসূত্র, কানে, খণ্ড ২ (১), পৃ : ১৩৮-১৫৩

দুই

এর পিছনে যথেষ্ট উস্কানি ছিল কিনা তা নিয়ে বিচার বিবেচনা করার কোনও অবকাশ নেই। উভয় পক্ষেই এ ব্যাপারে চরম উত্তেজনা ছিল। উভয় পক্ষেই এমন সব উত্তেজনা সামগ্রী ছিল যার মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে সমাজে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার যে দাবি করা হয়েছিল তা এতই সাংঘাতিক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল যে তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল।

ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবি জানান হয়েছিল :

(১) ব্রাহ্মণদের শুধুমাত্র জন্মসূত্রেই সকল বর্ণের গুরু হিসাবে মেনে নিতে হবে;

(২) অন্য বর্ণের লোক কি কাজ করবে, তাদের আচরণ কেমন হবে এবং কীভাবে তারা জীবিকা নির্বাহ করবে তা নির্ধারণ করার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ব্রাহ্মণদের, অন্য বর্ণের লোক তা মানতে বাধ্য হত এবং রাজা ব্রাহ্মণদের দেওয়া বিধি অনুযায়ী রাজ্য শাসন করতেন;

(৩) ব্রাহ্মণরা রাজার কর্তৃত্বের বশীভূত ছিলেন না। রাজা ব্রাহ্মণ বাদ দিয়ে অন্য সব শ্রেণীর ওপর কর্তৃত্ব করতে পারতেন;

(৪) ব্রাহ্মণরা বেত্রাঘাত, শৃঙ্খল পরান, জরিমানা, নির্বাসন, ভর্ৎসনা এবং এক ঘরে হওয়া থেকে মুক্ত ছিলেন;

(৫) শ্রোতৃয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কোনও প্রকার কর দিতে হবে না;

(৬) কোনও ব্রাহ্মণ যদি কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পান তার মালিক হবেন তিনিই, আর রাজা যদি কোনও গুপ্তধন পান তার অর্ধেক মালিক হবেন ব্রাহ্মণ;

(৭) যদি কোনও ব্রাহ্মণ কোনও উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যান তাহলে সেই সম্পত্তি রাজার অধিকারে যাবে না, তা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে শ্রোতৃয় বা অন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে;

(৮) পথি মধ্যে শ্রোতৃয় বা অন্য কোনও ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হলে রাজা ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেবেন;

(৯) দেখা হলে ব্রাহ্মণকেই প্রথম অভিবাদন জানাতে হবে;

(১০) ব্রাহ্মণের দেহ পবিত্র, ব্রাহ্মণ যদি নরহত্যার দায়েও অভিযুক্ত হন তাহলেও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না;

(১১) ব্রাহ্মণকে অপমান করা, তাঁকে আঘাত করা অথবা তাঁর শরীরে রক্তপাত ঘটান অপরাধ বলে গণ্য হবে;

(১২) কিছু কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যান্য বর্ণের লোকের তুলনায় ব্রাহ্মণদের শাস্তির মাত্রা কম হবে;

(১৩) মোকদ্দমাকারী যদি ব্রাহ্মণ না হন তাহলে রাজা আর একজন ব্রাহ্মণকে সাক্ষী হিসাবে ডাকতে পারবেন না;

(১৪) এমন কোনও নারী যার দশ জন স্বামী আছে এবং তাঁরা সকলেই অব্রাহ্মণ এবং সেক্ষেত্রে ঐ নারীকে যদি কোনও ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন তাহলে সেই ব্রাহ্মণই তাঁর স্বামী বলে গণ্য হবে, কোনও অবস্থাতেই ঐ নারীর পূর্বের বিবাহিত রাজন্য বা বৈশ্যরা[৯] তার স্বামী বলে বিবেচিত হবেন না।

ব্রাহ্মণদের এইসব অন্যায় এবং অন্যায্য দাবি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কানে[১০] বলেছেন :

'ব্রাহ্মণদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ছিল, অন্য লোকের বাড়িতে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য অবাধ প্রবেশাধিকার, চৌর্য্যবৃত্তির অভিযোগ থেকে মুক্ত থেকে অন্য লোকের বাসস্থান এবং এলাকা থেকে জ্বালানি, ফুল, জল এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করা, পরস্ত্রীর সঙ্গে বিনা বাধায় কথাবার্তা বলা, বিনা পয়সায় নদী পারাপার এবং সবার আগে নদী পারাপারের সুযোগ প্রভৃতি। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যদি কোনও ব্রাহ্মণ পণ্য পারাপার করেন তাহলে তাঁকে কোনওরকম শুল্ক দিতে হবে না। কোনও ব্রাহ্মণ যদি ভ্রমণের সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং ক্ষুধার্ত থাকেন তাহলে অন্যের ক্ষেত্র থেকে তিনি যদি দুখানা ইক্ষুদণ্ড অথবা অন্য কোনও ভক্ষ্য দ্রব্য সংগ্রহ করেন তাহলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না।'

কোনও সন্দেহ নেই যে ব্রাহ্মণরা এইসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হয়েছেন একটা দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনে এবং কোন কোন কায়েমি স্বার্থের কারণে

৯. কানে (XIV) নং উল্লেখ করেন নি। অথর্ববেদ (V. ১৭.৮-৯)-এ উল্লেখ আছে। দ্রষ্টব্য : ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২৮০।

১০. তদেব, পৃ : ১৫৩-১৫৪

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে এই সংঘাত ঘটেছিল তা বলা শক্ত। কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই যে উক্ত বর্ণিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে এক, দুই, তিন, আট এবং চৌদ্দ নম্বর সুযোগ তারা তখন ভোগ করে চলেছে এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং কোনও ভদ্রলোককে উত্তেজিত করার পক্ষে ঐগুলিই যথেষ্ট ছিল।

ক্ষত্রিয় রাজারা এই সবের কোনও কিছুতেই অপমান জ্ঞান করতেন না। কেমন করে তাঁরা তা করবেন? একথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে সব ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতে এসেছিলেন তাঁরা সব সূর্য বংশের[১১] রাজা ছিলেন। তাঁরা চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় রাজাদের চেয়ে বিদ্যায়, আভিজাত্যে এবং শৌর্যে আলাদা ছিলেন। যে সব ক্ষত্রিয় রাজা সূর্য বংশজাত ছিলেন তাঁরা ছিলেন তেজোদীপ্ত পক্ষান্তরে চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় রাজারা ছিলেন আত্মমর্যাদাহীন ক্লীব প্রকৃতির। সূর্য বংশের রাজারা ব্রাহ্মণদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আর চন্দ্রবংশের রাজগণ ব্রাহ্মণদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের দাসে পরিণত হয়েছিলেন। এটাই হয়ত স্বাভাবিক ছিল। তার কারণ চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়দের তেমন কোনও শিক্ষা ছিল না আর সূর্যবংশের ক্ষত্রিয় রাজগণ বিদ্যায় শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের যে সমকক্ষ ছিলেন তাই নয়, তারা অনেক সময় ব্রাহ্মণদেরও ঊর্ধ্বে ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ বেদের স্তোত্রও রচনা করেন এবং রাজর্ষি রূপে খ্যাত হন। যাঁরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতে গিয়েছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেই এসব কথা প্রযোজ্য।

ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকা এবং ঐতিহ্য অনুসারে দেখা যায়, কোন কোন রাজা কোন কোন স্তোত্র রচনা করেছিলেন :

VI-১৫ : বাতহব্য অথবা ভরদ্বাজ; X৯ : অম্বরীশের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, (অথবা ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা) X৭৫ : প্রিয়মেধ পুত্র সিন্ধুক্ষিত, X১৩৩ : পৈজবনের পুত্র সুদাস, X১৩৪ : যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাত্রী, X১৭৯ : উশীনরের পুত্র শিবি, কাশীর

---

১১. কেবল পুরূরবা এবং নহুষ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। নিচের বংশাবলী থেকে

সোম = তারা
↓
বুদ্ধ = ইলা
↓
পুরূরবা = উর্বশী
↓
আয়ুশ = নহুষ

যদি একথা মনে রাখা যায় যে, পুরূরবার মাতা ইলা ছিলেন মনু বৈবস্বতের কন্যা, তাহলে দেখা যাবে, সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘর্ষ হয়েছিল।

রাজা এবং দিবোদাসের পুত্র প্রাতর্দন এবং রোহিদাশ্বের পুত্র বসুমানস এবং X১৪৮ : পৃথু বেণ'।

মৎস্যপুরাণের[১২] বর্ণনাতেও রয়েছে কোন কোন রাজা ঋগ্বেদের কোন কোন স্তোত্র রচনা করেছিলেন। এগুলি নিম্নে দেওয়া হল :

'ভৃগু, কশ্যপ, প্রাচেতস, দধীচি, আত্মবৎ, ঔর্ব, জগদগ্নি, কৃপ, শারদ্বত্ত, অরষ্টি সেন, যুধাজিৎ, বিতহব্য, সুবর্চ, বেণ, পৃথু, দিবোদাস, ব্রাহ্মণস্ব, গৃৎস, শৌণক—এই ১৯ জন হলেন ভৃগু, যাঁরা ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করেছিলেন। অঙ্গিরা, বেধস, ভরদ্বাজ, ভালনন্দন, রিতসদ্ধ, গর্গ, সিতি, সংকৃতি, গুরুধির, মান্ধাতৃ, অম্বরীশ, যুবনাশ, পুরুকুৎস, প্রদ্যুম্ন, শ্রাবণস্য, অজমেধ, হর্যস্ব, তক্ষপ, কবি, পৃশদশ্ব, বিরূপ, কন্ব, মুদগল, উতথ্য, শারদ্বত, ভজগ্রব, অপশ্য, সুবিত্ত, বামদেব, অজিত, বৃহদুঃখ, দীর্ঘতামস, কাকমিবৎ—এই ৩৩ জন বিশিষ্ট অঙ্গীরা, এঁরা সব ঋগ্বেদের স্তোত্র রচনা করেন।

এখন আসা যাক কশ্যপদের কথায়। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র, দেবরাজ, বালা, জ্ঞানিমধুছন্দা, ঋষভ, অঘমর্শন, অষ্টক, লোহিত, ধৃতকিল, বেদশ্রব, দেবরত, পুরাণশ্ব, ধনঞ্জয়, মিথিল, শলঙ্কায়ান—এই ১৩ জন বিখ্যাত এবং গোঁড়া কুশিক, এঁরাও ঋগ্বেদের স্তোত্র রচনা করেন। মনু বিবস্বত, ইড়া, রাজাপুরূরবা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিখ্যাত এই জন যাঁরা স্তোত্র রচনা করেন। বালন্দ, বন্দ্যা এবং সংস্কৃতি—এই তিন বিশিষ্ট বৈশ্যও বেদের স্তোত্র রচনা করেন। এইভাবে মোট ৯১জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বেদের স্তোত্র রচনা করেন বলে ঘোষণা করা হয়। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণভুক্ত।

একথা যদি মনে রাখা হয় পুরুবরার মাতা ইলা ছিলেন মনু—বিবস্বতের কন্যা, তাহলে দেখা যাবে তারাও সূর্য বংশের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে যুক্ত ছিলেন। সূর্য বংশের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধ ঘটেছিল।

বেদের স্তোত্র রচয়িতাদের মধ্যে শুধুমাত্র যে অনেক ক্ষত্রিয়ের নাম ছিল তাই নয়, এমন অনেক ক্ষত্রিয়ের নাম ছিল যাঁরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন। বেদের স্তোত্র রচয়িতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়রাই নেতৃত্ব স্থানীয় ছিলেন। বেদের সব থেকে বিখ্যাত স্তোত্র গায়ত্রী মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন বিশ্বামিত্র এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিশ্বামিত্রের মত একজন বিখ্যাত

১২. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ২৬৮

সাধক ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ব্রাহ্মণদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে উপায় ছিল না।

তাঁদের শৌর্য ও বিদ্যার অহঙ্কারে ব্রাহ্মণদের এই ভণ্ডামি ও অন্যায্য দাবিতে এতটাই আঘাত করেছিল যে যখন তাঁরা এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, সেই চ্যালেঞ্জের প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই খুব কঠোর ছিল। তাঁরা ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত কঠোর এবং নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেন। রাজা বেণ ব্রাহ্মণদের বাধ্য করেন ঈশ্বর নয় শুধুমাত্র তাঁকেই পূজা করতে। রাজা পুরূরবা ব্রাহ্মণদের সম্পদ লুণ্ঠন করেন। রাজা নহুষ ব্রাহ্মণদের তাঁর রথের সঙ্গে জুড়ে দেন এবং শহরের ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণদের সেই রথ টেনে নিয়ে যেতে হয়। রাজা নিমি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের তাঁর প্রাসাদের সব রকম ক্রিয়াকর্ম করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন এবং রাজা সুদাস ব্রাহ্মণদের ওপর এতটাই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর পারিবারিক পুরোহিত ঋষি বশিষ্ঠের পুত্রকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। এতে নিশ্চিতভাবেই ব্রাহ্মণরা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাই নয়, তাদের ক্ষুব্ধ হওয়ার এর থেকে বড় কারণ আর ছিল না এবং পরিণতিতে এইসব ঘটনা ব্রাহ্মণদের এতটাই উত্তেজিত করেছিল যে তাঁরা শূদ্রদের ওপর এর প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠলেন।

তিন

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে সম্ভাব্য সমঝোতা এবং সমন্বয়ের জন্য যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু প্রমাণ রয়েছে। কিছু মানুষ এতে বিশ্বাস করেন। এইসব সাক্ষ্য প্রমাণের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে এসবের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। সমন্বয়ের এইসব কাহিনী পুরাণ ও মহাভারতের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে।

সমন্বয়ের প্রথম কাহিনী হল দুটি গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। ভরত বংশ এবং ত্রিৎসু বংশ। বিশ্বামিত্র ছিলেন ভরত বংশোদ্ভূত আর বশিষ্ঠ ছিলেন ত্রিৎসু বংশের। ভরত বংশীয়রা যে বশিষ্ঠ অর্থাৎ ত্রিৎসুদের শত্রু ছিলেন, ঋগ্বেদেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে[১৩] :

তিন, ৫৩ ২৪—'হে ইন্দ্র ভরত বংশের এই পুত্ররা বশিষ্ঠদের কাছে যেতে চায় না বরং তাদের এড়িয়ে চলতে চায়'।

---

১৩. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩৫৪

তাদের মধ্যে সমন্বয়ের কাহিনী মহাভারতের[১৪] আদি পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কাহিনী নিম্নরূপ :

'তাদের অনেক শত্রু ভরত বংশীয়দের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। পাঞ্চাল প্রধান চার প্রকারের বাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে দ্রুতবেগে পৃথিবী জয় করে নেন এবং দশটি বিরাট সেনাদলের সাহায্যে তাঁকে পরাস্ত করেন। এরপর রাজা সম্বরণ তাঁর পত্নী, মন্ত্রী, পুত্র এবং বন্ধুদের সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থল থেকে পলায়ন করেন এবং সিন্ধুনদের তীরবর্তী গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। ঐ এলাকা ছিল তাঁর রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল এবং তার একদিকে ছিল নদী এবং অন্যদিকে পর্বত। সেখানে ভরত বংশীয় রাজারা দুর্গ নির্মাণ করে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতে থাকেন। এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে তাঁরা সেখানে বসবাস করেছিলেন। এই সময় একদিন মহান ঋষি বশিষ্ঠ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমন সংবাদে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য সব ভরত বংশীয়রা মহামুনি বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য, নৈবেদ্য ও সমস্ত প্রকার সম্মান দিয়ে তাঁকে দর্শনের জন্য তাঁর সমীপে উপস্থিত হলেন। ঋষি বশিষ্ঠ উপবেশন করার পর রাজা নিজে গিয়ে তাঁর কাছে নিবেদন করে বললেন, আপনি আমাদের পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং আমাদের হারান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করুন। বশিষ্ঠ ভরতদের কথায় সম্মত হলেন এবং শোনা যায় তিনি পুরুষ অধস্তন পুরুষকে সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতির কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর হাতে তুলে দেন সমগ্র পৃথিবীর কর্তৃত্ব। তিনি ভরতদের পুরনো সেই সুন্দর শহর পুনরুদ্ধার করলেন এবং সব রাজাকে তাঁর বশীভূত করলেন'।

দ্বিতীয় কাহিনী হল ভৃগু মুনি এবং ক্ষত্রিয় রাজা কৃতবর্যের মধ্যে বিরোধ এবং পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে সমঝোতাকে কেন্দ্র করে। মহাভারতের[১৫] আদি পর্বে এই কাহিনীর বর্ণনা আছে :

কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ভৃগু মুনি তাঁর পুরোহিত ছিলেন। রাজা কৃতবীর্যের বদান্যতায় ভৃগু মুনি অনেক অর্থ এবং গাভীর মালিক হন। ভৃগু মুনি স্বর্গে যাবার পর তাঁর অধস্তন পুরুষগণ তাঁর অর্থের সন্ধান করতে লাগলেন এবং ভৃগুর কাছে গিয়ে কিছু অর্থ ভিক্ষা করলেন কারণ তাঁর অর্থ

১৪. তদেব, পৃ : ৩৬১

১৫. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৪৪৮-৪৪৯

সম্পর্কে তাঁরা অবগত ছিলেন। ভৃগুদের অনেকে তাঁদের অর্থ মাটির নিচে লুকিয়ে রাখেন এবং অনেকে ধন ব্রাহ্মণদের দান করেন। কারণ তাঁরা ক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে ভীত ছিলেন। অনেকে আবার ক্ষত্রিয়দের চাহিদা মত তাঁদের অর্থও দিয়ে দেন। এরপর একদিন একজন ক্ষত্রিয় ভৃগুর গৃহের মাটি খুঁড়ে তার নিচে থেকে কিছু অর্থ উদ্ধার করল। ক্ষত্রিয়রা তখন একত্রিত হয়ে সেই ধনের পরিমাণ দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল এবং পরিণাম স্বরূপ তারা ভৃগুর বংশধরদের হত্যা করল। তারা শিশুদেরও রেহাই দিল না। মাতৃগর্ভের শিশুদেরও বাদ দেওয়া হল না। কারণ ক্ষত্রিয়রা তাদের ঘৃণা ও ঈর্ষার চোখে দেখত। বিধবা মহিলারা হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় পলায়ন করলেন। তাদের মধ্যে একজন তার অজাত পুত্রকে তাঁর উরুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ক্ষত্রিয়রা একজন ব্রাহ্মণী মারফত মায়ের উরুর মধ্যে শিশুর অস্তিত্ব জানতে পেরে তাকে বধ করতে উদ্যত হল। কিন্তু তার মাতার উরু থেকে প্রখর দ্যুতি নির্গত হতে লাগল এবং এর ফলে হত্যাকারী ক্ষত্রিয়দের চোখ অন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে সেই পর্বতের আশপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং পরে সেই অজ্ঞাত শিশুর মায়ের কাছে গিয়ে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য কাতর অনুরোধ জানাল। কিন্তু মা তাদের সেই অপূর্ব শিশু ঔর্ভর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মাতৃগর্ভে থেকেই সেই অপূর্ব শিশু ঔর্ভ সমগ্র বেদ এবং ষষ্ঠ বেদাঙ্গে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। মাতা বললেন পিতৃপুরুষ এবং স্বজনদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে শিশু তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করেছে এবং একমাত্র সেই শিশুই তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে। এই কথা শুনে ক্ষত্রিয়রা শিশুটির সমীপে উপস্থিত হয়ে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য তাকে অনুরোধ জানালে তারা দৃষ্টি ফিরে পেল। ঔর্ভ ধ্যান যোগে জানতে পেরেছিল সব জীবের ধ্বংসের কথা এবং ভৃগু বংশীয় সকলের হত্যার প্রতিশোধ নিতে সে কঠোর তপস্যা শুরু করল এবং তাতে দেবতা, অসুর এবং মানুষ ভীত হয়ে পড়ল। তখন ঔর্ভর পূর্ব পুরুষগণ হাজির হয়ে তাকে এই কাজ থেকে নিবৃত হতে বললেন এবং বললেন তাঁরা ক্ষত্রিয়দের ওপর কোনও প্রকার প্রতিশোধ চান না। ধর্মপরায়ণ ভৃগুরা তাদের দুর্বলতা বশত ক্ষত্রিয়দের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে যে অনিচ্ছুক ছিলেন তা নয়, ক্ষত্রিয়রা ভৃগুদের ওপর যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, বলতে গেলে ভৃগুরা তাই চেয়েছিলেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা যখন বয়সের ভারে অশক্ত হয়ে পড়েছিলাম তখন ক্ষত্রিয়দের হাতেই আমরা মৃত্যু চেয়েছিলাম। ভৃগুর গৃহে যে অর্থ মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল ভৃগুদের হত্যা করার জন্য ক্ষত্রিয়দের

উত্তেজিত করা। কারণ যারা স্বর্গে যাওয়ার কথা চিন্তা করে তাদের অর্থের কি প্রয়োজন? তাঁরা আরও বলেন যে, এই পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার কারণ আত্মহত্যা করে তাঁরা নিজেদের অপরাধী করতে চাননি। এরপর তাঁরা ঔর্বকে ডেকে তার ক্রোধ সংযত করে পাপ কর্ম থেকে বিরত হবার উপদেশ দিয়ে বললেন, হে বৎস, ক্ষত্রিয়দের এবং সপ্ত জগৎকে ধ্বংস কর না। তোমার ক্রোধ সম্বরণ কর, কারণ এতে তোমার তপস্যার শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ঔর্ভ তার উত্তরে বললেন তিনি তাঁর ক্রোধের প্রকাশ ঘটাবেনই। কারণ তাঁর ক্রোধ যদি কোনও বস্তুর ওপরে না পড়ে তাহলে তিনি নিজেই সেই ক্রোধ হজম করে ফেলবেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে কর্তব্য, ন্যায়বিচার এবং যুক্তির স্বার্থে তিনি তার পূর্বপুরুষদের সহৃদয়তার শিকার হতে পারেন না। তখন তাঁর পূর্বপুরুষরা তাঁর ক্রোধের আগুনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উপদেশ দিলেন। তার সেই ক্রোধাগ্নি সমুদ্রের জলে পড়ে সমুদ্রকে উত্ত্যক্ত করবে এবং এইভাবেই তার প্রতিশোধস্পৃহার নিবৃত্তি হবে। সেই অনুযায়ী ঔর্ব তাঁর ক্রোধ সমুদ্রে ফেললে তার থেকে সৃষ্টি হল বিখ্যাত হয়শিরার যাঁরা বেদ সম্পর্কে জানেন তাঁরা জানেন যে সেখানে থেকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত হয়ে জলরাশি পান করছে'।[১৬]

তৃতীয় কাহিনীটি হচ্ছে হৈহয় রাজা কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন এবং পরশুরামের বিরোধ এবং সমঝোতাকে কেন্দ্র করে। মহাভারতের[১৭] বন পর্বে এই কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায় :

'শোনা যায় হৈহয় রাজ কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুনের এক হাজার হাতি ছিল। দত্তাত্রেয়র কাছ থেকে তিনি এমন একটি আকাশযান লাভ করেছিলেন যা ছিল স্বর্গ নির্মিত এবং যার গতি ছিল অবাধ ও অপ্রতিরোধ্য। অর্জুন শক্তিগর্বে মদমত্ত হয়ে দেবতা, যক্ষ এবং ঋষিদের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করলেন। সমস্ত জীবের ওপর তার নিপীড়ন নেমে এল। তখন দেবতা এবং ঋষিরা বিষ্ণুর দ্বারস্থ হলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের সহযোগিতায় অর্জুনকে বধ করার উপায় ভাবতে লাগলেন। অর্জুন একসময় ইন্দ্রকেও অপমান করেন। কাহিনীতে বলা হয়েছে, ঐ সময় কান্যকুব্জে গাধী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। ঐ কাহিনীতে একথাও বলা হয়েছে, রাজকন্যা সত্যবতীর সঙ্গে বিবাহ হয় ঋষি ঋচীকের এবং তাদের জমদগ্নি নামে একটি পুত্রের জন্ম হয়। জমদগ্নির ছিল পাঁচ পুত্র। তাঁদের

---

১৬. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৪৪৯-৪৫৪

১৭. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩৭৪

মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন বিখ্যাত পরশুরাম। পিতার আদেশে পরশুরাম মাতৃ হত্যা করেন (অন্য কামনা তাড়িত হয়ে জমদগ্নির পত্নী তার পবিত্র জীবন থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন) পরশুরামের চার জেষ্ঠ্য ভ্রাতা মাতৃহত্যার মতো পাপ কাজে অসম্মত হওয়ায় তারা পিতা জমদগ্নি কর্তৃক অভিশপ্ত হন। পরশুরামের ইচ্ছায় অবশ্য তাঁর মাতা পুনরায় জীবন লাভ করেন এবং ভ্রাতারাও অভিশাপ মুক্ত হন। পরশুরাম নিজে সব পাপের দায় গ্রহণ করেন এবং পিতার কাছ থেকে দীর্ঘ জীবন এবং অজেয় হবার বর লাভ করেন। পরশুরামের জীবনের ইতিহাসের বর্তমান পর্ব শুরু হয়ে গেল এখন রাজা অর্জুন অথবা মতান্তরে কৃতবীর্যের সঙ্গে। ঐ সময় একদিন অর্জুন ঋষি জমদগ্নির কুটিরে এলেন, ঋষিপত্নী তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু অর্জুন এই অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তর দিলেন ঋষির আশ্রমের যজ্ঞের জন্য গাভীর বাছুরটিকে বলপূর্বক হরণ করে এবং আশ্রমের বৃক্ষ নষ্ট করে। একথা শোনার পর পরশুরামের ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠল এবং তিনি অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। পরশুরাম অর্জুনের হাজার হাত ছেদন করলেন এবং পরে তাঁকে হত্যা করলেন। প্রতিশোধ গ্রহণে অর্জুনের পুত্র পরশুরামের পিতা ঋষি জমদগ্নিকে হত্যা করলেন। তখন পরশুরাম অনুপস্থিত ছিলেন। পরশুরাম তাঁর পিতৃহত্যার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন পৃথিবীকে তিনি নিক্ষত্রিয় করবেন। পরশুরাম তখন তাঁর অস্ত্র কুঠার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রথমেই হত্যা করলেন অর্জুন পুত্র ও পৌত্রদের এবং তারপর হাজার হাজার হৈহয়দেরও তিনি বধ করতে থাকলেন। তিনি সারা পৃথিবীকে একটি রক্তরঞ্জিত ক্ষেত্রে পরিণত করলেন। এইভাবে তিনি পৃথিবীর সব ক্ষত্রিয়কে নিধন করার পর তাঁর মনে অনুতাপ এল এবং তিনি তপস্যা করার জন্য গভীর অরণ্যে গমন করলেন। এইভাবে কেটে গেল কয়েক হাজার বছর। তখন সেই কোপনস্বভাব পরশুরামকে বিশ্বামিত্রের পৌত্র এবং রৌভ্যর পুত্র পরাবসু একটি প্রকাশ্য সমাবেশে বিদ্রূপ করে বললেন, প্রাতর্দানা এবং অন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যারা যযাতির জন্য এই যজ্ঞে হাজির হয়েছেন, তাঁরা কি ক্ষত্রিয় নন? পরশুরামের উদ্দেশ্যে পরাবসু আরও বললেন, আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ এবং মিথ্যা আপনার অহঙ্কার। আপনি বীর ক্ষত্রিয়দের ভয়ে পলায়ন করেছেন এবং পৃথিবী এখন শত শত ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীতে পূর্ণ। একথা শুনে পরশুরাম আবার অস্ত্র ধারণ করলেন। যে সব ক্ষত্রিয় আগের বার পরশুরামের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা এখন সব শক্তিশালী রাজা। পরশুরাম এবার তাঁদের, পুত্রদের এবং মাতৃগর্ভে অজাত পুত্রদের হত্যা করলেন। কিছু অজাত পুত্র অবশ্য মাতৃগর্ভে থেকে রক্ষা পায়। এইভাবে পরশুরাম

একুশবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করেন। এরপর ক্রেতা যুগে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষে কাশ্যপের কাছে পরশুরাম নিজেকে উৎসর্গ করেন।

এইভাবে সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণনা করার পর মহাভারতের[১৮] রচয়িতা সমঝোতা ও সমন্বয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

এগুলি নিম্নরূপ :

'একুশ বার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করার পর জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যার স্থল হিসাবে মহেন্দ্র পর্বত অত্যন্ত আদর্শ। পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করার পর ক্ষত্রিয়দের বিধবারা সন্তানের আশায় ব্রাহ্মণের কাছে গেলেন। ধার্মিক ব্রাহ্মণগণ কোনও প্রকার কামনা তাড়িত না হয়েই ঐ ক্ষত্রিয় বিধবাদের সঙ্গে উপযুক্ত সময়ে সহবাস করলেন এবং ক্ষত্রিয় রমণীগণ গর্ভবতী হলেন। তাঁরা সব বীর ক্ষত্রিয় পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন এবং এইভাবে ক্ষত্রিয়কুল রক্ষা পেল। এইভাবে ক্ষত্রিয় জাতি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ পুরুষদের ঔরসজাত এবং ক্ষত্রিয় রমণীদের গর্ভজাত হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। এইভাবে ক্ষত্রিয়দের বংশবৃদ্ধি হল এবং তারা দীর্ঘজীবন লাভ করল। তারপর বর্ণ বিভাগ অনুযায়ী তারা সমাজে ব্রাহ্মণদের নিচে স্থান পেল'।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সংঘাত ও সমন্বয় সম্পর্কে যেসব কাহিনী এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে, তা কিন্তু যেসব ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমঝোতার কাহিনী উল্লেখ করতে গেলে প্রথম যে নাম আসে তিনি হলেন কল্মাষপাদ।[১৯] কথিত আছে তিনি ছিলেন সুদাসের[২০] পুত্র। কল্মাষপাদ এবং বশিষ্ঠের মধ্যে যে শত্রুতা গড়ে উঠেছিল তা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে।[২১] এখন তাদের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

---

১৮. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৪৫১-৪৫২

১৯. আমি নিশ্চিত নই, এখানে যে-সব রাজার উল্লেখ করা হয়েছে, তা অধ্যায় IX-এ বর্ণিত কিনা। ইক্ষ্বাকু বংশের অন্তর্ভুক্ত বলে আমি উল্লেখ করেছি।

২০. কোন সুদাস, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। বিবরণ থেকে মনে হয় পৈজাবন সুদাস।

২১. অধ্যায় ৯ দ্রষ্টব্য।

সেই কাহিনী এইরূপ :

'বহু দেশ এবং পর্বত পরিভ্রমণ শেষে বশিষ্ঠ তার পুত্র শক্তির[২২] বিধবা পত্নী অদৃশ্যন্তীর সঙ্গে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। অদৃশ্যায়ন্তির গর্ভ থেকে বশিষ্ঠ বেদ পাঠের শব্দ শুনতে পেলেন। ঐ সময় অদৃশ্যন্তীর গর্ভবতী ছিলেন। তার গর্ভে যে পুত্র ছিল ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটির নাম হল পরাশর। বশিষ্ঠ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকছে তখন তিনি পুনরায় জীবননাশের চেষ্টা থেকে বিরত হলেন। রাজা কল্মাষপাদের সঙ্গে বনে যাদের বিরোধ ঘটেছিল তাদের তিনি গিলে খেতে যাওয়ার আগেই তার মুখ থেকে নির্গত প্রবল বাতাসের সাহায্যে তাকে নিবৃত করেন এরপর তিনি তার মুখে জল ছিটিয়ে পবিত্র গ্রন্থ থেকে স্তোত্র পাঠ করেন। এর ফলে তিনি তাকে অভিশাপ দেন এবং বারো বছর পর্যন্ত সেই অভিশাপের ফল ছিল। এরপর রাজা বশিষ্ঠকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মহামুনি, আমি সৌদাস, আপনি আমার পুরোহিত হন। কি কাজ করে আমি আপনাকে খুশি করতে পারি? বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা নিয়তি নির্ধারিত ছিল, তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে গিয়ে দেশ শাসন কর। কিন্তু হে রাজন, কখনও ব্রাহ্মণদের নিন্দা করবে না। রাজা উত্তর দিলেন, আমি কখনও উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করব না এবং আপনার নির্দেশে তাদের সব রকম সম্মান জানাব। আমি ইক্ষ্বাকুদের প্রতি কি করে আমার ঋণ শোধ করতে হয় তা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব। আপনি আমার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে সন্তান দেবেন। বশিষ্ঠ রাজার অনুরোধে সম্মত হলেন এবং তাঁরা অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। বশিষ্ঠ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে রাজাকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য রানী তার সঙ্গে সহবাসে গর্ভবতী হলেন এবং বারো বছর পর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল।

দ্বিতীয় ঘটনার কথা মহাভারতের[২৩] অনুশাসন পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

'ইক্ষ্বাকু বংশের বিখ্যাত রাজা সৌদাস কথার মোহজাল বিস্তার করে অভিবাদন পূর্বক পারিবারিক পুরোহিত মহামুনি শাশ্বত ঋষি মহাজ্ঞানী সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণকারী বশিষ্ঠের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সমীপে নিবেদন করে বললেন, হে ত্রিজগতের

২২. মূলে শব্দটি ভুল মনে হয়।

২৩. তাঁর নাম ছিল মদয়তি। অনুশাসন পর্বে তাঁকে মিত্রশাহ্‌র পত্নী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কল্মাষপাদের অন্য নাম হল মিত্রসাহ।

নিষ্কলুষ শ্রদ্ধেয় মহাঋষি, আপনি দয়া করে বলুন কীভাবে মানুষ তার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি লাভ করতে পারে? প্রত্যুত্তরে বশিষ্ঠ সবিস্তারে গাভী দানের সুফল সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, গাভী হচ্ছে এমন সব গুণের অধিকারী যা সব জীবকে লালন করে। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে গাভী পরিব্যাপ্ত করে সারা বিশ্বকে এবং গাভী হচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যতের মাতৃস্বরূপা। মহান রাজা সৌদাস ঋষির কথা অতি উত্তম বিবেচনা করে ব্রাহ্মণদের প্রচুর সংখ্যায় গাভী দান করলেন এবং এইভাবে পার্থিব প্রাপ্তি লাভ করলেন। সুতরাং এখানে সৌদাসের পুত্রকে একজন ঋষি বলে প্রশংসিত হতে দেখি'।

সমন্বয়ের তৃতীয় ঘটনাটিকে সুদাসের বংশধরদের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের[২৪] শান্তি পর্বে এই কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায় :

'পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করে কাশ্যপ একে ব্রাহ্মণদের বাসভূমিতে পরিণত করলেন এবং নিজে জঙ্গলে চলে গেলেন। এই অবসরে শূদ্র এবং বৈশ্যরা ব্রাহ্মণদের স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার শুরু করল। দেশে কোনও শাসন না থাকায় সবলদের দ্বারা দুর্বলরা অত্যাচারিত হতে লাগল। কোনও সম্পত্তির কোনও মালিক ছিল না। পৃথিবী দুষ্টের কবলে পড়ল। ফলস্বরূপ ক্ষত্রিয়ের শাসনের অভাবে মানুষ অরক্ষিত হয়ে পড়ল এবং চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ন্যায়ের আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না, বরং ন্যায়বিচার ভীত হয়ে ইতস্তত সঞ্চরণ করতে লাগল। কাশ্যপ তাকে দেখে তাঁর উরুর ওপর তাকে স্থাপন করলেন। এই অবস্থায় তাঁর নাম হল উর্বি। দেবী বসুমাতা কাশ্যপকে প্রসন্ন করে পৃথিবী রক্ষার জন্য এবং একজন রাজার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন আমি মহিলাদের মধ্যে অনেক ক্ষত্রিয়দের সুরক্ষিত করেছি এবং তারা এখন হিমালয় অঞ্চলের জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মলাভ করেছে, তারা আমার রক্ষার ভার গ্রহণ করুক। পৌরবের একজন উত্তরাধিকারী আছে, সে হচ্ছে বিদুরথের পুত্র। রিক্ষবৎ পর্বতে ভল্লুকের দ্বারা সে লালিত-পালিত হচ্ছে। সেই আমাকে রক্ষা করুক। এছাড়া সৌদাসেরও একজন উত্তরাধিকারী আছে। সে এখন দয়ার্দ্রহৃদয় বিখ্যাত পুরোহিত পরাশরের আশ্রয়ে আছে। সে ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রের মত সব দাসসুলভ কাজ সম্পন্ন করেছে। সেই রাজপুত্রের নাম সর্বকর্মন। অন্য যেসব রাজাকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের কথা বর্ণনা করে পৃথিবী বললেন, ক্ষত্রিয়দের এই বংশধরদের বিভিন্ন স্থানে সুরক্ষিত

২৪. ঋগ্বেদ, ম্যুর, খণ্ড ১, পৃ : ৩৭৪

করা হয়েছে। তারা যদি আমাকে রক্ষার ভার নেয় তাহলে আমি স্থানু অবস্থাতেই থাকব। তাদের পিতা এবং পিতামহদের মহাশক্তিশালী পরশুরাম বধ করেছিলেন। এখন আমার দায়িত্ব তার প্রতিশোধ নেওয়া। আমি সর্বদা কাশ্যপের মত শক্তিশালী লোকের দ্বারা সুরক্ষিত হতে চাই না, একজন সাধারণ শাসনকর্তা আমাকে রক্ষা করলেই খুশি থাকব। এখন আমার এই কথা দ্রুত কার্যে পরিণত হোক। তখন কাশ্যপ পৃথিবীর দ্বারা সৃষ্ট সব ক্ষত্রিয়ের সন্ধান করতে লাগলেন এবং তাদের খুঁজে এনে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন'।

এইসব ধরনের প্রমাণ আর কি? একে কি নির্ভরযোগ্য বলে কেউ গ্রহণ করতে পারে? আমার মতে গ্রহণ করা তো যায়-ই না, বরং এই ধরনের প্রমাণ থেকে সাবধান হওয়া উচিত। প্রথমত সমঝোতার এইসব কাহিনীতে শান্তি স্থাপনের স্বার্থে ক্ষত্রিয়দের সম্মান বিসর্জন দিতে হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয়দের অসম্মানজনকভাবে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। ভরত বংশীয়রা বশিষ্ঠের শত্রু ছিলেন। হঠাৎ তাদের দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তারা দেশত্যাগ করল এবং রাজ্যপাট হারাল। তখন তারা তাদের চিরশত্রু বশিষ্ঠকে আহ্বান করল এই অনাবৃষ্টির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্য। ভৃগু এবং ক্ষত্রিয়ের কাহিনীতে সব কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণদের। কারণ তারা এতই গর্বিত যে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে পারে না। হৈহয় ক্ষত্রিয় সৌদাস এবং কল্মাষপাদের কাহিনীতে ক্ষত্রিয়দের বশ্যতা স্বীকার প্রসঙ্গে বলতে গেলে দেখা যায় বিজয়ী ব্রাহ্মণদের কাছে তাদের নারীদের উৎসর্গ করে তাদের কাছে এই বশ্যতা ক্রয় করা হয়েছিল। এইসব কাহিনী এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে ব্রাহ্মণদের গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষত্রিয়রা অপমানিত হয়। কে এইসব নিকৃষ্ট, ঘৃণার্হ, এবং অগৌরবের কাহিনীকে সমঝোতার প্রকৃত ঘটনা বলে মেনে নেবে? একমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থকদের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব।

সমন্বয়ের প্রশ্নে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তার সাধারণ চরিত্রই হল এটা। এখন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের মধ্যে সমঝোতার বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করলে দেখা যায়, সুদাসের বংশধরদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের এই ধরনের কোনও প্রকার যে সমঝোতা হয়নি তার অনেক প্রমাণ আছে। প্রথমত এ কথার প্রতিবাদ করা যায় না যে বশিষ্ঠের পুত্র শক্রি এবং শক্রির পুত্র পরাশর যখন শুনলেন কীভাবে তাঁর

পিতা শক্রিকে শূদ্র রাজা সুদাস আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন সব জীবকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলবেন। সব জীবকে ধ্বংস করে ফেলা কথাটি একটি গালভরা শব্দ। আসল ঘটনা হল বশিষ্ঠ সুদাসের বংশধরদের অর্থাৎ শূদ্রদের প্রতি সাধারণভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। তবে একথা সত্য যে মহাভারতে বলা হয়েছে কীভাবে বশিষ্ঠ ভৃগু এবং ক্ষত্রিয়দের কাহিনী বর্ণনা করে পরাশরকে তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা থেকে নিবৃত করেন। বশিষ্ঠ পরাশরকে বলেন, কীভাবে ভৃগু এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সংঘাত হয়েছিল এবং কীভাবে ভৃগু অহিংস উপায় অবলম্বন করে ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু এই কাহিনীও সত্য হতে পারে না। কারণ অন্য আরও অনেক কাহিনীর মত ব্রাহ্মণদের গৌরবান্বিত করার জন্য এই কাহিনী রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে যে কোনও প্রকার সমঝোতা হয়নি তার স্বপক্ষে সব থেকে বড় প্রমাণ হল ব্রাহ্মণদের শূদ্রদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন। শূদ্রদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের আইন প্রণয়নের কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই আইনের বিকাশ এবং তার অসাধারণ গুরুত্বের কথাও বলা হয়েছে। শূদ্রদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণরা যে কালাকানুন প্রণয়ন করে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে যে কোনও প্রকার সমঝোতা হয়েছিল তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের যে কোনও প্রকার ক্ষমা করেনি তাই নয়, শূদ্রদের বংশধরদের প্রতিও তাদের প্রতিশোধস্পৃহা একটুকুও হ্রাস পায়নি। অনেকের এ সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকা স্বাভাবিক এবং সেই কারণে চণ্ডাল এবং নিষাদদের সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মিশ্র বিবাহের ফলে চণ্ডাল ও নিষাদদের উৎপত্তি। নিশাদ হচ্ছে অনুলোম এবং চণ্ডাল হচ্ছে প্রতিলোম। অনুলোমরা উপনয়নের যোগ্য। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এখানে আইনের ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে এবং শূদ্র মাতার গর্ভে জন্ম নিষাদদের এবং নিষাদরা অনুলোম হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপনয়নের অধিকার দেওয়া হয়নি। কেন এক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল তা জানা দরকার। এর একমাত্র উত্তর হল ব্রাহ্মণরা শত্রুদের সন্তানদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন স্বরূপ এই ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

১. মনুস্মৃতি অনুসারে ঃ

নিচের তালিকায় ছটি অনুলোম জাতির উল্লেখ করা হয়েছে :

পিতা	মাতা	বংশের নাম
ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	মূর্ধাবিসিক্ত
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অম্বস্থ
ব্রাহ্মণ	শূদ্র	নিষাদ
ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	মাহিষ্য
ক্ষত্রিয়	শূদ্র	উর্গ
বৈশ্য	শূদ্র	করণ

এরপর আসা যাক প্রতিলোমদের[২৫] কথায়। সন্দেহাতীতভাবে মনু এদের সবাইকে জারজ বলে অভিহিত করেছেন। প্রতিলোমদের ক্ষেত্রে তাদের বংশের ছাপ বা কলঙ্ক সমভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আয়োগের এবং ক্ষত্তারদের ওপর অন্যায় অবিশ্বাস্যভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। চণ্ডালদের ওপর অকথ্য ঘৃণ্য কাজ করা হয়েছে।

কতটা প্রভেদ তা জানার জন্য মনু স্মৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। আয়োগবদের সম্পর্কে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে :

আয়োগবদের বৃত্তি হবে ছুতারের কাজ করা। ক্ষত্তারদের সম্পর্কে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে তাদের বৃত্তি হবে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পশুদের ধরা এবং বধ করা। এদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে নিচু কাজ।

২৫. গৌতম ধর্মসূত্র IV. ২১. কানে কর্তৃক উদ্ধৃত, খণ্ড ২, পৃ : ২২৯

নিচের তালিকায় ছটি প্রতিলোম জাতির তালিকা দেওয়া হয়েছে :

পিতা	মাতা	বংশের নাম
শূদ্র	ব্রাহ্মণ	চণ্ডাল
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্তার
শূদ্র	বৈশ্য	আয়োগব
বৈশ্য	ব্রাহ্মা.	সুত
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	বৈদেহিক
ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	মগধ

এদের সঙ্গে তুলনায় চণ্ডালদের সম্পর্কে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে :

চণ্ডাল—ভল্লুক, মোরগ, কুকুর, ঋতুকালীন অবস্থায় নারী এবং খোজা পুরুষ ব্রাহ্মণকে ভোজনরত অবস্থায় দর্শন করতে পারে না। III. ২৩৯

সমাজচ্যুত ব্যক্তি, চণ্ডাল, পুক্কস, নির্বোধ, গর্বিত ব্যক্তি, নিম্নজাত লোক ও অন্ত্যবাসীদের সঙ্গে একত্রে বাস করবে না। IV. ৭৯

চণ্ডাল অথবা ঋতুমতী নারী, সমাজচ্যুত ব্যক্তি এবং মৃতদেহকে যে স্পর্শ করে স্নানের দ্বারা সে শুদ্ধ হতে পারে। V. ৮৫

মনুর ঘোষণা—কুকুর কর্তৃক নিহত পশুর মাংস এবং অন্যান্য মাংসাশী পশু কর্তৃক নিহত পশুর মাংস অথবা চণ্ডাল ও দস্যু কর্তৃক নিহত পশুর মাংসকেও পবিত্র করা যেতে পারে।—V. ১৩১

এক বছরের মধ্যে দু'বার অপরাধ করলে জরিমানার পরিমাণ হবে দ্বিগুণ। কোনও ব্যক্তি যদি ব্রাত্য অথবা চণ্ডাল নারীর সঙ্গে সহবাস করে তার সাজাও হবে দ্বিগুণ।—VIII. ৩৭৩

যে লোক নির্বোধের মতো তার নিজের ছাড়া অন্য কোনও জাতির লোকের সঙ্গে তার স্ত্রীকে সহবাসে অনুমতি দেয় এবং তাকে যদি ধরা যায়, তাহলে সে ব্যক্তিও চণ্ডালের মতই ঘৃণিত বলে বিবেচিত হবে।—IX. ৮৭

চণ্ডাল এবং শ্বপচরা বসবাস করবে গ্রামের বাইরে। তারা কাজের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হবে না এবং তাদের সম্পত্তি বলতে থাকবে শুধু গৃহপালিত কুকুর ও গাধা।—X. ৫১

বিশ্বামিত্র একবার ভালমন্দ জেনে শুনেই ক্ষুৎপীড়িত হয়ে কুকুরের মাংস খাওয়ার জন্য চণ্ডালদের হাত থেঁকে তা গ্রহণ করেছিলেন।—X. ১০৮

যজ্ঞে উৎসর্গের জন্য ব্রাহ্মণ কখনই শূদ্রদের কাছ থেকে কোনও প্রকার দান গ্রহণ করতে পারবে না। আর যদি তা করে তাহলে মৃত্যুর পর সে চণ্ডাল হয়ে জন্ম নেবে।—VI. ২৪

ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কোনও ব্রাহ্মণ যদি কোনও শূদ্র রমণীর সঙ্গে সহবাস করে, তাদের হাতে খাদ্য খায় এবং উপহার গ্রহণ করে এবং এসব যদি ঐ ব্রাহ্মণের অজান্তে হয় তাহলে ঐ ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হবে আর যদি ব্রাহ্মণ ঐ কাজ

জ্ঞানত করে থাকে তাহলে সেই ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলে গণ্য হবে। ব্রহ্মহত্যাকারী কুকুর, ভল্লুক, গাধা, উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, বিভিন্ন বন্য জন্তু, পাখি, চণ্ডাল ও পুক্কাসের ঘরে জন্ম নেবে।—XI. ৫৫ ক্ষত্তার এবং আয়োগবদের (Ayogava) তুলনায় চণ্ডালদের সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবহার করা হত, যদিও উভয়ই প্রতিলোম জাতি। কিন্তু কেন? শুধুমাত্র চণ্ডালকেই কেন ঘৃণিত প্রতিলোম জাতি বলে চিহ্নিত করা হল? এর একমাত্র কারণ সে শূদ্র পিতাজাত। শক্রর সন্তানদের ওপর এটা এক ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণ। এইসব ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে কোনও প্রকার সমঝোতা হয়নি।

চার

আমাদের শেষ প্রতিবাদ হচ্ছে এই যে, এই ঘটনার পিছনে একটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। কারণটি হল এমন একটি মনোভাব কাজ করতে পারে যে ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্ররা সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে তাতে ব্রাহ্মণরা বেশ ভীত হয়ে পড়েছিল। এই ধরনের মনোভাবের ফলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটা ভয় দানা বেঁধে উঠেছিল এবং তারা চিন্তা করেছিল যে শূদ্রদের এই আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করার নীরব উপায় হল তাদের উপনয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। হিন্দু সমাজে শূদ্ররা মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশে পরিণত হয়েছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্রদের সংখ্যাধিক্য দেখেই ব্রাহ্মণদের মনে ভয় ও হিংসার উদ্রেক করেছিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। কারণ ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্র এবং হিন্দু সমাজের শূদ্র সম্পূর্ণ আলাদা। হিন্দু সমাজের শূদ্ররা জাতিগতভাবে ইন্দো-আর্য সমাজের শূদ্রদের বংশধর নয়। এই সন্দেহের কারণ ইন্দো-আর্য সমাজে এবং হিন্দু সমাজে শূদ্রের অর্থ যে সম্পূর্ণ আলাদা তা বোঝার ব্যর্থতা। ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্রের অর্থ কোনও এক ব্যক্তি বিশেষের নাম। শূদ্র অর্থ একটি জাতিগোষ্ঠীর লোকের নাম। কিন্তু হিন্দু সমাজে শূদ্র বলতে কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম বুঝায় না। এখানে শূদ্র বলতে বোঝায় অসংস্কৃতি সম্পন্ন এক শ্রেণীর মানুষকে। এটি বিবিধ ও বিচিত্র উপজাতি ও গোষ্ঠীর একটি সাধারণ পদবি। একমাত্র নিচুমানের সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুতেই তাদের মধ্যে কোনও মিল নেই। শূদ্র নামে তাদের ডাকা ভুল। আর্য সমাজের একই নামধারী ব্যক্তি যারা ব্রাহ্মণদের অপমান করেছিল তাদের ব্যাপারে এদের কিছুই করার নেই। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এই নির্দোষ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষদের

পরবর্তীকালে আদি শূদ্রদের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয় এবং বিনা দোষে তাদের একই শাস্তি ভোগ করতে হয়। ইন্দো-আর্য সমাজের এবং হিন্দু সমাজের শূদ্ররা শুধু সম্পূর্ণ আলাদাই নয়, তাদের বৈশিষ্ট্যই আলাদা এবং তা যে সত্য একথা ধর্মসূত্রকারদের মনে ছিল। এই পার্থক্য খুবই পরিষ্কার তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সৎ শূদ্রের এবং অসৎ শূদ্রের এবং অনির্বাসিত শূদ্র ও নির্বাসিত শূদ্রের মধ্যে তাঁরা যে পার্থক্য করেছেন তার মধ্যে। সৎ শূদ্রের অর্থ সংস্কৃতি সম্পন্ন শূদ্র এবং অসৎ শূদ্রের অর্থ অসংস্কৃতি সম্পন্ন শূদ্র। অনির্বাসিত শূদ্রের অর্থ যেসব শূদ্র গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করে, আর নির্বাসিত শূদ্রের অর্থ যে সব শূদ্র গ্রাম সমাজের বাইরে বাস করে। এটি সম্পূর্ণ ভুল এবং সে ভুল অনেকেই করে থাকেন যে এই বিভাজনের অর্থ আইন প্রণেতাদের কাছে শূদ্রদের অবস্থার উন্নতি হওয়া যে কিছু কিছু লোককে সমাজে মেলামেশার জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যা আগে কখনও হত না। সৎ শূদ্রের এবং নির্বাসিত শূদ্রের সঠিক ব্যাখ্যা হল আর্য সমাজের শূদ্রদের উল্লেখ এবং অসৎ শূদ্রের এবং অনির্বসিত শূদ্রদের সম্পর্কে হিন্দু সমাজের শূদ্রদের উল্লেখ। আমরা আর্য সমাজের শূদ্রদের নিয়েই আলোচনা করছি। হিন্দু সমাজের পরবর্তীকালের শূদ্রদের সঙ্গে এই শূদ্রদের কোনও সম্পর্ক নেই। আর তাই যদি হয় তাহলে হিন্দু সমাজের এক বড় জনসংখ্যাই যে শূদ্রতা ইন্দো-আর্য সমাজের শূদ্ররা যে একটি বড় জনগোষ্ঠী এই যুক্তির ভিত্তি হতে পারে না। আমরা একথা জানি না যে, শূদ্ররা কি ছিল—উপজাতি, গোষ্ঠী অথবা কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ পরিবারের সমষ্টি। কিন্তু তারা যদি একটি বড় উপজাতিও হয়, তাহলেও তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার বেশি হবে না। ভরত বংশীয়রা স্পষ্টভাবে ঋগ্বেদে বলেছেন যে, তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন। পাঞ্চাল রাজ সত্রসাহ্[২৬] যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন তার উল্লেখ করে শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে :

'সত্রসাহ্ যখন অশ্বমেধ যজ্ঞে আহুতি দেন তখন ছ'হাজার ছশ ত্রিশজন তুর্বস বর্মাবৃত হয়ে হাজির হয়'।

এতে যদি এই ইঙ্গিত করা হয় যে তুর্বস উপজাতির সংখ্যা ছ'হাজার হয়ে থাকে তাহলে শূদ্রদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। শূদ্রদের সংখ্যা নিয়ে এইসব প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া এই বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে তারা আর কি করতে পারত? যে ব্রাহ্মণদের তারা অপমান করেছে তারা তাদের উপনয়ন সম্পন্ন করতে অস্বীকার

২৬. লাইফ অব্ বুদ্ধ, ওল্ডেনবার্গ, পৃ : ৪০৪

করে। কিন্তু এক্ষেত্রে শূদ্ররা যে ব্রাহ্মণদের অপমান করেনি, উপনয়নের জন্য শূদ্ররা সেই ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হতে পারত। এই সব সম্ভাবনা অবশ্য বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। প্রথমত আমরা জানি না যে শূদ্রদের দ্বারা অপমানিত হবার পর তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্রাহ্মণরা একযোগে কোনও মোর্চা গঠন করেছিল কিনা এবং যদি করে থাকে তাহলে সেই মোর্চা ছেড়ে কোনও ব্রাহ্মণের বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল কিনা। এছাড়া একথাও আমরা জানি না যে, সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সময় ব্রাহ্মণরা কোনও জাতি ছিল কিনা। কিন্তু একথা আমরা জানি যে ঋগ্বেদের[২৭] সময় থেকেই ব্রাহ্মণরা একটি শ্রেণী হিসাবে পরিচিত ছিল। তখন থেকেই তাদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা গড়ে ওঠে এবং সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তারা তৎপর হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শূদ্রদের কোনও প্রকার প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত এমনও অসম্ভব ছিল না যে ঐ সময় উপনয়নের বিষয়টি পারিবারিক পুরোহিতদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। রাজা নিসির[২৮] কাহিনী প্রমাণ করে, যজ্ঞের একচেটিয়া অধিকার ছিল পারিবারিক পুরোহিতদের। যে কথা বলা হল তা যদি সত্য হয়, তবে সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণচক্রের বিরুদ্ধে শূদ্রদের বিশেষ কিছুই করার ছিল না।

আর একটি সম্ভাবনার বিষয় অবশ্য ছিল। সেটি হচ্ছে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটি সাধারণ মোর্চা গঠন করা যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের বিরোধিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান যায়। এটি সম্ভব ছিল কিনা তা কেবলই অনুমানের বিষয়। প্রথমত শূদ্ররা কি বুঝতে পেরেছিল উপনয়নের অধিকার হারালে ভবিষ্যতে তাদের সামাজিক মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমি নিশ্চিত যে, শূদ্ররা তা বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয়ত ক্ষত্রিয়রা কি তখন সংঘবদ্ধ ছিল? এ ব্যাপারে আমার সংশয় আছে। তৃতীয়ত অন্য ক্ষত্রিয় রাজাদের কি শূদ্রদের ওপর কোনও প্রকার সহানুভূতি ছিল? ঋগ্বেদে কথিত 'দশরাজন যুদ্ধ' কাহিনী যদি সত্য হয় তাহলে এটি সুস্পষ্ট যে শূদ্র এবং অন্যান্য অশূদ্র ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তেমন কোনও হৃদ্যতা ছিল না।

এই সমস্ত ঘটনা বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে এতে অবাক হবার কিছুই থাকবে না যদি ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার হরণ করে থাকে এবং এটি ঘটনা।

□ □

২৭. ধর্মসূত্র, কানে, খণ্ড ২ (১), পৃ : ২৯

২৮. তদেব, পৃ : ১৭৫

অধ্যায় ১২

কঠোর পরীক্ষা তত্ত্ব

এক

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে শূদ্রদের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজে বের করা এবং সমাজে তাদের অধঃপতিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান। ঐতিহাসিক তথ্য এবং বিভিন্ন রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী লেখকদের মতবাদের ব্যাখ্যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি একটি নতুন প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমি আমার বক্তব্যের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য বিষয়গুলি আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরেছি। এখন সেই অংশগুলি একত্রে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করছি, যাতে আমার বক্তব্যের অর্থ সকলে ভালভাবে বুঝতে পারে। আমার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় :

(১) শূদ্ররা সূর্যবংশের আর্য সম্প্রদায়ের অন্যতম জাতি ছিল;

(২) ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্ররা ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত ছিল;

(৩) আর্য সমাজে কোনও এক সময় মাত্র তিনটি বর্ণ ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শূদ্রদের আলাদা কোনও বর্ণ ছিল না, তারা ক্ষত্রিয় বর্ণের অংশভুক্ত ছিল;

(৪) শূদ্র রাজা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিরন্তর বিরোধ লেগে থাকত এবং শূদ্র রাজাদের হাতে ব্রাহ্মণরা অনেক অত্যাচার ও অপমান সহ্য করেছে;

(৫) শূদ্র রাজাদের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপবীত ধারণের জন্য উপনয়নে পৌরোহিত্য করতে অস্বীকার করে;

(৬) পবিত্র উপবীত না থাকায় শূদ্ররা সমাজে পতিত হল, তাদের স্থান হল বৈশ্যদের নিচে এবং এইভাবে তারা চতুর্থ বর্ণভুক্ত হল।

এখন কথা হল, আমার এই বক্তব্যের যথার্থতাকে বুঝা কতখানি সম্ভব তা প্রমাণ করা। স্বাভাবিকভাবে এই দায় প্রবন্ধকারের ওপর বর্তায় না। এই কাজ করার দায় অন্যের। কিন্তু আমি এই কাজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছি এবং আমার বক্তব্যের সত্যাসত্য প্রমাণের ভারও নিজে গ্রহণ করেছি। আমার এই কাজ করার কারণ হল এতে আমি আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পাব।

দুই

আমি একথা ভালভাবেই জানি যে আমার সমালোচকরা আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলতে পারেন যে আমার বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে মহাভারতের একটি মাত্র সূত্র যেখানে শুধুমাত্র যেখানেই পৈজাবনকে শূদ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুদাসের সঙ্গে পৈজাবনের সম্পর্ক সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায়নি। পৈজাবন শূদ্র ছিলেন তা মহাভারতের একটি মাত্র জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এই রকমের দুর্বল ভিতের ওপর স্থাপিত মতবাদ কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এতে স্বাভাবিকভাবে এমন কথা মনে হতে পারে যে, এই তত্ত্বের ভিত্তি খুব জোরাল নয়। বরং যথেষ্ট দুর্বল। আমি নিশ্চিত যে, আমার প্রবন্ধের বক্তব্যকে এইভাবে সহজে খাটো করা বা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রথমত আমি স্বীকার করি না যে কোনও বক্তব্য একটি মাত্র প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। প্রমাণ তত্ত্বের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কোনও বিষয় প্রমাণ করতে হলে তা সাক্ষীর সংখ্যার ওপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে সেই সাক্ষীর গুরুত্বের ওপর। এক্ষেত্রে কত সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা গেল, তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল যে বা যারা সাক্ষ্য দিচ্ছে তার গুরুত্ব কতখানি তার ওপর। পৈজাবন শূদ্র ছিলেন বলে মহাভারতে যে কথা বলা হয়েছে তার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। মহাভারতের রচয়িতা অসত্য কথা লিপিবদ্ধ করবেন এমন ভাবা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে মহাভারত রচনার সময় তার মধ্যে কি এমন উদ্দেশ্য এবং মনোভাব থাকতে পারে যাতে, তিনি অসত্য কথা লিখবেন। নিশ্চিতভাবে উপসংহারে আসা যায় যে, মহাভারতের রচয়িতা একটি প্রকৃত ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। ঋগ্বেদে পৈজাবনকে যে শূদ্র বলে উল্লেখ করা হয়নি, তাতে মহাভারতের বক্তব্যে যে সত্যতা আছে তাকে নস্যাৎ করা যায় না। ঋগ্বেদে পৈজাবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার সম্পর্কে যে শূদ্র শব্দটির উল্লেখ করা

হয়নি তার অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যা হচ্ছে ঋগ্বেদে এই ধরনের বর্ণনা আশা করা যায় না। ঋগ্বেদ হচ্ছে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। একটি ধর্মীয় গ্রন্থে শূদ্রের বর্ণনা আশা করা ঠিক নয়। কারণ এটি অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই ধরনের বর্ণনা মহাভারতের মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে থাকাটা খুব-ই স্বাভাবিক এবং সত্যি কথা বলতে কি মহাভারতে সেই উল্লেখ আছে।

এ সম্পর্কে আমার আর একটি ব্যাখ্যা হল সুদাস সম্পর্কে বারে বারে শূদ্র কথাটির উল্লেখ করা হয়নি এবং তা অপ্রয়োজনীয় ছিল। কুল, গোত্র, জাতি প্রভৃতি পরিচয়ের চিহ্ন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অপ্রধান লোকদের সম্পর্কে এই ধরনের পরিচিতি চিহ্ন প্রয়োজন, কিন্তু বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এর বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই। সুদাস যে তার সময় একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন, সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং শূদ্র হিসাবে মানুষের কাছে তার পরিচিতি তুলে ধরার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিষয়টি পুরোপুরি অনুমানভিত্তিক নয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বুদ্ধদেবের সময় বিম্বিসার এবং পসেনদি নামে দুই রাজা ছিলেন। ঐ সমসাময়িক কালের অন্য সব রাজাদের তৎকালীন সাহিত্যে তাদের গোত্রের নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই দুই রাজাকে তাদের ব্যক্তিগত নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ এই ঘটনা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন যে ঐ দুই রাজা খুব সুপরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য তাদের গোত্রের নামে পরিচিত করানোর প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

তিন

কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে, আমার এই তত্ত্ব শুধুমাত্র মহাভারতের একটি মাত্র অনুচ্ছেদ অথবা সুদাসের সঙ্গে পৈজাবনের সম্পর্কের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে।

এই ধরনের কোনওটিই নয়। এই প্রবন্ধ কোনও একটি ধারাবাহিক সংযোগের ওপর নির্ভর করে লিখিত হয়নি, সুতরাং এই ধারাবাহিক সংযোগের দুর্বলতর অংশের ওপর এর ভিত্তি—এই যুক্তি এখানে প্রযোজ্য নয়। বিষয়টি বেশ কয়েকটি সমান্তরাল ধারাবাহিক সূত্রের ওপর নির্ভর করে রচিত। এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র যদি দুর্বল হয়, তাহলে কিন্তু বিষয়টি দুর্বল হয়ে গেল একথা বলা যায় না। একটি ধারাবাহিক সংযোগের কোনও একটি অংশ যদি দুর্বল হয়, তাহলে অন্য যোগসূত্রগুলির গুরুত্ব

আরও বেড়ে যায়। সুতরাং এই তত্ত্ব অচল এই উপসংহারে আমার পূর্বে একথা প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণের অন্য যোগসূত্রগুলির ওপরও নির্ভর করা যায় না।

পৈজাবনকে সুদাস বলে বর্ণনা করা এবং সুদাসের সঙ্গে পৈজাবনের সম্পর্কের উল্লেখে ঋগ্বেদে যে কথা বলা হয়েছে, আমার গবেষণা প্রবন্ধের ভিত্তি শুধুমাত্র ঐ একটি যোগসূত্রই নয়। আরও অনেক পারস্পরিক যোগসূত্র আছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম যোগসূত্র হচ্ছে শতপথ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। যেখানে বলা হয়েছে বর্ণ মাত্র তিনটি এবং শূদ্র বলে আলাদা কোনও বর্ণ নেই। দ্বিতীয় বিষয় হল এমন প্রমাণ আছে যে শূদ্ররা রাজা ও মন্ত্রী ছিল। তৃতীয় যুক্তি হল শূদ্রদের একসময় উপনয়নের অধিকার ছিল। এসবগুলি-ই খুব জোরালো যোগসূত্র এবং প্রথম যোগসূত্র যদি ব্যর্থ হয়ও তাহলে এগুলিই আমার যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করতে পারে।

আর সাক্ষ্য প্রমাণের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বলতে হয় সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা কোনও ব্যাপারে পাওয়া কদাচিত ঘটনা এবং আমি আমার গবেষণাকৃত প্রবন্ধ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চয়তা দাবি করি না। কিন্তু আমি একথা অবশ্যই দাবি করব যে, আমার তত্ত্বের ভিত্তি একেবারেই সরাসরি এবং ঘটনা পরম্পরা নির্ভর এবং যেখানে কোনও ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়, সেখানে আমার বক্তব্যের অনুকূলে জোরালো সম্ভাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

চার

আমার প্রবন্ধে যে বক্তব্য রয়েছে তাতে কতটা জোরাল যুক্তি রয়েছে, তা আমি দেখিয়েছি। এখন আমি অবশ্যই প্রমাণ করব যে, আমার এই যুক্তি অত্যন্ত খাঁটি। এর জন্য সাধারণভাবে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খাঁটি বলে বিবেচিত আমি সেইভাবেই আমার প্রবন্ধের যথার্থতা প্রমাণ করব। প্রবন্ধের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত করতে হলে শুধুমাত্র সমস্যার সমাধান সুপারিশ করলেই চলবে না, এতে অবশ্যই দেখতে হবে যে, যে সমাধান সূত্র প্রস্তাব করা হচ্ছে তাতে সমস্যাকে ঘিরে যে রহস্য আছে তারও সমাধান হয়ে যায়। এই ধরনের পরীক্ষার নীতি আমি আমার প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব।

শূদ্রদের সম্পর্কে যেসব রহস্যপূর্ণ সমস্যা আছে তা দিয়েই শুরু করা যাক। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ :

(১) শূদ্রদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা অনার্য, তারা আর্যদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং আর্যরা শূদ্রদের পরাভূত করে ক্রীতদাসে পরিণত করে। তাই যদি হয়, তাহলে যজুর্বেদে এবং অথর্ববেদে ঋষিরা কীভাবে শূদ্রদের জয়গান করেন এবং শূদ্রদের সুনজরে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন?

(২) শূদ্রদের বেদপাঠের অধিকার নেই বলে বলা হয়ে থাকে। তাই যদি হয় তাহলে রাজা সুদাস যিনি একজন শূদ্র ছিলেন তিনি কি করে ঋগ্বেদের স্তোত্র রচনা করেন?

(৩) শূদ্রদের সম্পর্কে বলা হয় তাদের যজ্ঞ করার কোনও অধিকার নেই। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে কীভাবে শূদ্র রাজা সুদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন? কীভাবে সতপথ ব্রাহ্মণ শূদ্রকে যজ্ঞের হোতা বর্ণনা করেছে এবং তাকে সম্বোধন করার সূত্র নির্দেশ করেছে?

(৪) শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার নেই বলে বলা হয়ে থাকে। শুরু থেকেই শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার ছিল না একথা যদি সত্য হয়, তাহলে বিষয়টি নিয়ে এত বিরোধ কেন? কেন বদরী এবং সংস্কার গণপতিতে বলা হয়েছে যে, শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার আছে?

(৫) শূদ্রদের ধনসম্পত্তির অধিকার নেই। তাহলে মৈত্রায়নী এবং কথক সংহিতায় কেন বলা হয়েছে যে শূদ্রদের মধ্যে ধনসম্পদের অধিকারী লোক ছিল?

(৬) শূদ্রদের রাজকার্যের কোনও যোগ্যতা নেই বলে বলা হয়ে থাকে। একথা যদি সত্য হয় তাহলে মহাভারতে কেন শূদ্র মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে?

(৭) বলা হয়ে থাকে শূদ্রদের কাজই হল সেবা করা; অন্য তিন বর্ণের লোকদের ক্রীতদাসের মত সেবা করাই শূদ্রদের কাজ। তাই যদি হয় তাহলে শূদ্রদের মধ্যে রাজা ছিল কীভাবে? শূদ্রদের মধ্যে যে রাজা ছিল তার প্রমাণ শূদ্র রাজা সুদাস এবং সায়নাচার্য বর্ণিত অন্যান্য রাজা?

(৮) শূদ্রদের যদি বেদ পাঠে, উপনয়নে এবং যজ্ঞে কোনও অধিকার না থাকে তাহলে তাদের বেদপাঠে, উপনয়নে এবং যজ্ঞের অধিকার দেওয়া হয়নি কেন?

(৯) শূদ্রদের উপনয়ন, তাদের বেদশিক্ষা, যজ্ঞ প্রভৃতিতে শূদ্রদের নিজেদের কতটা লাভের ছিল তা নিয়ে প্রশ্নে উঠতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তা ছিল প্রভূত লাভের বিষয়। কারণ ঐ কাজে পৌরোহিত্য করার ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া

অধিকার ছিল। শূদ্রদের উপনয়ন, বেদ শিক্ষা, যজ্ঞ প্রভৃতিতে অধিকার থাকায় ব্রাহ্মণরা ঐ সব কাজে পৌরোহিত্য করে প্রচুর পরিমাণে অর্থ আয় করার সুযোগ পেত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের বঞ্চিত করল কেন? বঞ্চিত না করলে তাদের কোনও ক্ষতি হত না এবং তাদের এক্ষেত্রে আর্থিক লাভের প্রচুর সুযোগ থাকত।

(১০) এমন কি শূদ্রদের উপনয়ন, বেদ শিক্ষা বা যজ্ঞের কোনও অধিকার যদি নাও থাকত, তাহলে এটি স্বীকার করা বা না করার অধিকার ব্রাহ্মণদের কাছে উন্মুক্ত থাকত। সুতরাং বিষয়গুলি ব্রাহ্মণদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হল না কেন? কোনও ব্রাহ্মণ যদি এসব কাজ করতেন তাহলে তার ওপর শাস্তি আরোপ করা হত কেন?

এই রহস্যের কি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে? গোঁড়া হিন্দু এবং আধুনিক গবেষক কেউই এর ব্যাখ্যা খোঁজার কোনও চেষ্টা করেননি। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের রহস্যজনক সমস্যা যে আছে সম্ভবত তারা সে সম্পর্কে অবগত নন। গোঁড়া হিন্দুরা বিষয়টি উপেক্ষা করেন আর আধুনিক গবেষকগণ একথা মনে করে সন্তুষ্ট থাকেন যে, শূদ্ররা অনার্য-আদিবাসী এবং তাদের জন্য আর্যরা সঙ্গত কারণেই একটি আলাদা আচরণ বিধি প্রণয়ন করেন। এটি খুব-ই দুঃখের বিষয় যে এদের কেউই শূদ্রদের সমস্যা ঘিরে যে রহস্য রয়েছে তার সমাধানে কোনও প্রকার চেষ্টা করেননি এবং সমাজে তাদের অবস্থান-সঙ্কট সমাধানের জন্যও কোনও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করেননি।

আমার এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে পারি, শূদ্রদের সম্পর্কে সব রহস্যের ব্যাখ্যা এতে দেওয়া হয়েছে। এক এবং চার নম্বর সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করা হয়েছে, কীভাবে শূদ্ররা রাজা এবং মন্ত্রী হতে পারেন এবং কীভাবে ঋষিরা তাদের জয়গান গেয়ে তাদের সুনজরে থাকতে পারেন। পাঁচ এবং ছয় নম্বর সিদ্ধান্তে কেন শূদ্রদের উপনয়ন নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল তা বর্ণনা কথা হয়েছে। এছাড়া আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়ন অস্বীকার করার জন্য আইন তৈরি করে এবং যদি কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্রদের উপনয়নের কাজে পৌরোহিত্য করতে ইচ্ছা করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। বস্তুত এমন কোনও সমস্যা নেই যা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়নি। আমি এই প্রবন্ধ সম্পর্কে বলতে পারি যে, এটি সম্পূর্ণ এবং ষোলো আনা খাঁটি। এই বিষয়টি নিয়ে এর থেকে ভাল কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব নয়।

□ □

পরিশিষ্ট - I

ঋগ্বেদে 'অর্থ' শব্দের উল্লেখ

১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০	
ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম
৩৩	৩	২৩	১৩	৪৩	২	১	৭	২	১২	১৪	৩	৮	১	১	৪	২৩	৩	২০	৪
৭০	১	২৩	১৫			২	১২	৩৩	২	১৫	৩	২১	৫	১৯	৩৬	৬১	১১	২৭	৮
৭১	৩	৩৫	২			২	১৮	৩৩	৬	১৬	২৭	২১	৯	২১	১৬	৭৯	১	২৭	১৯
৭৩	৫					৪	৬	৩৩	৯	২০	১	৩১	৫	২৪	২২১			৩৪	১৩
৮১	৬					১৬	১৯	৩৪	৯	২৪	৫	৩৪	১৮	৩৪	১০			৪২	১
৮১	৯					২০	৩	৫৪	১২	২৫	৭	৪৮	৩	৩৯	২			৫৯	৩
১১৬	৬					২৪	৮			৩৬	৫	৫৬	১২	৪৮	৮			৭৬	২
১১৮	৯					২৯	১			৪৫	৩৩	৬০	১১	৪৯	১২			৮৬	১
১২১	১৫					৩৮	২			৪৭	৯	৬৪	৩	৫২	৭			৮৬	৩
১২২	১৪					৪৮	১			৪৮	১৬	৬৮	২	৫৪	৯			৮৯	৩
১৬৯	৬					৫০	১১			৫১	২	৮৩	৫	৫৫	১২			১৩৩	৩
১৮৪	১									৫৯	৮	৮৬	৭					১৪৮	৩
১৮৫	৯											৯২	৪					১৯১	১
												১০০	৫						

পরিশিষ্ট - II

'আর্য' শব্দের ব্যবহার

১) ঋগ্বেদে

১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০	
ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম
৫১	৮	১১	১৮	৩৪	৯	২৬	২	৩৪	৬	১৮	৩	৫	৬	২৪	২৭	৬৩	৬	৩৮	৩
৫৯	২	১১	১৯			৩০	১৮			২০	১০	১৮	৭	১০৩	১	৬৩	১৪	৪৩	৪
১১৭	২১									২৫	২	৮৩	১					৪৯	৩
১৩০	৮									৩৩	৩							৬৫	১১
১৫৬	৫									৬০	৬							৬৯	৬
																		৮৩	১
																		৮৬	১৯
																		১০২	৩
																		১০৩	৩
																		১৩৮	৩
																		১৯১	১

পরিশিষ্ট - II

(২) যজুর্বেদে (৩) অথর্ববেদে

১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০	
ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম
২০	৪	১১	৩	৬৩	৪	১	২১	৩২	৮	১৮	৫			৩২	১	১১	৯	৬৩	৪
																১৭	৪		
২০	৮							৬২	১	৮৫	৪					১৮	৫		
																৩৬	১০		
																৮৫	৪		
																৮৯	১		
																৯৫	৪		

পরিশিষ্ট - III

ঋগ্বেদে 'অর্থ' শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

অর্থ	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০	
	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম
শত্রু	৭০	১					১৬	১৯	৩৩	২	১৪	৩	২১	৯	৪৮	৮	৭৯	১	৪২	১
	৭৩	৫									১৫	৩	৩৪	১৮	৪৯	১২			৫৯	৩
	১১৮	৯									২০	১	৪৮	৩					৭৬	২
	১২১	১৫									৩৬	৫	৫৬	২২					৮৯	৩
	১৬৯	৬											৬৮	২						
													৯২	৪						
সম্মানীয়	৩৩	৩	২৩	১৫	৪৩	২	১	৭	৩৩	৬	২৪	৫	৮	১	১৯	৩৬			২০	৪
	৮১	৬	৩৫	২			২	১২	৩৩	৯	২৫	৭	২১	৫	২১	১৬			২৭	৮
	৮১	৯	৪৩	২			৪	৬	৩৪	৯	৪৭	৯	৩১	৫	২৪	২২			২৭	১৯
	১২১	১৪					২০	৩					৮৬	৭	৩৪	১০			৩৪	১৩
	১৮৪	১					২৪	৮					১০০	৫	৫৫	১২			৮৬	১
							২৯	১											৮৬	৩
							৩৮	২											১১৬	৬
							৪৮	১											১৪৮	৩
																			১৯১	১
নাগরিক							২	১৮												
							২০	৩												

পরিশিষ্ট - IV

ঋগ্বেদে 'দাস' শব্দের উল্লেখ

১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০	
ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম
৯২	৮	১১	২	৩৪	১	১৮	৯	৩০	৭	২০	৬	১৯	২	৫	৩১			২২	৮
১০৩	৩	১১	৪			২৮	৪	৩০	৮	২০	১০	৮৩	১	২৪	২৭			২৩	২
১০৪	২	১২	৪			৩০	১৪	৩০	৯	২২	১০	৮৬	৭	৩২	২			৩৮	৩
১৫৮	৫	২০	৬			৩০	১৫	৩৩	৪	২৫	২	৯৯	৪	৪০	৬			৪৯	৬
১৭৪	৭	২০	৭			৩০	২১	৩৪	৬	২৬	৫			৫১	৯			৪৯	৭
						৩২	১০			৩৩	৩			৫৬	৩			৫৪	১
										৪৭	২১			৭০	১০			৬২	১০
										৬০	৬							৭৩	৭
																		৮৩	১
																		৮৬	১৯
																		৯৯	৬
																		১০২	৩
																		১২০	২
																		১৩৮	৩

পরিশিষ্ট - V

ঋগ্বেদে 'দস্যু' (Dasyu) শব্দের উল্লেখ

১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০	
ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম
৩৩	৪	১১	১৮	২৯	৯	১৬	৯	৪	৬	১৪	৩	৫	৬	৬	১৪	৪১	২	২২	৮
৩৩	৭	১১	১৯	৩৪	৬	১৬	১০	৭	১০	১৬	১৫	৬	২	১৪	১৪	৪৭	২	৪৭	৪
২২	৯	১২	১০	৩৪	৯	১৬	১২	১৪	১৪	১৮	৩	১৯	৪	৩৯	৮	৮৮	৪	৪৮	২
৩৬	১৮	১৩	৯	৪৯	২	২৮	৩	২৯	১০	২৩	২			৫০	৮	৯২	৫	৪৯	৩
৫১	৫	১৫	৯			২৮	৪	৩০	৯	২৪	৮			৫১	২			৫৫	৮
৫১	৬	২০	৯			৩৮	৪	৩১	৫	২৯	৬			৫৬	২			৭৩	৫
৫১	৮							৩১	৭	৩১	৪			৭০	১১			৮৩	৩
৫৩	৪							৭০	৩	৪৫	২৪			৯৮	৬			৮৩	৬
৫৯	৬																	৯৫	৭
৭৮	৪																	৯৯	৭
১০০	১৮																	১০৫	১১
১০১	৫																		
১০৩	৩																	১৭০	২
১০৩	৪																		
১০৮	১২																		
১১৭	৩																		
১১৭	২১																		

পরিশিষ্ট - VI

ঋগ্বেদে 'বর্ণ' শব্দের উল্লেখ

১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০	
ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম	ঋ	ম
৭৩	৭	১	১২	৩৪	৫	৫	১৩									৬৫	৮	৩	৩
৯২	১০	৩	৫													৭১	২	১২৪	৭
৯৬	৫	৪	৫													৭১	৮		
১০৪	২	৫	৫													৯৭	১৫		
১১৩	২	১২	৪													১০৪	৪		
১৭৯	৬	৩৪	১৩													১০৫	৪০		

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : ত্রয়োদশ খণ্ড

অনুবাদে

সন্তোষ দেবনাথ : ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিসের সদস্য; ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিক; বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শনের বার্তা সম্পাদক; কবি, ওপন্যাসিক ও অনুবাদক।

অনুমোদনে

আশিস সান্যাল : কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক ও অনুবাদক। বহু সম্মানে সম্মানিত। বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। ইন্ডিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক।

নির্ঘণ্ট